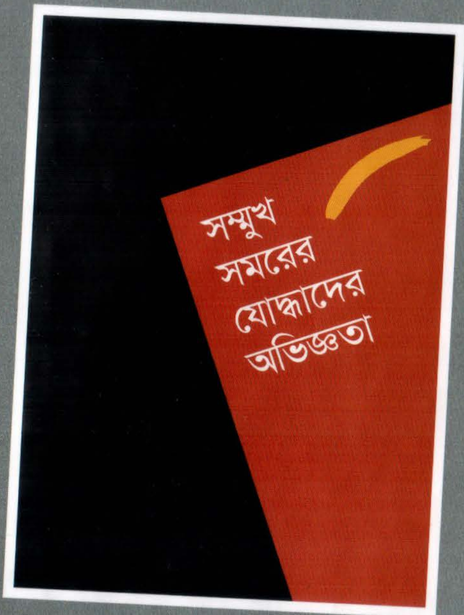
স্বাধীনতা

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্মুখ সমরের যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা

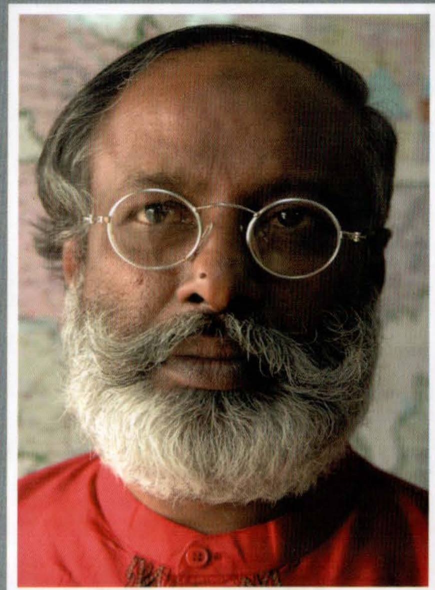
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
সম্পাদিত



স্বাধীনতা নামের ক্রমিক বইটি স্বাধীনতার লেখায় অর্থাৎ একাত্তরের রণাঙ্গনের লেখা নিয়ে সংকলিত। ভালো যোদ্ধারা, সাহসী সৈনিকরা যে ভালো লিখবেন তেমন কোনো কথা নেই। তবুও প্রয়াস অব্যাহত থাক, যদিও কাজটি মোটেও সহজ নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আজ যে বয়স তাতে ভবিষ্যতে যে সৃজনশীলতা নিয়ে কলম চলবে তা হবার কথা না, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই। ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন সাধের লেখা ভিন্ন ভিন্ন মুক্তিযোদ্ধারা লিখছেন একই মোড়কে তারওতো স্বাদ ভিন্ন।

আমি নিজে মরণকে স্মরণ করে কষ্ট পাই না। কেউ চিরজীবী নয়। তবে বাংলাদেশে একদিন একজনও মুক্তিযোদ্ধা থাকবে না—কথাটা মনে আসলে মনটা কেমন করে। সে জন্যই মুক্তিযুদ্ধটা থেকে যাক সেটাই বাসনা।

জীবনে সব আশা সত্যি হয় না। স্বাধীনতা প্রকাশও হয়তো বেশিদিন স্থায়ী হবে না। তবুও স্বপ্ন দেখি।



জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৫২। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে যখন তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখনই ডাক এল মুক্তি সংগ্রামে। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে এক তরুণ গণযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের দুই কিংবদন্তি মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দারের সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের পাশে পাশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলিতে। একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের পাশাপাশি নিজেকে শাণিত করেছেন স্বদেশপ্রেমের এক প্রগাঢ় চেতনায়। বাহাত্তরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হলেও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের কারণে চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং পচাত্তরের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ১২ জুলাই ১৯৯৬ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন-এ যেমন উচ্চ শাঘার, একমাত্র পুত্র শিশু সাবিতের মৃত্যু তেমনি তার হৃদয়ের গভীরতম ক্ষত। তবুও এ ক্ষত নিয়ে, এই বিক্ষত সময়ে তিনি সবুজআদৃত এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

স্বাধীনতা (দ্বিতীয় খণ্ড)
সম্পাদনা : মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

প্রকাশক

CENTRE FOR
BANGLADESH
LIBERATION WAR STUDIES

সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ
এপার্টমেন্ট # ৪ বি, বাড়ি # ৪৪৮/এ
রোড # ৭ (পূর্ব), বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা ১২০৬
ফোন #০১৫৫২ ৪৪৯৪০৪, ০১৭১১ ৫৩৬৫০০
ই-মেইল : cblws 1971 @ yahoo. com

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
৬১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

একমাত্র পরিবেশক
অনন্যা
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
E-mail : anannyadhaka@gmail.com

U.K Distributor ▫ **Sangeeta Limited**, 22, Brick Lane, London
U.S.A Distributor ▫ **Muktadhara**, 37-69, 74 St., 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372
Canada Distributor ▫ **Anyamela**, 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202
Canada Distributor ▫ **ATN Mega Store**, 2970 Danforth Ave. Toronto

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

Shadhinata (Volume-2) edited by Major Qamrul Hassan Bhuiyan and also Published by him on behalf of Centre for Bangladesh Liberation War Studies, Apartment # 4B, House # 448/A, Road # 7 (East), Baridhara DOHS, Dhaka 1206. Cover Design by Dhrubo Esh. Price Taka : 150.00 Only US # 7

ISBN 984 70008 0016 9

উৎসর্গ

সকল শহীদ এবং একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে
যাঁরা দেশপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখা অম্লান রেখেছেন

সম্পাদকের কথা

সার্বিক অর্থে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি যতটা বেশি হয়েছে ততটাই কম লেখালেখি হয়েছে আমাদের সম্মুখ সমর নিয়ে। এর কারণ নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি শুধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের ছেলেদের মাঠের অর্জনের কথা বলছি। স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষের সীমাহীন ত্যাগ ও প্রাণোৎসর্গের কথা বলছি। একাত্তরপূর্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং একাত্তরের রণাঙ্গনে এই মাটিবর্তী মানুষরাই ছিল প্রধান নিয়ামক। রণাঙ্গনে নিয়মিত বাহিনীর ব্যাটালিয়ানগুলিও ছিল নিম্নবর্তী সৈনিক নির্ভর এবং সে ইউনিটগুলির বৃহদাংশই ছিল ছ'সপ্তাহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একাত্তরের ছাত্র, কৃষক, খেটেখাওয়া মানুষ। তারা অধিকাংশই তখনো কৈশোর পেরোয়নি। স্বাধীনতা ওদের কাছে একটি বাস্তব বিভাজক। বিভাজনের এই প্রক্রিয়া এবং ক্রমাগত সামাজিক শ্রেণীভেদ বৃদ্ধি তাদেরকে প্রান্তবর্তী করে ফেলেছে। লেখা আর কথায় মুক্তিযুদ্ধের এই ব্রাত্যজনদের উচ্চকিত প্রশংসা করা হলেও তার সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধের দূরবর্তী কোনো সম্পর্ক নেই। 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান' আখ্যায়িত হয়ে তাদের তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা আগামী পনেরো বা বিশ বছরের মধ্যে এ পৃথিবী থেকে চলে যাবেন। যারা থাকবেন তারা বয়সের ভার কাঁধে নিয়ে বাঁচবেন বার্ধক্যজনিত রোগ বালাই নিয়ে। লেখালেখির সময় তখন আর তাদের থাকার সম্ভাবনা না থাকারই কথা।

প্রথাগত শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা যোদ্ধাদের সংখ্যাই ছিল অধিক। তারা লিখতে পারেননি। যারা হয়তো চেষ্টা করলে লিখতে পারতেন সেই সংখ্যালঘু শিক্ষিত যোদ্ধারা উদ্যোগী হননি। ফলে লেখা হয়েছে অতি সামান্য। ইতিহাসবেত্তা বা যাদের লিখিত উপস্থাপনা ভালো তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সেই অহংকারের কাহিনী 'কথ্য ইতিহাস' আকারে লিপিবদ্ধ করেননি। এ বিষয়ে সাহিত্য অঙ্গনের লোক যুদ্ধের মাঠে না থাকায় উঠে আসেনি আমাদের 'যুদ্ধ সাহিত্য'। ঢাকার পত্রিকা এবং ছাপা মাধ্যমগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের খ্যাতিমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি বলে তাদের যুদ্ধকাহিনীগুলো ছাপেনি। অথচ এই যুদ্ধকথা লিপিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য।

'সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ' মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা ছাপাবে-এই প্রত্যয় নিয়ে তাদের লেখা সংগ্রহ করছে। মুক্তিযোদ্ধারা যেন পরবর্তী প্রজন্ম দ্বারা এই দোষে দুষ্ট আখ্যায়িত না হন যে তারা তাদের যুদ্ধকথা রেখে যাননি। এই বই সেই প্রয়াসে প্রথম প্রকাশ। আশা করি *স্বাধীনতা* পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ আমরা অব্যাহত রাখতে পারবো।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০০৭

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

দ্বিতীয় খণ্ডের কথা

যৌক্তিক কৈফিয়ত থাকলেও স্বাধীনতার দ্বিতীয় খণ্ড বের হবার বিলম্বের জন্য আমিই দায়ী। যে যোদ্ধাদের লেখার চল নেই তাদেরকে দিয়ে লেখানো কষ্টকর। লেখাগুলি সাহিত্যের বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে না দেখতে অনুরোধ রইলো। তবুও অব্যাহত থাক *স্বাধীনতার* প্রকাশ।

মোফাজ্জল করিম একজন সরকারী চাকুরে। কবি ও লেখক হিসেবেও খ্যাতি আছে। তিনি জেনারেল মোহাম্মদ আতউল গনি ওসমানীকে নিয়ে একটি সমৃদ্ধ মজার লেখা লিখেছেন-ও *জেনারেল, মাই জেনারেল*। মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ইন চীফ কর্নেল ওসমানী সম্বন্ধে অনেক তীর্যক সমালোচনা আছে। তারপরও বঙ্গবীর ওসমানী আমাদের শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার মানুষ। লেখক মুক্তিযোদ্ধা না হলেও তার এ লেখাটি এ বইয়ে ছাপিয়ে দিলাম। একজন মুক্তিযোদ্ধা সম্পাদক এতটুকু ব্যাত্যয় তো করতেই পারেন।

ঢাকা — মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
ফেব্রুয়ারি ২০১০

সূচিপত্র

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও জুনিয়র টাইগার
নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল

এক.

কীভাবে এ লেখাটা শুরু করবো মনস্থির করতে পারছিলাম না। বারদুয়েক মুসাবিদা করে মূল প্রবন্ধের সঙ্গে জুনিয়র টাইগারের সম্পৃক্ততা নিয়ে লিখতে বসেছি। কিন্তু এ জুনিয়র টাইগার কে বা কারা বা কীভাবে জুনিয়র টাইগার নামের প্রচলন হলো এবং সে নামই ১৯৭১ পর্যন্ত বহাল থাকলো তা হয়তো অনেকের জানা নেই বা স্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি হয় ১৯৪৫ সালে। দুবছর পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়। স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল আবারো শৃঙ্খলযুক্ত হলো পাকিস্তানের বেসামরিক ও সামরিক নেতৃত্বের কাছে। সামরিক নীতি নির্ধারকদের পরামর্শে পাকিস্তানে গঠিত হতে থাকে বিভিন্ন বাহিনী। এ ধরণের একটি আনুষ্ঠানিক সামরিক অঙ্গ ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশন, যার অবস্থান ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষাই ছিল এ ডিভিশনের প্রধান দায়িত্ব। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত মাত্র দুটি বিগ্রেড সংবলিত। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ৫৩ বিগ্রেডের অবস্থান ছিল কুমিল্লার ময়নামতি এবং ১০৭ ব্রিগেড ছিল যশোরে। বিমান বাহিনীতে ছিল মাত্র একটি স্কোয়াড্রন-ঢাকায়। ঢাকায় ২৩ ব্রিগেড মাত্র দুটি ব্যাটেলিয়নের সমন্বয়ে গঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। তবে ১৯৪৮ সাল থেকেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের সূত্রপাত ঘটে। এরাই টাইগার নামে অধিক পরিচিত ছিল। ১৮৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান ১৭ দিনের যুদ্ধের পর পাঞ্জাব, পাঠান, ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং বেলুচ রেজিমেন্টের প্রত্যেকটিতে ৪০টির অধিক ব্যাটেলিয়ান হলেও বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটেলিয়ান সংখ্যা অনেকদিন যাবত ছিল মাত্র ৬টি। ১৯৬৯-৭০ সালে টাইগারদের ৭ম ও ৮ম ব্যাটেলিয়ান সৃষ্টি করা হলেও এদের প্রশিক্ষণ ও গঠন পদ্ধতি ছিল ত্রুটিজনক। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে চট্টগ্রাম অবস্থানরত ৮ম ব্যাটেলিয়ান পশ্চিম পাকিস্তানের স্থানান্তরিত হতে থাকে। সবচেয়ে মজার কথা হলো, ১৯৪৯ সালে ২য় ইস্ট বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি একটানা ২২ বছর 'জুনিয়র টাইগার' নামে অভিহিত হতে থাকে। ১৯৭১ সালে এ শার্দুলদের সঙ্গে একাত্মতার সুযোগ পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। কিন্তু দুঃখ লাগে আজকাল আর এ 'ব্যাটেলিয়ন রেইজিং ডে'তে আমন্ত্রণ পাই না-সম্ভবত আমার সম্পৃক্ততা বেসামরিক কর্মকর্তা (সিভিলিয়ন স্টাফ অফিসার কোয়ার্টার মাস্টার) ছিল বিধায়।

দুই.

ঢাকা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে শত বছরের পুরনো জয়দেবপুর রাজবাড়িতে জুনিয়ার টাইগার তথা ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের প্রবেশপথে প্রহরীর মতো অবস্থান করছিল। ১৯৭১ সালে ভারতীয় আক্রমণের ধুয়া তুলে দেশের উত্তর-পূর্ব এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি এ রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানিকে ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ভারতীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ব্যূহ থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার জাহাজের আবাবের নির্দেশে এ দুটি কোম্পানি সম্মুখভাগ অর্থাৎ জামালপুর ও হালুয়াঘাট অঞ্চলে সৈন্য পরিচালনা করে পেছনে তথ্য পাঠাবে এবং আক্রমণ প্রতিহত করবে। এ ছিল আপাতদৃষ্টিতে জুনিয়র টাইগারের একাংশের দায়িত্ব। কিন্তু রেজিমেন্টের বাঙালি কর্মকর্তারা বুঝতে পেরেছিলেন ঐ সৈন্য মোতায়েন ছিল একটি সামরিক ধোঁকাবাজি। আসলে, বাঙালি সৈন্যদের ঢাকা থেকে আপাতত দূরে সরিয়ে রাখা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। রাখে আল্লাহ্ মারে কে? ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর কালরাতে পাকিস্তানি নরপশু সেনাবাহিনীর গণহত্যা শুরুর পর ব্রিগেড কমান্ডারদের সিদ্ধান্ত বাঙালি সৈন্যদের জন্য শাপে বর হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল অবাঙালি ব্রিগেড কমান্ডার নিয়ে ঢাকা সেনাসদর দপ্তরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে চারটি বেঙ্গল রেজিমেন্টকেই বিভিন্ন অজুহাতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা অথবা মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ/অনুশীলনের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত এলাকাসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই বাঙালি কমান্ডার যথাক্রমে লে. কর্নেল জলিল ও লে. কর্নেল মাসুদের হয় কাপুরুষতা না হয় সিদ্ধান্ত হীনতায় সৈন্যদের জন্য দুর্ভোগ নেমে আসে। ২য় ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর সফিউল্লাহও ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের মেজর খালেদ মোশাররফ এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের মেজর জিয়া মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে চলে আসেন। এদের নামের আদি অক্ষর যথাক্রমে এস-ফোর্স (সফিউল্লাহ), কে-ফোর্স (খালেদ মোশাররফ) ও জেড-ফোর্স (জিয়াউর রহমান) নামকরণে জুলাই মাসের দিকে তিনটি ব্রিগেড সৃষ্টি করা হয়। এস-ফোর্সের তত্ত্বাবধানে তিন নম্বর সেক্টর, কে-ফোর্সের দুই নম্বর সেক্টর ও জেড-ফোর্সের এক নম্বর সেক্টর বাংলাদেশ ফোর্সেসের পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। এর প্রধান কারণ ছিল সেক্টর সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনায় নেতৃত্বে ছিল 'ফ্রিডম ফাইটার' বা এফ-এফ। এরা অনেক ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদস্য বা এম এফ ক্যাটাগরির ছিলেন না। সাধারণ সেনারা ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-যুবক, শ্রমিক কৃষক। ইতিহাস সৃষ্টিকারী নিতান্ত সাধারণ মানুষ যাদের ভূমিকা চিরকাল হাল ধরে থাকা, চিরকাল দাঁড় টানা আর চিরকাল কুলি মজুরের কাজ করা-স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়েছে কী না বিচার ও বিশ্লেষণের প্রবৃত্তি ও সময় কি কখনো হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে মুক্তিযুদ্ধের এ ইতিহাস প্রহসন

হয়ে গোটা বাঙালি জাতির বিবেক দংশন করতে থাকবে বছরের পর বছর। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ও ভূখণ্ডের মানুষ এর আগে কখনো এতো ব্যাপকভাবে সশস্ত্র পদ্ধতিতে শাসক ও শোষক শ্রেণীর মুখোমুখি হয়নি।

তিন.

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম ফিরে আসি সেখানে। ডিসেম্বর মাস, বিজয়ের মাস। মনে পড়লো মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলির কথা। সেদিন আমি মুক্তিযুদ্ধের একজন সশস্ত্র সৈনিক। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার অদূরে হেজামারার টিলায় ঘেরা এক দুর্গম এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের তিন নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তরে অবস্থানরত। একটি টিলায় মোট তিনটি তাঁবু ও একটি লম্বা বেড়ার ঘর। বেড়ার ঘরে বাঁশের মাচায় আমরা পাঁচজন অফিসার রাতের বেলায় ঘুমাই। প্রত্যেকটি মাচার সামনে একটি বাঁশ পোঁতা যেখানে আমাদের পরিধেয় লুঙ্গি, প্যান্ট ও গামছা ঝুলিয়ে রাখা হতো। আমরা ছিলাম ভাগ্যবান। তাই আমাদের পোশাক ছিল সাধারণ সৈন্যদের চেয়ে একটি বেশি-অর্থাৎ খাকি রঙের ট্রাউজারটি। প্রত্যেক মাচায় হয় মাথার কাছে অথবা পাশে যার যার অস্ত্র। আমার জন্য বরাদ্দ ছিল চাইনিজ সাব মেশিনগানটি (এসএমজি), যার প্রত্যেক ম্যাগাজিনে ২৮ রাউন্ড গুলি ও কোমরে বেল্টের সঙ্গে আরো প্রায় ৪০টি। নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়ার আগেই এই অস্ত্র ব্যবহার, খোলা ও বন্ধ করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার নিয়মাবলী শিখেছিলাম কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন এএসএম নাসিমের কাছে। জুন মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সেক্টর সদর দপ্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হচ্ছে অপারেশন প্লান ও সেগুলোর বাস্তবায়ন অনেক সুষ্ঠু হয়ে উঠেছে। কিছু এলাকা আমরা মুক্ত করছি আবার তা পাকিস্তানিরা পুনর্দখল করে নিচ্ছে। হতাহতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। প্রথাগত সম্মুখ সমরে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ছে-হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে গেরিলা অপারেশন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই চলছে। তবে ২-৩ সেপ্টেম্বর সিলেটের ধর্মগড় বিওপি আক্রমণ আমার জীবনের প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনন্য অভিজ্ঞতা। এ এলাকাটি ছিল পাকিস্তান বাহিনীর একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি-যা একটি নিয়মিত প্লাটুন ও এক কোম্পানি প্রশিক্ষিত রাজাকার পরিবেষ্টিত। এ অভিযান পরিচালনায় মাঠ পর্যায়ে নেতৃত্বে ছিলেন মুক্তিবাহিনী তথা এস-ফোর্সের পাঁচজন অফিসার যথাক্রমে ক্যাপ্টেন নাসিম, ক্যাপ্টেন মতিন, ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভুঁইয়া লে. মোরশেদ ও লে. বদিউজ্জামান। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ব্রিগেড কমান্ডার লে. কর্নেল সফিউল্লাহ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার অবিবেকোচিত ও হতাশাগ্রস্ত কর্মকাণ্ডের ফলে আক্রমণটি সফল হয়নি। সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যায়। শেষ পর্যায়ে হামলা-অভিযান ব্যর্থ হলে তা প্রত্যাহার করা হয়।

চার.

বাঙালি জাতির ত্যাগ, আত্মহুতি আর স্বজন হারানোর করুণ কাহিনীর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সফলতা ও অসফলতা এক অনন্য ইতিহাস। একাত্তরের ৯ মাসে নিরীহ ও

নিরস্ত্র জনগণের ওপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি সামরিকজান্তা। ২৫ মার্চ থেকেই শুরু হয় এক অসম রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ। পক্ষান্তরে, প্রথম মুখোমুখি সংঘাত হয় জুনিয়ার টাইগারের ঘাঁটি জয়দেবপুর থেকেই। তা ছিল ১৯ মার্চ। ৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহাজের আরবাব একদল সুসজ্জিত (৭০ জন সৈন্যের প্রত্যেকেই চাইনিজ এল.এম.জি হাতে) সেনাদল নিয়ে জয়দেবপুর এসেছিলেন এক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। কিন্তু সেটা জানাজানি হয়ে গেলে এলাকার সাধারণ মানুষ অনেকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক ফৌজের ওপর। বেশ কয়েকজন হতাহত হন। তারপর অনেকটা বাধ্য হয়ে ব্রিগেডিয়ার আরবাব মনোক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে যান ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। এ ঘটনা ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জন্য যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ ছিল। তাই মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে ইউনিটের অবিশষ্ট জনবল, গাড়ি, সমরাস্ত্রসহ সৈন্যরা জয়দেবপুর রাজবাড়ি পরিত্যাগ করে টাঙ্গাইলের পথে রওনা হতে পেরেছিল ২৮ মার্চ। পরদিন পাকিস্তানিরা পূর্ণ ক্ষমতায় রেজিমেন্টের সদর দপ্তর (জয়দেবপুর-রাজবাড়ি) আক্রমণ করে বিশ্বাসঘাতক বাঙালি অধিনায়ক লে. কর্নেল রকিবকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। তারপর রেজিমেন্টের অবশিষ্ট সেনাসদস্য সাধারণ মানুষদের নিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

পাঁচ.

জুনিয়ার টাইগারদের তত্ত্বাবধানে গঠিন তিন নম্বর সেক্টরের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কিশোরগঞ্জসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ-ঢাকা শহর ব্যতীত নরসিংদী, শিবপুর, রায়পুরা ইত্যাদি এলাকা। সিলেট ও কুমিল্লার মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল পাকিস্তানিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তাই তারা জীবনমরণ চেষ্টা করেছিল সেক্টরের রক্ষাব্যূহ ভেঙে ফেলতে। যুদ্ধে বাঙালি সৈনিক ও সাধারণ মানুষ দৃষ্টান্তমূলক সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। তারপর যুদ্ধের চরিত্রে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসতে থাকে। নানা সীমাবদ্ধতার জন্য প্রচলিত যুদ্ধ প্রথম পর্যায়ে সীমিত থাকে। কৌশলগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে স্বাভাবিকভাবে অপ্রচলিত রণনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে সেক্টর নেতৃত্ব যা 'গেরিলা যুদ্ধ' নামে অভিহিত হয়। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় বেশ কয়েকটি। সে সময়ে যুদ্ধ নিয়োজিত সেনাবাহিনী থেকে আগত সৈনিকদের নিয়ে নিয়মিত বাহিনী (বা মুক্তিফৌজ/এম এফ) এবং অনিয়মিত সেনাদের দ্বারা গণবাহিনী গঠিত হতে থাকে। এর পেছনে ভারতীয় সেনানীতি নির্ধারকদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল, যা অনেকের কাছে ভিন্ন অর্থ বহন করতো সে সময়ে।

ছয়.

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ২য় ইস্ট বেঙ্গল-জুনিয়র টাইগার নামে পরিচিত একটা পদাতিক ব্যাটেলিয়ন-১৯৭১ সালের শুরুতে ঢাকার অদূরবর্তী ঐতিহাসিক জয়দেবপুর রাজবাড়িতে অবস্থানরত। প্রায় ২১ বছর নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর কমান্ড স্ট্রাকচার পরিবর্তিত হচ্ছিল। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসেই ৩ জন কমান্ডিং অফিসার (সিও) -এর

পরিবর্তন এ ইউনিটটির জন্য অভূতপূর্ব ঘটনা। ১৯ মার্চ একাত্তর সালে ব্রিগেডিয়ার জাহানজের আরবাবের নেতৃত্বে পরিচালিত অতর্কিত আক্রমণ ও জয়দেবপুরে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে গুলিবিনিময়ের ঘটনা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। কয়েকজন এলাকাবাসী হতাহতের পর পরিস্থিতি যখন ভিন্ন দিকে মোড় নিচ্ছিল তখন সুসজ্জিত ৭০ জন সৈন্যসহ ব্রিগেডিয়ার সাহেব পলায়ন করলেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের দিকে। এ অভাবনীয় ঘটনায় পাকিস্তানিরা হতভম্ব ও বাঙালিরা আনন্দিত। সামান্য কয়েকটি দোনালা বন্দুক আর দা-সড়কি নিয়ে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল তাতে বাহাদুর পাকিস্তানি সেনারা নিশ্চয়ই ভীত হয়ে শেষপর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করেছিল। সে সময়ে ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন লে. কর্নেল মাসুদ-এক অসহায় ও সন্ত্রস্ত সেনা। ব্রিগেডিয়ার আরবার তাকে প্রত্যাহার করলেন ইউনিট থেকে। ৫ দিন পর নতুন চমক। চট্টগ্রামস্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ইবিআরসি) এর কমান্ডিং অফিসার বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এলেন জয়দেবপুরে-সঙ্গে পুরাদস্তুর পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন বাঙালি লে. কর্নেল রকিব, যিনি এ ইউনিটের নতুন সিও। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার কাজ শেষে সেদিনই ঢাকায় ফিরে গেলেন। কিন্তু কর্নেল রকিব পড়লেন বিপাকে। তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় শূন্য। শুধু জন্মসূত্রে কয়েকজন পাকিস্তানি অফিসার ও সেপাইদের মুখে হাসি ফুটলো তাকে পেয়ে। কিন্তু রকিব সাহেবকে অন্য সকলেই সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। ভদ্রলোক জয়দেবপুর আগমনের পর বাঙালি অফিসার ও সেপাইরা শুধু আকার-ইঙ্গিতে যোগাযোগ রেখেছে একে অন্যের সঙ্গে।

সাত.

বলা বাহুল্য শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটায়। ছাত্র-জনতা সেদিন স্বাধীনতা বিষয়ে প্রচণ্ড স্পর্শকাতার হয়ে উঠেছিল। মজার কথা হলো, ঐ লাখ লাখ মানুষের সভায় একটি পুলিশও সেদিন কেউ দেখেনি-সামরিক বাহিনীর সদস্য দূরে থাক। সম্ভবত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে জেনারেল টিক্কা খান অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন আর ভাবছিলেন, কখন এতোগুলো বাঙালি শিকারের ওপর বোমা ফেলবেন। ৩১ বছর আগে ৩০ বছর বয়সের তরুণের দেখা পূর্ব বাংলার উত্তাল অগ্নিঝরা দিনগুলোর কথা মনে হলে আজও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। বন্ধু প্রকৌশলী মাশরুরুল হক (কমল) ও আণবিক শক্তি কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ড. মোজাম্মেল হোসেনসহ আমরা ৩ জন রেসকোর্সের বক্তৃতা মঞ্চ থেকে একটু দূরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের প্রায় দেয়াল ঘেঁষে বসেছিলাম। কমলের পরামর্শ ছিল 'রিট্রিটের' রাস্তা দেখেশুনে বসা উচিত হবে। সেদিন তার কথার মর্মার্থ বুঝিনি। বেশ কয়েক সপ্তাহ পরই সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা-বাগান এলাকায় গেরিলা অপারেশনে 'ট্যাকটিক্যাল রিট্রিট' সম্পর্কে ব্রিফিঙের বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। ততোদিনে কমল পুরাদস্তর মুক্তিযোদ্ধা। আফসোস একাত্তরের ডিসেম্বর

মাসেই এক মিলিটারি অপারেশনে কমলের চোখ উড়ে গেল। তাকে ভারতের এক হাসপাতালে নেওয়া হলো চিকিৎসার জন্য।

আট.

মনে পড়ে ৩ নম্বর সেক্টরের প্রথম প্রস্তুতিমুলক যুদ্ধ হয়েছিল ১৫ এপ্রিল। পাকিস্তানের আক্রমণ শুরু হয় একযোগে আশুগঞ্জ-ভৈরব এলাকায়। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে বাঙালি সৈন্যরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছিল না। এমন সময় পাকিস্তান বিমান বাহিনীর কয়েকটি জেট বিমান মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর উপর্যুপরি হামলা শুরু করে। ফলে মুক্তিসেনারা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়েন। শেষপর্যন্ত ভৈরব আর ধরে রাখা গেল না। মেঘনা নদীর বুকে মুক্তিযুদ্ধের ৩ নম্বর সেক্টরের প্রথম প্রস্তুতিমূলক যুদ্ধ। এর মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনীর অস্ত্র ক্ষমতার একটি পরিমাপ হয় মুক্তিযোদ্ধাদের। গতিশীলতা এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের অভাবে এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে কিছুটা ভয়ও ধরে। তারপর আসে মাধবপুর প্রতিরোধ যুদ্ধ, ২৮ এপ্রিল। এ যুদ্ধে বাঙালি সৈনিকরা দৃষ্টান্তমুলক সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। তারপর যুদ্ধের চরিত্রে আস্তে আস্তে নতুনত্ব ছাড়াও পরিবর্তন আসতে থাকে। নানা সীমাবদ্ধতার জন্য প্রচলিত যুদ্ধ পরিচালনা সীমিত হয়ে আসে। কৌশলগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে স্বাভাবিক কারণেই অপ্রচলিত (গেরিলা) রণনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে সেক্টর নেতৃত্ব। তেলিয়াপাড়া ও মনতলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত যুদ্ধ সংঘটিত হলেও সিলেট জেলার চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ ও বানিয়াচং, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর ও সরাইল; কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, বাজিতপুর ও কটিয়াদী; ঢাকা জেলার রায়পুরা, শিবপুর এবং ময়মনসিংহের গফরগাঁও ও ভালুকায় চলতে থাকে গেরিলা যুদ্ধ। এ সকল এলাকা ৩ নম্বর সেক্টরের আওতাধীন ছিল। মনতলা ছিল সেক্টরের শেষ রক্ষাকবচ। তেলিয়াপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধের দুকোম্পানি সৈন্য মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার পর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে সেক্টরের সৈন্যদের বাংলাদেশে পা রাখার জায়গা শেষ হয়ে যাবে।

নয়.

মে মাসের ২২ তারিখে আমি ঢাকায় আসি-বাবা, মা, ছোটভাই ও বোন এবং ভাই বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান মাহমুদের স্ত্রীকে আগরতলা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এবার কুমিল্লা হয়ে ঢাকা আসার অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্নতর। তারপর ঢাকা পৌঁছে শহরে চলাফেরা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। আসার সময়ে ক্যাপ্টেন নাজিম, ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া ও সেলিম-আনিস নামে দুভাইয়ের চিঠি নিয়ে এসেছিলাম। সেলিম-আনিসের দুলাইন চিঠিতে লেখা ছিল 'মা আমরা ভালো আছি-দোয়া করো।' তাদের মা থাকতেন তেজতুরি বাজার এলাকায়। আজও চিঠির লাইন দুটি জ্বলজ্বল করে আমার চোখে। সে দুভাই দুর্দান্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং স্বাধীনতা উত্তর জানুয়ারি ১৯৭২ সালে মীরপুর এলাকায় সশস্ত্র বিহারিদের বন্দি করতে গিয়ে শহীদ হয় এক ভাই সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সেলিম। যুদ্ধকালীন দুভাই কমিশনড প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আনিস এখন বিখ্যাত ডাক্তার।

দশ.

মনতলার কথায় ফিরে যাই। এদিকে ১৫ জুনের পর পাকিস্তানিদের রণকৌশলেও পরিবর্তন দেখা দেয়। ২১ জুন সকালে শত্রুবাহিনী মনতলা ব্যূহে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করে। শেষপর্যন্ত হরষপুর-মুকুন্দপুর একটি ক্ষুদ্র এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ যুদ্ধে গণবাহিনীর অভিজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধা দৌলা মিয়ার সাহসিকতার কথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে লেখা না হলেও আমাদের স্মৃতিতে অমলিন রয়েছে। কুমিল্লা জেলার শালদানদী এলাকার বাসিন্দা নিবেদিতপ্রাণ বেপরোয়া মুক্তিযোদ্ধার কাছে জন্মভূমির স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। লে. মোরশেদের একটি লাইট মেশিনগান এ অপারেশনের সাফল্য ত্বরান্বিত করে। মুক্তিযুদ্ধে এ সাহসী মুক্তিযোদ্ধা দুদুবার সম্মুখ সমরে আহত হন-সুস্থ হয়ে আবার যুদ্ধে চলে আসেন।

এলএমজি ব্যবহার করে দু:সাহসী গেরিলা দৌলা মিয়া যুদ্ধে মারাত্মক আহত এবং ঘেরাও হয়েও যুদ্ধ চালিয়ে যান। তার তলপেট ভেসে যাচ্ছে রক্তে। এদিকে তার একটানা এলএমজি ব্যবহার শত্রুদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। তারা পিছু হটে যায়। এভাবে পাল্টা আক্রমণে সফলতা আসে। কিন্তু তারও আগে সেদিন সকালে কী ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা না দিলে বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে না।

পাকিস্তান বাহিনী মনতলা ব্যূহে বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। শত্রুপক্ষের ৪ জন সৈনিকের বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের মাত্র একজন। তারা তিন দিক থেকে আক্রমণ করে। তার ওপর রয়েছে (শত্রুপক্ষের) গোলন্দাজ বাহিনীর নির্ভুল গোলাবর্ষণ। ক্যাপ্টেন নাসিমের অবস্থানে পরিখার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া দুটি শত্রুদল আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভূঁইয়াও আক্রান্ত। লে. মোরশেদের অবস্থানে আক্রমণ চালায় দক্ষিণ-পশ্চিমের মুকুন্দপুর এলাকা থেকে। তারপর মোরশেদকে প্রায় ঘিরে ফেলে হেলিকপ্টার থেকে নামানো কমান্ডোরা। ওদিকে ক্যাপ্টেন নাসিম আরো সৈন্য চান-এগুতে পারছেন না। সেক্টর কমান্ডার সফিউল্লাহর নির্দেশে এ ভয়াবহ সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে নাসিম, মতিন ও মোরশেদ মরিয়া হয়ে ওঠেন। বেপরোয়া পাল্টা আক্রমণ ফলপ্রসূ হয়-মোরশেদ উদ্ধার হন। হারিয়ে যাওয়া কিছু এলাকা পুনর্দখল করা সম্ভব হয়। এখানেই দৌলা মিয়ার প্রচণ্ড সাহসিকতার প্রমাণ মেলে। গুলির আঘাতে তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসতে থাকে। তবুও এলএমজি হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন তিনি। তাকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে আনেন মুক্তিযোদ্ধা সাদেক (পরবর্তী সময় কমিশনড অফিসার) ও আনিস (পরবর্তী সময় কমিশনড অফিসার)। ৪ মাস হাসপাতালে থেকে দৌলা মিয়া কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। আবারো যুদ্ধ যেতে চান। সেক্টর কমান্ডার মেজর সফিউল্লাহ অনেকটা জোর করেই তাকে সদর দপ্তরে রেখে দেন। মুক্তিযুদ্ধের এ ঘটনা অনেককেই উদ্দীপ্ত করে। এ রকম দৌলা মিয়াদের সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্যই দেশ স্বাধীন হয়। বেঙ্গল টাইগারের মূল বাঙালি অফিসারদের মধ্যে ছিলেন সেক্টর কমান্ডার মেজর সফিউল্লাহ, মেজর মুইন, ক্যাপ্টেন নাসিম, ক্যাপ্টেন মতিন, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান, ক্যাপ্টেন আজিজ, ক্যাপ্টেন

এজাজ, লে. মোরশেদ ও লে. ইব্রাহিম। এরা সকলেই সফল মুক্তিযোদ্ধা। জুলাই মাসের পর এস-ফোর্স-এর কমান্ডার কর্নেল সফিউল্লাহর নেতৃত্বে এরা প্রত্যেকে এক একজন ফিডেল ক্যাস্ট্রো আর চেগুয়েভারার মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে আমরা মেজর নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে (হেজামারার টিলায়) সেক্টর ট্রুপস হিসেবে পুনগর্ঠিত হই। দেশ স্বাধীন হওয়া অবধি ৩ নম্বর সেক্টরে কর্মরত ছিলাম- এমনকি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত।

এগারো.

আফসোস নয় মাসে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। অনেকের বিকলাঙ্গ চরিত্র পর্দার আড়ালেই থেকে গেল। মুক্তিযুদ্ধের কোনো কোনো হিরো ভিলেন হয়ে গেলেন-আর কিছু ভিলেন হয়ে গেলেন হিরো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পুলিশের কর্মকর্তা তসলিম, রহিম ও সফদর নয় মাস পাকিস্তানিদের পদলেহনের পরও ক্ষমতায় বসলেন। তসলিম হলেন পুলিশের আইজি, রহিম হলেন গোয়েন্দা প্রধান ও পরে এস্টাবলিস্টমেন্ট সেক্রেটারি, সফদর হলেন বেসামরিক গোয়েন্দা প্রধান। শেষোক্ত দুজন ১৯৭১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুপ্তচর সংক্রান্ত প্রশিক্ষণও পেয়েছিলেন। এরাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন। কেন এবং কীভাবে? আরো আশ্চর্য ঘটনা-তসলিম মুক্তিযুদ্ধের সনদপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন। আজ জেনারেল ওসমানী ও সেক্টর কমান্ডারের যৌথ স্বাক্ষরে প্রণীত মুক্তিযুদ্ধের সনদপত্রই নাকি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

বারো.

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে জুনিয়ার টাইগার কর্নেল সফিউল্লাহ ও তার অগ্রগামী দল, মুক্তিযুদ্ধের দুনম্বর সেক্টরের গেরিলা কমান্ডার মেজর হায়দার ও টাঙ্গাইলের কাদের বাহিনীর সাহসী কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী ঢাকায় পৌছেন। আগরতলা থেকে হেলিকপ্টারে আসেন বাংলাদেশ ফের্সেস সদর দপ্তরের ডিপুটি চিফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার। কিন্তু এরা কেউই ঢাকার রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত যৌথ বাহিনীর সদস্য হিসেবে পাকিস্তানি নিয়াজি বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের সুযোগ পাননি। সেদিন কর্নেল ওসমানী সাহেবের রহস্যময় নিরুদ্দেশ স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণকে এতোটা হতবাক করেছিল যে এতো বছর পরও এ বিষয়ে কেউ মুখ খুলছেন না!

রাধানগর অপারেশন
লে. কর্নেল এসআইএম নূরুন্নবী খান, বীর বিক্রম

ভূমিকা : মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস সময়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসংখ্য ছোটবড়ো অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ সকল অপারেশনের মধ্যে 'রাধানগর অপারেশন' বিভিন্ন কারণে বাঙালি জাতির জন্য অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই অপারেশন পরিচালনার মধ্যে দিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধারা প্রমাণ করেছিল যে, তারা বিশ্বখ্যাত গুর্খা রেজিমেন্টের সৈন্যদের চেয়েও অনেক উন্নতমানের যোদ্ধা। ২৬ নভেম্বর ভোররাতে আর্টিলারির ব্যাপক ফায়ার সাপোর্ট নিয়েও ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্ট দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ছোটখেল অবস্থানটি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। রাধানগর অবস্থানে তারা উঠতেই পারেনি। এক ছোটখেলেই তাদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। আর ব্যর্থ রাধানগর আক্রমণে একজন মেজর, একজন ক্যাপ্টেন এবং দুজন লেফটেন্যান্টসহ তাদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ১০০ জনের মতো। ওই দিনের অপারেশনে পুরো ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টটিই পরবর্তী যুদ্ধের জন্য অকেজো (Unfit for Battle) হয়ে পড়েছিল। অথচ আর্টিলারির ফায়ার সাপোর্টসহ মিত্রবাহিনীর কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছাড়াই আমার নেতৃত্বাধীন ডেল্টা কোম্পানি ২৮ নভেম্বর ছোটখেল দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

২৯ নভেম্বর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানিগুলোকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে চারদিক থেকেই শত্রুর রাধানগর অবস্থানগুলোর ওপর আক্রমণ পরিচালনা শুরু করি। ৩০ নভেম্বর সাকল ৮টার মধ্যে রাধানগরের শক্তিশালী পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানটির পতন ঘটে। অপারেশন ছোটখেল এবং অপারেশন রাধানগর তাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ তথা সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য এক বিরল গৌরবের বিষয় হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। এই অপারেশনটি ছিল এক ধরনের 'সিজ অপারেশন'। ৬ নভেম্বর থেকে শুরু করে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই Seize Operation- এর কার্যক্রম চলে। শত্রুকে চারদিকে থেকে ধাপে ধাপে ঘিরে ফেলে শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলার পাশাপাশি এক এক করে শত্রুর অবস্থানদখল করে নিয়ে তাদের প্রতিরক্ষা বলয়টিকে সঙ্কুচিত করে ফেলাই ছিল এই অপারেশনটির মূল লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্য অর্জনে আমার নেতৃত্বাধীন ডেল্টা, ইকো এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানিগুলো সক্ষম হয়েছিল। একটানা ২৪ দিন ধরে পরিচালিত এই যুদ্ধে বিশ্রাম বলতে আমাদের কিছু ছিল না।

আমাদের প্রতিটি সৈন্যের বিছানা ছিল বাঙ্কার, লেপ-তোশক ছিল স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ধানের খড়। বালিশ ছিল বাঙ্কারের মাটির দেয়াল।

রাধানগরের অবস্থান : সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট থানাধীন রাধানগর সীমান্ত এলাকার একটি ছোট বাজার। রাধানগর বাজারের পূর্ব পাশ ঘেঁষে চলে গেছে পিয়ং নদীর একটি শাখা। নদীর উত্তর পাড়ে রয়েছে জাফলং চা বাগান। ৩ মাইল উত্তর-পূর্বে রয়েছে জাফলং বাজার। ৫ মাইল দূরে উত্তর -পূর্ব দিকে রয়েছে জাফলং পিকনিক স্পট ও বল্লাঘাট। অদূরেই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিওপি তামাবিল চেকপোস্ট এবং ভারতীয় ডাউকি চেকপোস্ট ও বাজার। সিলেট- তামাবিল-ডাউকি-শিলং মহাসড়কটি রাধানগর বাজার থেকে বড়জোর ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। রাধানগর বাজার থেকে দক্ষিণে গোয়াইনঘাট থানা সদরের দূরত্ব ছিল ৫ মাইলের মতো।

পাকবাহিনীর অবস্থান : বাংলাদেশ সীমান্তে যে সকল সম্ভাব্য এক্সিস (Axis) ধরে মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে মিত্রবাহিনী মুভ করতে পারে সেসব এক্সিসে পাকবাহিনী সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় অনেকগুলো শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান (Strong Point) প্রতিষ্ঠা করেছিল। এসকল Strong Point- এ প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়ে যাতে মাসের পর মাস যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় তার সর্ববিধ ব্যবস্থাই তারা ষরে রেখেছিল। শিলং-ডাউকি-তামাবিল-সিলেট এক্সিস-এ রাধানগর ছিল পাকবাহিনীর ঐ ধরনেরই একটি সীমান্তবর্তী 'শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান'। রাধানগর বাজার এলাকা, আলমনগর, ছোটখেল, কুমিল্লাবস্তি, মুরাবস্তিসহ এলাকাগুলো নিয়ে পাকবাহিনী একটি নিশ্ছিদ্র ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি এবং টর্চি স্বাউট-এর দুই কোম্পানি সৈন্য রাধানগর Strong Point- এ প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিল। পাকবাহিনীর এই প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্সের সদর দপ্তর ছিল রাধানগর-গোয়াইনঘাট সড়ক ঘেঁষা ছোটখেল গ্রামে। পাকবাহিনীর রাধানগর অবস্থানের ফায়ার সার্পোর্ট দেওয়ার জন্য গোয়াইনঘাটে ছিল ফিল্ড আর্টিলারি গানের একটি ব্যাটারি। তাছাড়া ৩৯ বালুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি, ১২ এ কে আর এফ, পাঞ্জাব রেঞ্জার এবং টর্চি স্বাউট-এর আরো এক কোম্পানি সৈন্য সার্বক্ষণিভাবেই Re-inforcement- এর জন্য গোয়াইনঘাটে প্রস্তুত থাকতো। গোয়াইনঘাটের সঙ্গে পাকা সড়কপথে পাকবাহিনীর দরবস্ত, জৈন্তা- ও খাদিমনগরের অবস্থানগুলোর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল। খাদিমনগরে ছিল পাকবাহিনীর ২০২ ব্রিগেডের সদর দপ্তর। এই বিগ্রেডের ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ। রেজিমেন্ট দুটি এসে অবস্থান নেয়। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে হাদারপার এলাকা থেকে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা, ডেল্টা এবং ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার কোম্পানিকে তামাবিলে নিয়ে আসা হয়। ৬ নভেম্বর লে. নবীর ডেল্টা কোম্পানিকে পাকবাহিনীর ছোটখেল গ্রামের অবস্থানের বরাবর ঠিক পশ্চিমের লুনি গ্রামে প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে

তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর লে. মনজুরের নেতৃত্বাধীন আলফা কোম্পানিকে পাকবাহিনীর রাধানগর বাজার অবস্থান বরাবর পূর্বের কাফাউরা ও বাউরিবাগ গ্রামে প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলতে বলা হয়। ব্রাভো ও চার্লি কোম্পানি দুটিকে ব্যাটেলিয়ন টু-আই-সি মেজর মোহসিনের কমান্ডে ছাতক সংলগ্ন এলাকায় রেখে ব্যাটেলিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল ডাউকিতে এসে আলফা ডেল্টা এবং ব্যাটেলিয়ান হেডকোয়টার কোম্পানির সঙ্গে অবস্থান নেন। সুবেদার মোশারফের নেতৃত্বাধীন এফএফ কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় লেফটেন্যান্ট নবী পার্শ্ববর্তী দুয়ারীখেল ও ছাত্তার গাঁ গ্রাম দুটি দখল করে নিয়ে তার প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর বিস্তৃতি ঘটান। নভেম্বর মাসের ১০/১২ তারিখের দিকে ব্যাটেলিয়ন অধিনায়ক বাঁশতলার সেক্টর হেডকোয়ার্টার সংলগ্ন বাংলা বাজার এলাকার প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে ইকো ও ব্রাভো কোম্পানি থেকে দুটি প্লাটুন এনে লে. নবীর কমান্ডে ন্যস্ত করেন। অতিরিক্ত সৈন্য পেয়ে ডেল্টা কোম্পানি কমান্ডার লে. নবী গোরা ও শিমুলতলা গ্রাম দুটিও দখল করে নিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলেন। গোরা ও শিমুলতলা গ্রাম দুটি দখল করে নেওয়ার ফলে গোয়াইনঘাটের সঙ্গে রাধানগর এলাকায় অবস্থানকারী সৈন্যরা FUP অবস্থানে নিরাপদে পৌছে যায়। কুয়াশার কারণে পাঁচ গজ দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। পুরো ডেল্টা কোম্পানি Extended Formation করে Assault Line- এর অবস্থানের দিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলে। এক লাইনে ডেল্টা কোম্পানির ১৫০ জন সৈনিক এগিয়ে চলে। তাদের সামনে দুটি রাস্তা খোলা- হয় জয় না হয় মৃত্যু। লাইনের একেবারে বাঁয়ের প্লাটুনের সঙ্গে এগিয়ে যান ব্যাটেলিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল। মাঝখানের প্লাটুনের সঙ্গে অবস্থান নেন ডেল্টা কোম্পানির কমান্ডার লে. নবী। কুয়াশার সুযোগ নিয়ে ছোটখেল গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত থেকে মাত্র ১৫০ গজ দূরে Assault Line তৈরির সিদ্ধান্ত সকলকেই FUP-তে অবস্থানকালেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। Assault Line- এ পৌছানোর পর সকলকেই স্টান্ডিং পজিশনে নিজ নিজ অস্ত্র থেকে ফায়ার করতে করতে একদৌড়ে ছোটখেল গ্রামে উঠে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রামে উঠেই প্রতিটি সৈনিককে একটি করে ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড শত্রুর বাঙ্কার লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এসে গেল। ছোটখেল গ্রামের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে পৌছেই ডেল্টা কোম্পানির ১৫০ জন সৈনিক একযোগে 'আল্লাহু আকবর, ইয়া হায়দার ও জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ছোটখেল গ্রামের পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর দিকে উঠে পড়ে। গ্রামে উঠেই অসংখ্য গ্রেনেড শত্রুর ওপর ছুড়ে মারা হয়। শত্রু হতবিহ্বল হয়ে প্রতিহত করার পরিবর্তে নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে এদিক-সেদিক দৌড়ে পালাতে থাকে। হাতাহাতি যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য যে সময়ের দরকার, তাও তাদের ছিল না। ছোটখেল গ্রামের উত্তর-পূর্ব

দিককার অবস্থান থেকেও গুলি নিক্ষেপের কোনো সুযোগ ছিল না। কেননা তাতে নিজ পক্ষেরই সৈনিকদের হতাহতের সম্ভাবনা ছিল। শত্রুপক্ষের সৈনিকদের অনেককেই আন্ডারওয়্যার পরে বা তোয়ালে পেঁচিয়ে খালি হাতেও দৌড়ে পালাতে দেখা গেল। পলায়নরত পাকসেনাদের বহুসংখ্যক সৈন্য ডেল্টা কোম্পানির সৈনিকদের গুলিতে ধরাশায়ী হতে লাগলো। ১০ থেকে ১২ মিনিটের মধ্যে পুরো ছোটখেল গ্রাম ডেল্টা কোম্পানির দখলে চলে আসে।

বিজয়ের আনন্দে ডেল্টা কোম্পানির সৈনিকরা কয়েকটি খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে গ্রামের উত্তর প্রান্তে মেজর শাফায়াত জামিল পাশের কাশবন হয়ে পলায়নরত এক পাকিস্তানি সৈনিকের গুলির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। তার সঙ্গে থাকা ৩/৪ জন সৈনিক আহত মেজর শাফায়াত জামিলকে কাঁধে করে পিছনের লুনি গ্রামের অবস্থানে নিয়ে যায়। সেখানে ব্যাটেলিয়ন আরএমও ডা. ওয়াহেদ মেজর শাফায়াতের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আহত মেজর শাফায়াত যেকোনো কিছুর বিনিময়ে ছোটখেল অবস্থানটি দখলে রাখাসহ প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশাবলী দিতে ডেল্টা কোম্পানির অধিনায়ক লে. নবীকে একটি চিঠি লিখে পাঠান। চিঠিটি লে. নবীর কাছে পৌছালে তিনি মেজর শাফায়াতের আহত হওয়ার বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য সৈনিকদ্বয়কে অনুরোধ করেন। ছোটখেল দখলের পর পরই লুনি গ্রামে অবস্থানকারী সুবেদার মোশাররফের (ইপিআর) এফএফ কোম্পানির বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা লুনি ও ছোটখেল গ্রামের মধ্যকার মাঠটিতে গ্রাম্য হাঁটাপথকে আড়াল করে দুই সারিতে উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে মুখ করে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়ে নেয়। তাতে করে লুনি গ্রাম থেকে ছোটখেল গ্রামে পৌছার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এছাড়া এই এফএফ কোম্পানির অন্তত ৭০/৮০ জন মুক্তিযোদ্ধা ডেল্টা কোম্পানির প্লাটুনগুলোর সঙ্গে বাঙ্কারে অবস্থান নিয়ে নেয়।

পাকবাহিনীর প্রতিআক্রমণ প্রতিহত ডেল্টা কোম্পানি কর্তৃক ছোটখেল দখলের সংবাদ ওয়াকিটকি সেটের মাধ্যমে ডাউকিতে অবস্থানরত ১০১ কমিউনিকেশন জোনের জিওসি মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং গিল এবং ই-১ সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রাজ সিংকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাধানগরে গুর্খাদের পূর্বনির্ধারিত আক্রমণটি পরিচালিত না হওয়ার কারণে ছোটখেলে টিকে থাকা ডেল্টা কোম্পানির জন্য দু:সাধ্যে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি কর্নেল রাজ সিংকে জানানো হলে তিনি ঐদিন দুপুরের মধ্যেই গুর্খাদের আক্রমণ পরিচালনার নিশ্চয়তা দেন। ডেল্টা কোম্পানি কর্তৃক ছোটখেল দখল করে নেওয়ার ফলে শত্রুদের রাধানগরের সঙ্গে গোয়াইনঘাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ছোটখেল পুনর্দখলের জন্য পাকবাহিনীর যে বেপরোয়া হয়ে প্রতি আক্রমণ চালাবে তা অধিনায়ক লে. নবীর জানা ছিল। পাকবাহিনীর প্রতিআক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অ্যামুনিশন এবং ভারী অস্ত্র-শস্ত্রের। ছোটখেল অবস্থানে

পাকবাহিনীর ফেলে যাওয়া কয়েকটি হেভি মেশিনগান, মিডিয়াম মেশিনগান, লাইট মেশিনগান এবং অজস্র অ্যামুনিশন ভীষণ কাজে লাগে। পাকবাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্রগুলো ডেল্টা কোম্পানির ফায়ার পাওয়ার বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। পাকবাহিনীর মজবুত বাঙ্কারগুলোও প্রতিরক্ষার কাজে সাহায্যে করে। পাকবাহিনী যে পরিমাণ অ্যামুনিশন ফেলে গিয়েছিল তা একটি ব্যাটেলিয়নের এক হাজার সৈনিক দৈনিক ২৪ ঘন্টা করে গুলি নিক্ষেপ করলেও এক বছরে শেষ হবে না। সুবেদার মোশারফের এফএফ কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্লাটন ভিত্তিক প্রতিটি বাঙ্কারে পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যামুনশিন পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়। ছোটখেলে পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্তা এমনই নিশ্ছিদ্র এবং নিখুঁত ছিল যে, এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে বা এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার জন্য গভীর কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ ছিল। গুলিগোলার মধ্যেও হেঁটে এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়া যেতো।

গোয়াইনঘাট থেকে ব্যাপক আর্টিলারির গোলা নিক্ষেপের মাধ্যমে সকাল ৮টার দিকেই পাকিস্তানিদের ব্যাপক প্রতিআক্রমণই শুরু হয়। ডেল্টা কোম্পানির বীর সৈনিকরা এই প্রতিহামলা প্রতিহত করে। প্রতি দুই ঘন্টা পর পর এদিন কয়েকবারই ছোটখেল অবস্থানের ওপর পাকবাহিনী প্রতিআক্রমণই চালিয়ে যায়। কিন্তু ডেল্টা কোম্পানির সৈনিকরা পাকবাহিনীর প্রতিটি প্রতিআক্রমণই (Counter Attack) প্রতিহত করে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত রাধানগর দখলের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২৯ অক্টোবর দুপুর পর্যন্ত মিত্র বাহিনীর রাধানগর আক্রমণের অপেক্ষায় থেকে ডেল্টা কোম্পানির কামন্ডার লে. নবী নিজ উদ্যোগেই রাধানগর শত্রুমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। এদিন বিকাল ৪টা থেকে রাধানগরকে ঘিরে অবস্থান নেওয়া সুবেদার মোশাররফ, লে. মতিউর রহমান, হাবিলদার রফিক, মুজাহিদ ক্যাপ্টেন দাউদ এবং ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানির অধিনায়ক লে. মনজুরকে নিজে নিজ কোম্পানির সম্মুখবর্তী অবস্থানগুলোর ওপর একযোগে আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন।

রাধানগর শত্রুমুক্ত ২৯ অক্টোবর বিকাল থেকেই এফএফ ও এমএফ কোম্পানিগুলো একযোগে রাধানগর দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে শুরু করে। এদিন সন্ধ্যার পরপরই উত্তর-পূর্ব দিক থেকে পাকবাহিনী ছোটখেল অবস্থানের ওপর এক ভয়াবহ আক্রমণ করে বসে। এক পর্যায়ে দুপক্ষের মধ্যে গ্রেনেড ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে যায়। ডেল্টা কোম্পানির সৈনিকরা নিজ নিজ বাঙ্কারে অবস্থান নিয়ে শত্রুর প্রতিআক্রমণ মোকাবিলা করে। শত্রুর ৩৯ বালুচ রেজিমেন্টের কোম্পানিটি আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে গোয়াইনঘাটের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এদিন রাত ৮টার দিকে ইসলামপুর, কুমিল্লাবস্তি, ভিত্রীখেল, বাউরিবাগ এবং কাফাউরা গ্রামসহ সর্বত্রই মুক্তিযোদ্ধারা খড়ের গাদা ও ছনের ঘরগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেন। আগুনের

লেলিহান শিখায় পুরো এলাকা আলোকিত হয়ে যায়। লে. মতিউর এবং মুজাহিদ ক্যাপ্টেন দাউদের এফএফ কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা জাফলং চা বাগানের অবস্থা ছেড়ে নদী পার হয়ে রাধানগর বাজারের কাঁচা দোকান ও ঘরগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কোম্পানিটি রাধানগরের সম্মুখবর্তী অবস্থান ছেড়ে আলমনগরে সুলতান মেম্বারের বাড়ি আশপাশ ধরে সড়কের ওপর খননকৃত বাঙ্কারগুলোতে অবস্থান নেয়। ৩০ নভেম্বর ভোর ৪টার দিকে এই কোম্পানিটি ডেল্টা কোম্পানির ছোটখেল অবস্থানের ওপর এক আত্মঘাতী হামলা চালায়। ডেল্টা কোম্পানির সৈন্যরা নিজ নিজ অবস্থানে অটল থেকে যায়। শেষ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এরাও গোয়াইনঘাটের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। টর্চি ব্যাটেলিয়নের কিছু সৈনিক ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে তাদের অবস্থানে থেকে যায়। এরা পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈনিকদের সঙ্গে পশ্চাদপসরণে ব্যর্থ হয়েছিল।

৩০ নভেম্বর সকাল ৬টার দিকে শত্রুপক্ষ থেকে গুলিগোলা নিক্ষেপ বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, শত্রু রাধানগর ছেড়ে চলে গেছে। এদিন সকাল ৮টার মধ্যেই রাধানগর সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। এখানে সেখানে লুকিয়ে থাকা ৮ জন শত্রু সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দি হয়। এদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে ডাউকি বিএসএফ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুক্তিবাহিনী কর্তৃক রাধানগর দখলের সংবাদ সকাল ৮টার সময় ডাউকি বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছে যায়। এ সময় মিত্রবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসারগণ রাধানগর আক্রমণের জন্য এক আলোচনা সভা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সংবাদটি প্রথমে তাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল। আর তাই মুক্তিবাহিনী কর্তৃক রাধানগর দখলের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তারা বিএসএফ-এর মেজর রাওয়ের নেতৃত্বে একটি সেনাদল রাধানগরে পাঠান। মেজর রাও যখন রাধানগর বাজারে পৌঁছেন, তখন মুক্তিযোদ্ধারা রাধানগর হাইস্কুল প্রাঙ্গনে একত্রিত হয়ে বিজয় উৎসব পালন করছিলেন। এলাকার সকল মুক্তিযোদ্ধাকে একত্রিত করে ঐ সময় অপারেশনের অধিনায়ক লে. নবী মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে একটি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে পরবর্তী কার্যক্রম সম্বন্ধে ব্রিফিং দিচ্ছিলেন। লে. নবী এগিয়ে গিয়ে মেজর রাওকে রাধানগর দখলের সংবাদ জেনারেল গুরুবক্স সিং গিল, ব্রিগেডিয়ার ওয়াকে এবং কর্নেল রাজ সিংসহ সকলকে জানিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। মেজর রাও এ সংবাদ নিয়ে ডাউকিতে ফিরে যান।

অপারেশনের ফলাফল : মুক্তিবাহিনী কর্তৃক ছোটখেল ও রাধানগর দখলের ফলে ছাতক-সুনামগঞ্জ- ভোলাগঞ্জ-তামাবিল-ডাউকি-মুক্তারপুর সীমান্ত এলাকার সবচেয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানটির পতন ঘটে। রাধানগরের পতনের সংবাদ বিদ্যুৎবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল লক্ষগুণ বেড়ে যায়। পশ্চিমে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ছাতক ও কোম্পানিগঞ্জ এবং পূর্বে মুক্তারপুর, কানাইঘাট, কমলাগঞ্জ, মৌলবীবাজার ও শ্রীমঙ্গল এলাকার

মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্তবর্তী শত্রুর প্রতিটি অবস্থানের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ পরিচালনায় ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে। ৩/৪ দিনের মধ্যেই সীমান্তবর্তী পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোর পতন ঘটতে শুরু করে।

২৪ দিন স্থায়ী এই অপারেশনে মুক্তিবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ জন। ডেল্টা কোম্পানির ৪ জন সৈনিক শাহাদৎবরণ করেন। গুরুতর আহতের মধ্যে ছিলেন ব্যাটেলিয়ন অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল, ব্রাভো কোম্পানি থেকে আগত প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার হাবিব এবং ল্যান্স নায়ক মুজিবসহ আরো কয়েকজন। মিশুলতলা গ্রামে নিজ বাঙ্কারে অনড় থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে সুবাদার হাবিবের (ইপিআর) দুটি পা-ই শত্রুর গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে অচল হয়ে গিয়েছিল। গুরুতর আহত সুবেদার হাবিবকে শিমুলতলার গ্রামবাসী গভীর রাতে কাশবনের আড়ালে ডেল্টা কোম্পানির দুয়ারিখেল গ্রামের অবস্থান নিয়ে এলে তাকে চিকিৎসার জন্য ডাউকি বিএসএফ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মেজর শাফায়াত জামিলকেও প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাউকি বিএসএফ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময় সুবেদার হাবিবকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। আর মেজর শাফায়াত জামিলকে ভূষিত করা হয় বীর বিক্রম খেতাবে। যদিও বীর উত্তম খেতাবই ছিল তার নিম্নতম প্রাপ্য। শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা ছিল অগণিত। স্থানীয় জনগণ এলাকার কাশবন থেকে শত্রুর অনেকগুলো লাশ একত্র করে দাফনের ব্যবস্থা করেছিল। রাধানগর অপারেশনটি পরিচালনা করে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকবৃন্দ এবং স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা (এফএফ) প্রমাণ করেছে যে, তারা পৃথিবীখ্যাত দুর্ধর্ষ গুর্খাদের চেয়েও সাহসী যোদ্ধা। অকৃত্রিম দেশপ্রেম এবং দেশের আপামর জনতাকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় সঙ্কল্পই মুক্তিযোদ্ধাদের গুর্খাদের চেয়েও বেশি সাহসী যোদ্ধায় রূপান্তরিত করেছিল। পৃথিবীখ্যাত গুর্খাদের দিয়ে যা সম্ভব হয়নি- লুঙ্গিপরা বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা তা সম্ভব করেছে। আমাদের মহান স্বাধীনতার জন্য গুর্খারাও অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা মিত্রবাহিনীর এসকল বীর সৈনিকদের কাছে ঋণী হয়ে আছে।

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো

সাদেক হোসেন খোকা

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকরা হঠাৎ আমাদের ওপর এক অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। জাতি হিসেবে আমরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম। তখন সময়টা ছিল যেন-হেলাল হাফিজের কবিতার মতো 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।' তরুণ-যুবারা কী এক অমোঘ আকর্ষণে সব মায়ার বাঁধন পেছনে ফেলে জীবন বাজি রেখে দলে দলে যোগ দিয়েছিল দেশ মাতৃকার মুক্তির এই লড়াইয়ে। লাখো মুক্তিযোদ্ধার মতো আমরাও গিয়েছিলাম রণাঙ্গণে। যারা বেঁচে ফিরেছি তারা স্বাধীন দেশের মুক্ত হওয়ায় বুক ভরে নি:শ্বাস নেয়ার সুযোগ পেয়েছি; কিন্তু আমাদের কতো সহযোদ্ধা আর ফিরে আসেনি। যখনই পেছন ফিরে নষ্টালজিক সে সব দিনের কথা ভাবি হারিয়ে ফেলা সাথীদের জন্য বুকের ভেতরে হাহাকার করে ওঠে। আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম মা'কে এমনকি পরিবারের অন্য কাউকে কিছু না জানিয়েই। আমার মতো বেসামরিক জনগণের মধ্য থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের বেশির ভাগেরই অংশগ্রহণ ঘটেছিল নাটকীয়তাহীভাবে। সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বলে কয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা যুদ্ধে যোগ দেননি। যে যেভাবে পেরেছেন বা যে যেখানে ছিলেন সেখান থেকেই চলে গেছেন। অনেক মা-বাবাই হঠাৎ এক সময় খেয়াল করলেন তাদের কোনো কোনো সন্তান আর ঘরে নেই, স্ত্রী দেখলেন স্বামী ঘরে নেই, বোন দেখলেন ভাইটি লাপাত্তা। তারা সবাই একটা নতুন দেশের জন্ম, একটা জাতির মুক্তির সংগ্রামে অংশ নিতে ঘর ছেড়েছে। একদিকে মা, আরেক দিকে মাতৃভূমি। মাতৃভূমির ডাকে ছুটে গেলাম মুক্তিযুদ্ধে, কিন্তু মাঝে মধ্যে মায়ের স্নেহাস্পর্শ পাওয়ার তৃষ্ণায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠতো। তাই সুযোগ করে যুদ্ধ চলাকালে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলাম, অবশ্যই ঝুঁকি নিয়ে রাতের বেলায় গোপনে। সকালে নিজ হাতে নাস্তা বানিয়ে পাশে বসে খাওয়াতে খাওয়াতে মা জানতে চাইলেন আমি যুদ্ধে না গেলে কী ক্ষতি হতো? কারণ তোমার হাতে কোনো মানুষ খুন হোক তা আমি চাই না।' ভাবনায় পড়ে গেলাম, মাকে কী করে বুঝ মানাই। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম মা আমাকে যেতেই হবে। আর আমরা তো যুদ্ধই করছি পাকিস্তানি দখলদারদের মেরে এবং ভয় দেখিয়ে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে। তিনি যখন দেখলেন আমাকে ফেরানো যাবে না তখন বললেন, 'আমাকে কথা দাও অন্যায়ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে হত্যা করতে পারবেনা।' মায়ের কথায় রাজি হয়ে তাকে

প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, 'অন্যায়ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় ধরে এনে কোনো মানুষ হত্যা করবো না।' যাহোক প্রিয় মাকে দেয়া অঙ্গীকার আক্ষরিক অর্থেই রক্ষা করেছিলাম। পরবর্তীতে যুদ্ধ শেষে আটক বহু মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীকে আইনের হাতে সোপর্দ করেছিলাম।

একাত্তরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। বামপন্থি রাজনীতির সেই স্বর্ণ যুগে আমিও ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম (কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য)। ২৫ মার্চের কালো রাত্রির হত্যাযজ্ঞের পরে পুরো জাতি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ক্ষোভ-যন্ত্রণা, অপমান আর প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহায় ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি। একাত্তরের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন নেতা রুহুল আমীন এবং গোপীবাগের মাসুদ (বুড়া) সহ বেশ কয়েকজন মিলে প্রথমে যাই নরসংদীর শিবপুরে। ওখানে কয়েক দিন অবস্থানের পর যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়ার জন্য আমরা রওনা দেই আগরতলার উদ্দেশ্যে। আগরতলায় আমাদের রিসিভ করেন শহীদুল্লাহ খান বাদল। ওখানে পৌছে প্রথমে বটতলাস্থ সিপিএম অফিসে গিয়ে মেনন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে চলে যাই ২ নম্বর সেক্টরে। খালেদ মোশাররফ ছিলেন সেক্টর কমান্ডার। মেজর হায়দারের নেতৃত্বে ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। ২ নম্বর সেক্টরের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। দুই নম্বর সেক্টরের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের- নাম ছিল 'মেলাঘর'। এই ক্যাম্প বামপন্থী (আওয়ামী লীগ বহির্ভূত) মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি; একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় পুরো জাতি অংশগ্রহণ করেছিল। তাই এটা ছিল জনযুদ্ধ। মাতৃভূমির কিছু চিহ্নিত বিশ্বাসঘাতক ছাড়া দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ দেশের মানুষ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

মেজর হায়দারের অধীনে তিন সপ্তাহ গেরিলা ট্রেনিং শেষে আমাদের সম্মুখযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে পরিচালিত কোনাবন সাব সেক্টরে পাঠানো হয়। আমরা গভীর রাতে সেখানে গিয়ে পৌছাই। এখানে দুই সপ্তাহ ট্রেনিং এর প্রথম দিন সকালে তিনি আমাদের ৪০ জনকে ২০ জন করে দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে যেতে বললেন। কিন্তু আমরা কোনভাবেই দুটি গ্রুপ হতে পারছিলাম না। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন এক লাইনে দাঁড়ানোর। আমি আর আমার বন্ধু জাকির দাঁড়ালাম পাশাপাশি যাতে এক গ্রুপে থাকতে পারি। কিন্তু তিনি নির্দেশ দিলেন প্রথম থেকে বেজোড় (১,৩,৫) এক গ্রুপে, জোড় (২,৪,৬) আরেক গ্রুপে। ফলে আমি আর জাকিরের মতো অনেকেই যারা এক সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন পড়ে গেছেন ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে। আমাদের মন খারপ হয়েছে লক্ষ করে টগবগে প্রাণবন্ত ক্যাপ্টেন গাফফার বললেন, 'তোমরা দেশ মাতৃকার জন্য যুদ্ধ করতে এসেছ। এখানে মান অভিমান আবেগের কোনও মূল্য নেই। তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যার যতই ভালো হোক না কেন, সকলেই এখানে

সাধারণ সৈনিক'। ওখানে ট্রেনিং শেষ করার পর প্রথম দিকে কসবা-মন্দভাগ (মির্জাপুর) বর্ডার এলাকার সাব সেক্টরে কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেই। এসব যুদ্ধে ক্যাপ্টেন গাফফার সরাসরি অংশ নিতেন এবং শত্রুর বাঙ্কারের কাছাকাছি তিনি চলে যেতেন। তার সাহসিকতা দেখে আমরা দারুণ অনুপ্রাণিত হই। এখানে যুদ্ধ করেই মূলত এসএমজি, এসএলার ও চাইনিজ রাইফেলসহ বিভিন্ন অস্ত্র পরিচালনা ও সরাসরি যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করি। ওখানেই একটি যুদ্ধে প্রবল সাহসিকতা দেখিয়ে শহীদ হন গোপিবাগ এলাকার কৃতী সন্তান ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাকির হোসেন। আমাদের গ্রুপের পুলিশের একজন হাবিলদার ছিলেন, তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যদের মতো অতটা যুদ্ধ কৌশল না জানলেও তার মধ্যে বেশ সাহসিকতা ছিল। এক ধরনের রোমান্টিকতা তার মধ্যে কাজ করতো। একদিন তিনি জাকিরদের একটি গ্রুপ নিয়ে পাকিস্তানি আর্মির একটা বাঙ্কার রেইড করতে যান। ওরা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে ক্রলিং করে এগুচ্ছিল তাতে ধান গাছ নড়ছিল, এটা দেখে গুলি চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। তাদের একটি গুলি এসে লাগে মতিঝিল কলোনি এলাকার নবম শ্রেণীর ছাত্র মোস্তাকের হাতে। ও পাশে থাকা জাকিরকে ডেকে বলে, 'জাকির ভাই আমার গুলি লেগেছে'। ঘাড় উঁচু করে সেদিকে তাকাতেই আরেকটি গুলি এসে জাকিরের কানের নিচে লেগে ভেদ করে বেরিয়ে যায়। পরে আরো মুক্তিযোদ্ধারা গিয়ে আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের হটিয়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং বাংলাদেশের মাটিতেই তাকে দাফন করা হয়। ট্রেনিং শেষে আমাকে একটি গেরিলা গ্রুপের কমান্ডার করে ঢাকায় পাঠানো হয়। এই গ্রুপে আগরতলা থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা যোদ্ধা ছিল ৪০ জন এবং এখানে এসে আরো ২৫ জন রিক্রুট করি। ঢাকায় আসার আগের দিন মেজর হায়দার গেরিলা যুদ্ধ এবং শত্রু এলাকায় অবস্থানকালে কী কী বিষয় অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে সে বিষয়ে একটা ব্রিফিং দেন। স্লিপিং গাউন পরা মেজর হায়দার মোহনীয় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছিলেন; যা আজো আমার স্মৃতিতে একটা জীবন্ত দৃশ্য হয়ে বিরাজ করছে। তখন ঢাকার আয়তন এবং জনসংখ্যা আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল। আর পাকবাহিনীর দখলদারিত্বের কারণে এই শহরের বহুলোক নিরাপত্তার অভাবে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। ফলে লোকসংখ্যা আরো অনেক কমে গিয়েছিল। আমাদের আগেও কয়েকটি গ্রুপকে গেরিলা অপারেশনের জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ অসাবধানতার জন্য পাকিস্তানি আর্মির হাতে ধরাও পড়েছিলেন।

অপারেশন শুরুর আগে আমরা অগ্রবর্তী গ্রুপগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করি। আমার সঙ্গী যারা ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রিয় পপ গায়ক আজম খান, ইকবাল, সুফী, আলমাস লস্কর, কাজী মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, মোহাম্মদ শফি, খুরশিদ, আব্দুল, মতিন, আবু তাহের, মোহাম্মদ বাশার, খন্দকার আবু জায়েদ জিন্নাহ, ফরহাত জামিল ফুয়াদ, মোহাম্মদ শামসুল হুদা,

ড. নিজাম, জাহের কচিসহ আরো অনেকে। ঢাকার সন্তান হিসেবে এই শহরের প্রতিটি অলিগলি ছিল আমাদের নখদর্পণে। অন্যদিকে পাকিস্তানি দখলদারদেরও কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল ঢাকায়। তখন পাকিস্তানি শাসকরা বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাচ্ছিল। আমরা সংকল্প করলাম ঢাকায় বড় কিছু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের প্রচারণার অন্ত:সারশূন্যতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবো। ঢাকায় আসার আগে মেজর হায়দার যে ব্রিফিং দিয়েছিলেন তা যুদ্ধকালীন সময়ে যথাযথভাবে মেনে চলেছি। একক সিদ্ধান্ত না নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা করে অগ্রসর হই। তাই আমাদের সবগুলো অভিযানই সফলতা পেয়েছিল। গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল যেমন হিট এ্যান্ড রান, জনগণের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করা, শত্রুপক্ষকে সবসময়ই অস্থির রাখা, সাফল্য নিয়ে বেশি উৎফুল্ল না হওয়া, নিজেদের নিরাপত্তার কথা স্মরণে রাখা, যুদ্ধে নিজেরা যতটা সম্ভব কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা, প্রমাণাদি একেবারেই সাথে না রাখা, ইত্যাদি মেনে চলেছি। এমন সব জায়গায় আমরা সফল অপারেশন করেছি যে, আজো ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে (নভেম্বর) আমাদের আরেকটি সফল অপারেশন ছিল বিডিআরএর গেটে। এই অভিযানে অনেক প্রাণহানি হয়েছিল। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স লি. এখানে সে সময় সার্ভের কাজ করছিল।

প্রতিষ্ঠানটির মালিক মজিদ সাহেব ছিল মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষ। এই ঠিকাদার ফার্মটির ইঞ্জিনিয়ার মান্নান এবং ইঞ্জিনিয়ার আনিসুল ইসলাম আমাদের সহায়তা করেন। তাদের সহায়তায় দিনমজুর সেজে পিলখানার অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যাই। দিনমজুরদের যে দলটির সঙ্গে আমি ভেতরে যেতাম সে দলের একজন ছাড়া কেউ আমার আসল পরিচয় জানতো না। একদিন কাদামাটি গায়ে ঝিগাতলার গেইট দিয়ে বের হচ্ছি এমন সময় মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন এনএসএফ- এর তৎকালীন নেতা মাহবুবুল হক দোলন আমাকে চিনে ফেলেন, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খোকা না? একী হাল?' আমার তখন ভয় ও বিব্রতকর অবস্থা। সংক্ষেপে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর দ্রুত মিশে গেলাম জনতার মধ্যে। এভাবে বেশ কয়েকদিন পিলখানার অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যাই। আমি উত্তেজনা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পিলখাণার অভ্যন্তরের সবকিছু দেখে নিচ্ছি। কোথায় কোথায় অবজার্ভেশান পোস্ট আছে পরখ করে নেই। যদিও আমাদের মূল লক্ষ ছিল পিলখানার অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ ঘটানো। সম্ভব হলে তাদের অস্ত্র ভাণ্ডারের কাছাকাছি। কিন্তু সার্ভের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় ভেতরে বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে আজিমপুর কবরস্থান সংলগ্ন গেট এলাকায় আমরা প্রচণ্ড গ্রেনেড হামলা চালিয়ে তৎকালীন ইপিআরে বাহিনীর বেশ ক্ষয়-ক্ষতি ঘটিয়েছিলাম। রাতের বেলায় পরিচালিত এই হামলার সময় একটি গুলি দেয়ালে লেগে দিক পরিবর্তন করে আমার

পায়ে এসে লাগে। দুইদিন পর একটি ক্লিনিকে গিয়ে ওটা অপারেশন করে তুলে ফেলি। ঢাকায় পৌঁছে অনেকগুলো বড় ধরনের অপারেশন করি। ঢাকায় যুদ্ধরত অন্য গ্রুপগুলোও তটস্থ করে তুলেছিল পাকিস্তানি বাহিনীকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা দখলদারদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তবুও পাকিস্তানিদের মিথ্যা প্রচারণায় মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতো। তখন সিনেমা হলগুলোতে 'শো'য়ের আগে 'চিত্রে পাকিস্তানি খবর'শিরোনামে ডকুমেন্টারি দেখানো হতো। এতে হানাদাররা প্রমাণ করতে চাইত যে সব ঠিকঠাক চলছে। ডিএফপিতে মিথ্যাচারে পূর্ণ এই ডকুমেন্টারিগুলো তৈরি হতো।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মতো আমারো জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের কথা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের কথা ভাবলেই মন নস্টালজিয়ার ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মন শুধু রণাঙ্গণের সাহসী সহযোদ্ধাদের হারানোর স্মৃতিতেই ভারাক্রান্ত হয় না, তারচেয়েও বেশি হয় মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন-চেতনার দুর্দশা দেখে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা স্বপ্ন যাই বলি না কেন সেটা শুধু একটি ভূ-খণ্ডের স্বাধীনতা নয়, একটি সার্বিক মুক্তিই ছিল এই মহান যুদ্ধের মূল স্পিরিট। তাই এর নাম হয়েছিল 'মুক্তিযুদ্ধ' স্বাধীনতা যুদ্ধ নয়। মূলত ব্রিটিশ বেনিয়াদের রেখে যাওয়া সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও মানবিক সমাজ গঠনই ছিল স্বপ্ন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এ জাতির একটি সামষ্টিক মুক্তির লক্ষ থেকে। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই আমরা সামষ্টিক উন্নয়নের চিন্তা বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলাম। জাতীয় মুক্তি না এলেও একটি স্বাধীন দেশতো আমরা পেয়েছি। যেখানে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে দেশকে গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারছি, স্বপ্ন দেখতে পারছি সুন্দর আগামীর। আমাদের জাতীয় জীবন থেকে হয়তো দীর্ঘ ৩৮টি বছর চলে গেছে, কিন্তু সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ তো এখনো সামনে পড়ে আছে। যে জাতি প্রাণ-ধন-মানসহ জীবনের সকল ঐশ্বর্য বাজি রেখে দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধে নামতে পারে সে জাতি পিছিয়ে থাকতে পারে না, থাকবে না; এ বিশ্বাস রাখতে চাই। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে মর্যাদাপূর্ণ জায়গা অর্জন করে নেবে।

যাঁদের জীবনের বিনিময়ে বেঁচে আছি
নাসির উদ্দিন ইউসুফ

ঘুম নেই। চোখের ক্লান্ত পাতা দু'টো ভারী হয়ে নেমে আসে চোখের ওপর। চারদিকে চেপে বসা অন্ধকার। রাত দুটো। চোখ দু'টোর ঠিক পাতার নিচে ওদের ছায়া। নড়ে চড়ে উঠে আসে। ওরা হেঁটে বেড়ায়। আমি ঘুমোতে পারি না। এমনি করে নিদ্রাহীন রাতগুলো যায়। ঐ তো মানিক, একগাল দাড়ি......। ঐ যে দৌড়ে আসছে অসংখ্য বুলেটবিদ্ধ বুক নিয়ে কিশোর টিটো। আর, আর এইখানে সন্তপর্ণে রক্তাক্ত বুকে নি:শব্দে নৌকা চালিয়ে যায় তিতাসের মাঝি। আমি বেঁচে আছি। শুয়ে আছি ভাঁজহীন শুভ্র বিছানায়।

আমার কষ্ট হয়। হাতের তালু ঘেমে ওঠে। পল্টনের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরের একটা ঘুণ পোক ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, ক্ষত তৈরি করতে থাকে।

বসে থাকি আমি। ঘুমোতে পারি না। চোখ বুজলেই আলো আঁধারিতে চোখের পাতার কোল ঘেঁষে নি:শব্দে নৌকা চালিয়ে যায় তিতাসের নাম না জানা মাঝি। বুক হতে তার অবিরল ঝরছে রক্তস্রোত। আমি তিতাসের নাম না জানা মাঝির জীবনের বিনিময়ে বেঁচে আছি। গুলিটা আমার বুকে লাগতে পারতো। আমাকে এক ধাক্কায় পাটাতনের ওপর শুইয়ে দিয়ে সে নিরাপদ জায়গায় দ্রুত নৌকা নিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারে এক ঝাঁক গুলি ওকে ছিটকে পানিতে ফেলে দেয়। আমি অন্ধকারে তার রক্ত পানিতে মিশে যেতে দেখেছিলাম। আমি এখনো সেই রক্তের উষ্ণ গন্ধ পাই। এখনো নদী দেখলে আমার কষ্ট হয়।

আমরা বায়ান্নজন গেরিলা ঢাকায় আসছিলাম। আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের পূবদিকের সীমান্ত গ্রাম মনিঅন্দ-এ আমাদের শিবির। ট্রেনিং শেষ-এখন ঢাকায় যাচ্ছি। আমরা আখাউড়া- ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেললাইনের একটি ছোট্ট কালভার্ট অতিক্রম করেছি। আর একটু এগোলে সাইদাবাদ পুল। ওটা সিএন্ডবি রোড। ওখানে কড়া পাহারা আছে রাজাকারদের। আগেই যোগাযোগ হয়েছিল তাদের সাথে। যেতে অসুবিধা নেই। ওরাই পার করে দেবে না দিলে ওরা জানে ক্যাম্প উড়িয়ে দেয়া হবে। সিএন্ডবি রোড তখনো দখলদার বাহিনীর হাতে।

সীমান্ত এলাকার অনেক বাঙালি রাজাকার এমনিভাবে সাহায্য করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের। ঐ তো দেখা যাচ্ছে সাইদারবাদ ব্রিজ। আমাদের সামনে ফরিদপুরের দল।

আমরা তাদের পেছনে। রাত কত হবে? প্রায় একটার কাছাকাছি। ঐ ভয়াবহ স্থানটি পার হলে আমরা নিরাপদ। কিন্তু তখনো আমরা জানতাম না সেদিন দখলদার

বাহিনী রাজাকারদের সরিয়ে নিজেরাই ব্রিজের দায়িত্ব নিয়েছে। যখন বুঝতে পেরেছি তখণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। অন্ধকার ভেদ করে প্রচণ্ড শব্দে শত্রুর স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান আর মর্টারের শেলে আমরা বিপর্যস্ত। অতর্কিত আক্রমণে আমরা দিশেহারা। মৃত্যু চিৎকার আর কান্নাকে ছাপিয়ে শত্রুর গোলার আওয়াজ। আমার নৌকার মাঝি ত্বরিতগতিতে নৌকা ঘুরিয়ে- পিছে ফেলে আসা একটা মাটির চারের আড়ালে নৌকা নেয়ার জন্য দ্রুত বেয়ে যাচ্ছে।

নৌকার চারদিকে পানিতে টুপটাপ গুলির শব্দ। আমি নৌকা হতে দেখতে চাচ্ছি কোথায় আমাদের দলের অন্য নৌকাগুলো। মাঝি ততক্ষণে মাটির চারের কাছে নৌকা এনে বাঁক নিয়েছে। হঠাৎ সে আমাকে ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো- শুইয়ে পড়েন। গায়ে গুলি লাগতে পারে। আমি ও ওকে পাল্টা বলতে যাচ্ছি এমন সময় এক ঝাঁক গুলি ওকে উড়িয়ে নিয়ে পানিতে ফেলে দিলো। আমাদের নৌকা তাল সামলাতে সামলাতে মাটির চারের আড়ালে চলে গেল। আমি দেখলাম মাঝির শরীর পানিতে দাপাদাপি করছে। কিছুক্ষণ পর দেহটি আর দেখা গেল না।

সে মাঝিটির নাম জানা হয়নি। কোনোদিন জানা হবে না। অথচ আমি বেঁচে আছি, সেই মাঝির জীবনের বিনিময়ে। বেঁচে আছি ঠিকই। কিন্তু অনেকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। পারি না মানিকের মা'র সামনে যেয়ে দাঁড়াতে।

যুদ্ধের সময় মানিকের মা আমাকে বলেছিল-'মানিক আমার একমাত্র ছেলে ওকে একটু দেখো।' আমি মানিকের মা'র কথা রাখতে পারিনি। মানিক চলে গেল। মানিকেরা মরে যায়-তারপর আসে স্বাধীনতা।

নভেম্বর চৌদ্দ তারিখ'৭১ সাল। ঢাকা-আরিচা রোডের ভায়াডুবি ব্রিজ অপারেশন। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে আমরা ঐ ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। পঞ্চান্ন জনের একটি দল নিয়ে আমরা আক্রমণ পরিকল্পনা করলাম। অপারেশনের নেতৃত্বে আমি। ব্রিজ দখল করতে দুই মিনিট সময় লেগেছিল সেদিন সাবু। মাত্র পাঁচজন-সাবু, ওয়াজেদ, আশরাফ, হাকিম আর আমি ব্রিজ দখলের জন্য ব্রিজের দিকে এগোলাম। তখন রাত পৌনে দশটা। রাস্তার ঢালু ধরে এক নাগাড়ে প্রায় তিনশত গজ ক্রল করে আমরা ব্রিজের কাছে চলে এলাম।

পেছনে আরো পঞ্চাশ জন যোদ্ধা অপেক্ষা করছে আমাদের বিজয়ের জন্য। আমরা দেখলাম মাত্র পনেরো গজ দূরে দখলদার বাহিনীর প্রহরী দু'জন হাঁটছে। গড়িয়ে আমরা রাস্তায় উঠে এলাম। বাঁধানো রাস্তার ওপর পাশাপাশি শুয়ে আমরা আক্রমণ শুরু করলাম। ওয়াজেদের দুই ইঞ্চি মর্টার শেল অব্যর্থ লক্ষ হানলো শত্রুর বাংকারে। আশরাফের এলএমজি, সাবুর এলএমজি আর আমার প্রিয় চাইনিজ রাইফেল সমানে গর্জে উঠলো। সময় নির্ধারণ ছিল এক মিনিট। এক মিনিটের মধ্যে দখল করতে হবে ব্রিজ। এক মিনিট পার হয়ে গেল। তখনো শত্রুর দু'একটি গুলি বিক্ষিপ্তভাবে ছুটছে। সাবু হঠাৎ লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে তার এলএমজি হাতে নিয়ে অনবরত গুলি করতে করতে ছুটে গেল ব্রিজের ওপর। আমরা তাকে যন্ত্রচালিতের

মতো অনসুরণ করলাম। সাবুর মুখ দিয়ে তখন শুধু 'ইয়া আলী' ধ্বনি। শত্রু সৈন্য পালাতে লাগলো। সাবু তাদের ধাওয়া করতে করতে হত্যা করছে। দ্রুত আমরা কাজ শুরু করলাম।

মানিকগঞ্জের দিকে ফ্লাঙ্ক-১ এবং ঢাকার দিকে ফ্লাঙ্ক-২। মানিক আর সাবু ফ্লাংক-২এ। আমি তখন ব্রিজের চার্জ বসাতে ব্যস্ত। হঠাৎ দেখলাম মানিকগঞ্জের দিক হতে ছুটে আসছে শত্রু সৈন্যের গাড়ি। ভীত হয়ে পড়লাম। ফ্লাঙ্ক-১ কী করলো? ওরা কী পারলো না ঠেকাতে! আমি দৌড়ে গেলাম ফ্লাঙ্ক-২এ. দেখি সাবু তার এল এমজি নিয়ে ট্রেঞ্চ এ বসে। দ্রুত ছুটে আসছে শত্রুর গাড়ি। গুলি ছুড়লো সাবু এবং সঙ্গে আরো ক'জন। শত্রুর গাড়ি এখন বেসামাল। ওরা বুঝলো ফাঁদে পড়ে গেছে। তাই বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালিয়ে পালাতে চাচ্ছে ঢাকার দিকে। প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে আমি হঠাৎ লক্ষ করলাম মানিক নেই। আমি চিৎকার করে সাবুকে জিজ্ঞেস করলাম মানিক কোথায়?

সাবু শুধু বললো পানিতে দেখ। সাবু আবার ট্রিগার টিপলো সামনে শত্রুর গাড়িতে। মানিকের লাশ পানি থেকে তুললাম। তখনো শরীর গরম, বিশ্বাস হয়নি মানিক মারা গেছে। বিশ্বাস আজো হয় না। চোখ বুজলে দেখতে পাই গালভর্তি দাড়ি, হো হো করে হাসছে মানিক। মানিক মরে গেল। আমরা বেঁচে রইলাম। দেশ স্বাধীনতা পেলো। মানিকরা মরে গেলে দেশ স্বাধীনতা পায়। অথচ ওরা স্বাধীনতা দেখে না। না দেখে বোধহয় ভালোই হয়েছে কারণ স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধার লাশ রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকে।

স্বাধীনতা দেখতে চেয়েছিল টিটো। কিশোর টিটো। এক ঝাঁক বুলেট বুকে নিয়ে সাভারের মাটিতে শুয়ে আছে টিটো। বিজয়ের মাত্র দু'দিন আগে চৌদ্দই ডিসেম্বর টিটো শহীদ হয়।

তেরই ডিসেম্বর '৭১। ২৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল হতে পিছু হটে আসছে। তাদের লক্ষ্য ঢাকা। ঢাকার শক্তি বৃদ্ধি করে বোঝাপড়া করা। তেরই ডিসেম্বর ভোর রাত। পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

আমরা আগে থেকে খবর পেয়ে ওঁৎ পেতে বসে আছি, যদি ও জানি শত্রু বাহিনীর অন্যতম দুর্ধর্ষ রেজিমেন্ট এই তেত্রিশ পাঞ্জাব। তবুও আমরা প্রায় চারশত যোদ্ধা নিয়ে ওদের মোকাবেলা করার জন্য বসে আছি সাভারের উপকণ্ঠে। প্রায় তিনশত গজব্যাপী অ্যামবুশ। আমি দু'টি এলএমজি এবং সত্তর জন রাইফেলধারী যোদ্ধা নিয়ে মেইন বডিতে। ফ্লাঙ্ক -১ ও ফ্লাঙ্ক-২ এ রয়েছে শতাধিক করে যোদ্ধা কাভার দেয়ার জন্য। রিজার্ভে রয়েছে আরো শতাধিক।

ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলে মার খাওয়া ক্লান্ত শত্রু সৈন্য ধীরপায়ে এগিয়ে আসছে। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সব শত্রু আমাদের তিনশত গজ এম্বুশের ভেতর ঢুকলে তবে গুলি শুরু হবে। কিন্তু চোখের সামনে এত শত্রু দেখে ঠিক থাকতে পারলো না সুবেদার মোহাম্মদ আলী। পুরো শত্রু বাহিনী অ্যামবুশে ঢোকার আগেই গুলি ছুড়লো। ত্বরিতগতিতে পজিশন নিলো শত্রু। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। আমি

পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফ্লাঙ্ক-১ কে মূল বডি হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে মূল বডিতে পেছনে ছুটে নিয়ে এলাম ফ্লাঙ্ক- ১ এর আরো ডানে। এখন আমার অবস্থান ফ্লাঙ্ক-১। দুর্ধর্ষ সেই রেজিমেন্টের সঙ্গে পেরে ওঠা কষ্টসাধ্য। মাঝে মাঝেই ওরা আমাদের অবস্থানকে দু'ভাগে চিড়ে বের হয়ে যেতে চাচ্ছে- আমাদের পেছন দিকে। আমি ফ্লাঙ্ক-২ কে আরো কাছে এসে গুলি করার নির্দেশ দিলাম। পাঞ্জাবিদের মূল মেশিনগান পোস্ট আমরা দেখছি কিন্তু কিছুটা নিচে থাকাতে কায়দা করতে পারছিলাম না। একমাত্র ফ্লাঙ্ক-২ এর পক্ষে সম্ভব ওদের মেশিনগান নিস্তব্ধ করা।

পাশে আরিফকে বললাম তুমি যেয়ে নুরুকে বলো ঐ এমজিম্যানকে খতম করতে। আরিফ কিশোর টিটোকে পাঠালো। টিটো যে আমার পাশেই যুদ্ধ করছে আমি জানি না। কারণ টিটো এত ছোট ছিল যে তাকে আমরা অপারেশনে নিতাম না। ওকে দিয়ে অন্যান্য কাজ করাতাম। টিটো আমাদের সঙ্গে এসেছিল কুমিল্লার মনিঅন্দ থেকে। যেদিন আমরা সাইদাবাদে প্রচণ্ড মার খাই পাক বাহিনীর অর্তকিত আক্রমণে। সেদিন রাতে দেখতে এসেছিলেন অধিনায়ক খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন হালিম এবং আরো অনেকে। সাতাশটি লাশ সাজানো ছিল পাহাড়ের নিচে। খালেদ মোশাররফ এসে দাঁড়িয়ে ছলছল চোখে আমাদের দিকে তাকালেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে সামনে দূরে সিএন্ডবি রোড, আরো দূরে তিতাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ।

সেদিন তিনি কী দেখেছিলেন কে জানে। তার কিছুদিন পয়ে কসবা অঞ্চলে শত্রুর মর্টারের স্প্লিন্টার এসে তার কপালে বিজয় তিলক এঁকে দিয়ে যায়। খালেদের সেটাই ছিল শেষ যুদ্ধ।

সে রাতে মনিঅন্দে খালেদ আমাদের শুনিয়েছিলেন স্বাধীনতার কথা। মৃত্যুকে অতিক্রম করে কেমন করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হয় তার কথা আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব ভুলে সেই সব কথা শুনেছিলাম। সেই খালেদ স্বাধীন দেশে '৭৫ সালে তারই সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন-কারণ স্বাধীনতা এসে গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের মরে যেতে হয়। যেমন স্বাধীনতা আনতে হলে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন দিতে হয়। খালেদ বলতেন-'স্বাধীন দেশ মৃত যোদ্ধাকে ভালোবাসে।' মনিঅন্দে সেই রাতে কর্নেল খালেদ ফিরে যাওয়ার সময়, ক্যাপ্টেন হালিম, কিশোর টিটো আর নিজামকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দেন। সেদিন টিটো লাফ দিয়ে উঠে ওপাশের নরুর উদ্দেশে চিৎকার করে জানালো আমার নির্দেশ।

যুদ্ধের নিয়ম সে কিশোর জানতো না। মৃত্যুর কথা তার অজানা। শত্রুর এমজির এক ঝাঁক গুলি টিটোর বুক চিরে ফেললো। পড়ে গেল টিটো। মাত্র দশ গজ সামনে, টিটো যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আমরা টিটোর কাছে পৌছতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শত্রুর প্রচণ্ড গুলিতে এগুনো অসম্ভব।

হঠাৎ দেখলাম দ্রুত এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে নুরু পেছন দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে পাক বাহিনীর এমজিম্যানের দিকে। কী অবিশ্বাস্য গতি। মনে হয় মুহূর্তের মধ্যে নুরুর শত্রুর ঠিক পেছনে মাত্র বিশ গজের মধ্যে চলে এল এবং নির্ভুল নিশানায় হত্যা

করলো টিটোর ঘাতক তিনজনকে। এই ফাঁকে আমরা টিটোকে নিরাপদে নিয়ে এলাম। নুরু তখন বেপরোয়া হয়ে সহযোদ্ধাদের নিয়ে একের পর শত্রু হনন করছে।

কিশোর টিটোর মৃত্যু নূরুকে পাগল করে দিয়েছে। শত্রু তখন বিচ্ছিন্ন এবং বিপর্যস্ত। আরিফ এবং আরো ক'জন টিটোকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরলো। তাকে চিকিৎসা করা দরকার। তখন ক্যাম্পে আরো পাঁচজন আহত হয়ে ফিরে এসেছে। টিটোর রক্তে ভেসে যাচ্ছে ধূসর উঠান। টিটো চিৎকার করে বললো-বাচ্চু ভাই, আমি স্বাধীনতা দেখতে চাই। আমাকে বাঁচান। আমি স্বাধীনতা দেখে মরতে চাই।

টিটোকে বাঁচাতে পারিনি। টিটো মরে গেল। টিটো এখন সমাহিত আছে সাভার ডেইরি ফার্মের গেটে। স্বাধীনতা মৃত যোদ্ধাকে ভালোবাসে।

টিটো বাঁচলে কি দেখতো এই স্বাধীনতা? হয়তো দুঃখ পেতো সে। হয়তো চায়ের দোকানে কাজ করতো। কিশোর যুবক হয়ে জীবন লড়াইয়ে নামতো। দেখতো তারই সহযোদ্ধা নিজাম, সুঠাম কালো দীর্ঘদেহী দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা নিজাম স্বাধীনতার পরে '৭৪ সালে মানিকগঞ্জের রাস্তায় পড়ে মরে থাকলো। নিজামকে রক্ষীবাহিনী গুলি করে মেরেছিল। স্বাধীনতার জন্য টিটোকে মরে যেতে হয়।

স্বাধীনতা পেয়ে গেলে নিজামদের মরে যেতে হয়। আর নুরু? সেই দুর্ধর্ষ নুরু? সে ৩৩ পাঞ্জাবের এক মেজরকে হত্যা করে তার টুপি আমাকে উপহার দিয়েছিল। সে এখন কোথায়? তাও আমি জানি না।

নুরু এক ডাকাতের নাম। '৭১-এ যুদ্ধের সময় তাকে ধরে মেরে ফেলতে গিয়েছিলাম। সে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বলেছিল 'আমাকে একবার বাঁচার সুযোগ দিন, দেখবেন আমি কেমন করে খান সেনা জবাই করি'। নুরু তার কথা রেখেছিল। আমরা কথা রাখতে পারিনি। নুরুর কোনও খবর আমি জানি না। জানি না সেই মুন্সির কথা। যে সারারাত মানিক আর টিটোর লাশ বুকে নিয়ে কোরআন খতম করেছিল। সে কোথায়? কোথায় আমাদের সেই আত্মত্যাগী যোদ্ধারা। যারা তাদের কথা রেখেছিল। তারা কি বেঁচে আছে? না মারা গেছে অথবা মৃত্যুর প্রতিক্ষায় আছে।

অথবা আমার মতো রাতে ঘুমহীন, চোখের পাতা এক হয় ঘুম আসে না। ঘুম নেই কিন্তু জেগেও তো নেই। স্বাধীনতা জীবিত গেরিলা চায় না। স্বাধীনতা ভালোবাসে মৃত যোদ্ধাদের।

মানিক, জুয়েল মারা গেলে স্বাধীনতা আসে। স্বাধীনতা এলে মারা যায় মুক্তার-নিজামরা। তাই কি আমাদের ঘুম নেই, অথচ জেগেও নেই। কবি শামসুর রাহমান গেরিলা কবিতায় '৭১ সালে লিখেছিলেন-

'তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছো হাত ধরে, পরস্পর'
এখন তো সেই ভবিষ্যৎ ঘুম নেই আমার....
লক্ষ যোদ্ধার, মায়ের সন্তানের, প্রেমিকার, স্ত্রীর..
চৌদ্দ কোটি মানুষই কি ঘুমহীন?
ঘুম নেই, অথচ জেগেও তো নেই।

বাঙলার বুকে এল-আলামিন ট্যাঙ্ক ব্যাটল

মুসা সাদিক

আজ থেকে ৩৮ বছর আগে '৭১ সালে বাঙালির রক্তে ভেজা শত শত রণাঙ্গনে আমি মুজিবনগর সরকারের তথ্য অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। সেই সঙ্গে আমি স্বাধীন বাংলা বেতারের ওয়ার করেসপন্ডেন্ট হিসেবে রণাঙ্গনে এক কঠিন দায়িত্ব পালন করেছি। ট্যাংক ও কামানের গোলাবর্ষণ এবং শত সহস্র গোলাগুলির মধ্যে জীবন-মৃত্যুর দোলায় দোদুল্যমান ছিল আমার জীবন। জীবনের মায়া উপেক্ষা করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ও মিত্রবাহিনীর সঙ্গে এক রণাঙ্গন থেকে উল্কার বেগে ছুটে যেতে হতো আরেক রণাঙ্গনে। আমার চোখের ওপর বঙ্গজননীর তরতাজা শত সহস্র বীর সন্তানকে রণাঙ্গণে ফুলের মতো ঝরে পড়তে দেখেছি। বুকের তপ্ত রক্ত গল গল করে ঢেলে দিয়ে জন্মভূমির বুকে বুক রেখে শেষ নি:শ্বাস ফেলতে দেখেছি। বঙ্গ জননীর বীরদের বীরত্বে কথা, আত্মদানের কথা আমি স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে সপ্তাহে দুদিন 'রণাঙ্গন ঘুরে এলাম' ও 'মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম' শিরোনামে স্বকণ্ঠে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রচার করেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বহু সংবাদ বিবিসি, রেডিও অস্ট্রেলিয়া, আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়েছে এবং বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় আন্তর্জাতিক শিরোনাম হয়েছে। রণাঙ্গনের সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন ছাড়াও রণাঙ্গনে অনেক গোপন সামরিক সংকেত আমাকে বহন করতে হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের দখলকৃত এলাকার পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান ও প্রতিরক্ষা ব্যূহ সম্পর্কে আমার অনেক গোপন তথ্য রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর ও বাংলাদেশ বাহিনীর সেনা নায়কদের রণকৌশল নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছে। অধিকৃত এলাকায় ও রণাঙ্গনে আমাকে বহুবার জীবনের চরম ঝুঁকি নিতে হয়েছে এবং বহুবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে আল্লাহর রহমতে ফিরে এসেছি। যুদ্ধের শেষে '৭১-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যশোরের চাঁচড়ায় পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে তাদের চরম নির্যাতনে অজ্ঞান ও মুমূর্ষু অবস্থায় ক্যাপ্টেন হুদা ও তার বাহিনী পাকবাহিনীর ওপর আকস্মিক হামলা করে তাদের ফেলে যাওয়া বাংকার থেকে আমাকে প্রায় মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত রণাঙ্গনে জীবন দেয়া-নেয়ার সেই মর্মস্পর্শী পূণ্যময় দিনগুলোর একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরলাম।

ঢাকার রেসকোর্সে লে. জেনারেল নিয়াজী যখন আত্মসমর্পণ দলিলে দস্তখত

দিচ্ছে, সেই ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের সর্ববৃহৎ ট্যাংক লড়াই হয়ে গেল খুলনার শিরোমণিতে। যশোর ক্যান্টনমেন্টে তখন পত পত করে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। ১০৭ ব্রিগেড নিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ ৭ ডিসেম্বর ছেড়ে এসেছেন পাকিস্তানিদের দুর্ভেদ্য যশোর ক্যান্টমেন্ট। ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, পটুয়াখালী, বরিশালের সকল পাকিস্তানি ফোর্স এসে জড়ো হয়েছে খুলনায়। তারা আশা করেছিল রূপসা, পশুর দিয়ে মার্কিন সপ্তম নৌবহর নিয়ে যাবে তাদেরকে, পাকিস্তানে। সেই আশায় জেনারেল নিয়াজীর অর্ডার অমান্য করে তারা যুদ্ধ বহাল রাখলো। ১০৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ খুলনা প্রবেশের দ্বারমুখ শিরোমণিতে সমবেত করলো যশোর ক্যান্টনমেন্ট ও পুটয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর, কুষ্টিয়ার সম্মিলিত ফোর্সকে। বরিশাল, পটুয়াখালির ফোর্সকে রাখলেন সাতক্ষীরা নাভারনের দিক থেকে আগত নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর জয়নাল আবেদীনের বাহিনীকে ঠেকাতে।

ঐতিহাসিক শিরোমণি। বত্রিশটি ট্যাংকসহ চার সহস্রাধিক অভিজ্ঞ পাঞ্জাবী আর্মিকে মহাযুদ্ধের ছকে সাজালো শিরোমণিতে। যশোরকে ঠেকাতে হবে। কমান্ডে থাকলো যশোর ক্যান্টমেন্টেরে কমান্ডার ১০৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ। ১৬ ডিসেম্বর শীতের বিকেলের শেষ সূর্য পশ্চিম গগনে অস্ত গেল। সন্ধ্যা গড়িয়ে শিরোমণির বুকে রাত এল। পায়ে পায়ে শিরোমণিতে এসে উঠে দাঁড়ালো সেই কামান্ডো লিডার, এসএলআর চলে যার নিশ্চিত নিশানায়। যার ত্রাসে ১০৭ ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ এর যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে দিয়ে এসে খুলনায় বসে তার ফোর্স কমান্ড করতেন। সেই তিনি ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ এর জানের দুশমন মেজর মঞ্জুর।

১৬ ডিসেম্বর রাত ন'টায় শিরোমণির মাটি গর্জে উঠলো। মাটি কাঁপিয়ে গর গর করতে করতে পাঞ্জাবীদের ট্যাংক মঞ্জুরের মুক্তিযোদ্ধাদের দু'টি পজিশন নিমেষে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল।

শিরোমণির চার পাশের আম-কাঠালের গাছ নারিকেল ঘেরা ও অন্যান্য গাছগুলোর ডালপালা কামানের গোলায় ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগলো। আহত নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ফিল্ড হসপিটালের কর্মীরা ছুটছে যশোরের দিকে। কামানের শব্দে, ট্যাংকের গর্জনে, আহতের আর্তনাদে শিরোমণি সে দিন কাঁপতে লাগলো।

কামানের গোলা, ট্যাংকের গর্জন আর মর্টার শেলিং-এ তেঁতে, পুড়ে, ফেড়ে ফেড়ে যাচ্ছে শিরোমণির জমিন। গোলার আগুনে ঝলসে উঠছে শিরোমণির আকাশ। ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠছে খুলনা শহর। ১০৭ ব্রিগেড মরণ ছোবল হানছে মুঞ্জুরের বাহিনীর ওপর। তাদের কমান্ডারের শত পরাজয়ের শোধ শিরোমণিতে তারা তুলে নেবে আজ। বত্রিশটির ও বেশি ট্যাংকের কমান্ডে আছে ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ এর। রোমেল-মন্টগোমারির মিসরের বুকে সেই বিশ্ববিখ্যাত আল আমিনের ট্যাঙ্ক ব্যাটল বহুবার পড়েছি। কমান্ডো মেজর মঞ্জুর ও ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ এর শিরোমণির ট্যাংক

ব্যাটল দেখেছি। আগের দিন ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতারের ওয়ার করেসপন্ডেন্ট হিসেবে আমি ও ভারতীয় দুজন সাংবাদিক ৮ নম্বর সেক্টরে আসি। ছিলাম ১৬ ডিসেম্বরের সেই বিভীষিকাময় ওয়ার ফিল্ড শিরোমণির কাছে।

যুদ্ধ চলছে। ঘন্টা পার হচ্ছে। ৯টার পর ১০টা। ১০টার পর ১১টা। মিনিটগুলো তখন সব ঘন্টার মতো। এক মিনিট অসাধ্য সাধন করা। এ পক্ষ ভাবছে, ওরা সারেন্ডার করবে এক্ষুণি। ওরা ভাবছে, এরা সারেন্ডার করবে এক্ষুণি। কিন্তু না, ১০৭ ব্রিগেড শিরোমণির মাটি কামড়ে পড়ে আছে। এক ইঞ্চি পিছু হটেনি। পিছু হটেনি মুক্তিযোদ্ধারাও। এক মিনিট এক মিনিট করে অনেক রক্ত ঝরলো শিরোমণির বুকে।

অনেক মৃত্যু। পাঁচ ঘন্টা পার হয়ে গেল এইভাবে। রাত যত বাড়তে লাগলো পাকিস্তানিদের আক্রমণও তীব্রতর হতে থাকলো। এইভাবে গেল আরো একঘন্টা। দীর্ঘ ছয়ঘন্টার বিরামহীন সংঘর্ষ এগিয়ে চললো। ৮ নম্বর সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংকারে আহত হচ্ছে। সাথীরা বাংকারের মধ্যে বসে ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে আর আহত অবস্থায় বাংকারে দাঁড়িয়ে থ্রিনটথ্রি, এসএলআর-এর ট্রিগার সমান গতিতে চেপে যাচ্ছে। দূর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কেউ নিয়ে আসছে এক মগ পানি, অগ্রবর্তী কোনো ট্রেঞ্চে যুদ্ধরত সঙ্গীদের জন্য। বিরাম নেই কারো, নেই কারো দিকে চোখ ফেরানোর অবকাশ। সব চোখ সামনে, শত্রুর নিশানায়, হানাদার বাঙ্কারে। এইভাবে চললো সেই মরণযুদ্ধ শিরোমণির বুকে।

রাত তিনটা বেজে কয়েক মিনিট। মুক্তিযোদ্ধাদের ও মিত্রবাহিনীর পজিশন, ডিফেন্স অকস্মাৎ যেন দুলে উঠলো! ক্যাজুয়ালটির পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে গেল। রাত তিনটের মধ্যে মোট ক্যাজুয়ালটি দাঁড়ালো মিত্রবাহিনীর একজন অফিসারসহ ৭ জন নিহত ও ৩০ জনের মতো আহত। ৩১ জনমুক্তিযোদ্ধা নিহত ও চারগুণের মতো আহত। এর অধিকাংশ ক্যাজুয়ালটি হলো শেষ দুঘন্টায়। রাত ৩-১০ মিনিট-এ মিত্র বাহিনীর কাছে সেক্টর কমান্ডার পর পর দুটি সিগন্যাল পাঠালেন 'এয়ার সাপোর্ট' এর জন্য। রাত শেষ হওয়ার আগেই আঘাত হানতে মিত্র বাহিনীর পাইলটরা জঙ্গী বিমান চড়ে দমদমে প্রস্তুত হয়ে আছে। অর্থাৎ রাতে সম্ভবত এয়ার সাপোর্ট আসবে না।

শিরোমণি থেকে মঞ্জুর-হুদার জিপ ফুল স্পিডে ঢুকলো যশোর ক্যান্টনমেন্টে। ট্যাংক ব্যাটল শুরু হওয়ার পর এই প্রথম তাদের দেখলাম। বিচলিত মনে হলো। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ-এর কাছে তিনি কী শেষ ব্যাটেলে পরাজিত হতে চলেছেন? তারা ঢুকলেন মিত্র বাহিনীর কমান্ডারের রুমে। ঠিক দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এলেন তারা। দুজনেই ছুটছেন জিপের দিকে। আমরা তিনজন দৌড়ে ধরলাম মেজর হুদাকে। জানতে চাইলাম। উঠতে উঠতে মঞ্জুর সাহেবকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে শুধু বললেন 'হি হ্যাজ টেকেন ফুল কমান্ড। অল ফোর্সেস, ইনক্লুডিং এ্যালাইড ফোর্সেস নাউ এ্যাট হিজ ডেসপোজাল'।

তাদের জিপ ছুটে বেরিয়ে গেল শিরোমণির দিকে। পরে শুনেছিলাম ওখানে মিত্রবাহিনীর কমান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও পরিকল্পনা নিয়ে সেক্টর কমান্ডার ও মেজর হুদা উভয়েই ওপেনিয়ন ডিফার করেছিলেন। শিরোমণিতে মিত্রবাহিনীর ২০/২২ টি ট্যাঙ্কসহ সমমানের শক্তি এবং কমান্ডো ট্রেন্ড মুক্তিবাহিনীর থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ ছয়ঘন্টা যুদ্ধ করতে হবে এবং এয়ার সাপোর্ট ব্যতীত শিরোমণির পাকিস্তানি ট্যাংক ব্যাটেলিয়নের সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের দাঁড়িয়ে মার খেয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, ওয়ার ফিল্ডের সেই বিশেষ সিচ্যুয়েশনে সেক্টর কমান্ডার মঞ্জুর এবং অভিজ্ঞ সাব সেক্টর কমান্ডার মেজর হুদা উভয়ে যখন মঞ্জুরের পক্ষে ফুল কমান্ড চাইলেন এবং ৮ নম্বর সেক্টরের মিত্রবাহিনীর কমান্ডার মঞ্জুর রিকোয়েস্ট করলেন 'টু পুট অল এ্যালাইড ফোর্সেস এ্যাট মাই ডেসপোজাল' তখন মিত্রবাহিনীর কমান্ডার হেজিটেট করছিলেন। মেজর মঞ্জুর কোমরের বেল্ট খুলে দিয়ে বলেছিলেন (ব্যাটল ফিল্ড থেকে ফিরে না আসা, বিজয় ব্যতীত) 'মাই সানস আর রেডি টু প্রুফ মন্টগোমারি হেয়ার এগেন'। ইন্ডিয়ান কমান্ডার অয়ারলেসে মেজর জেনারেল দলবীর সিং-এর ক্লিয়ারেন্স নিয়ে শেক হ্যান্ড করে সকল এ্যালাইড ফোর্সের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন সেক্টর কমান্ডার মঞ্জুরের ওপর। মেজর মঞ্জুর কমান্ড পাওয়ায় মিত্রবাহিনীর কর্নেল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয়ে মঞ্জুরের সঙ্গে বুকে বুক মিলিয়ে ফেললেন। অভিনন্দন জানিয়ে বললেন 'ইউ আর রাইট কমান্ডার ফর দি রাইট মোমেন্ট'।

তৎক্ষণাৎ তিনি এ্যালাইড ফোর্সের সদর দপ্তর থেকে ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর জয়নাল আবেদীনের কাছে ওয়ারলেসে দুটি বিশেষ কোড সিগন্যাল পাঠিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেলেন শিরোমণির দিকে। পথে তার এক বিশ্বস্ত যোদ্ধার কাছে এক লাইনের পত্র দিয়ে গেলেন তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে সম্বোধন করে। যদি তিনি শহীদ হন তাহলেই প্রাপককে পত্রটি দেওয়ার জন্য। মিসেস রানা ইয়াসমীন ও ছেলে মেয়েদের 'শেষ বিদায়' এবং 'খোদা হাফেজ' দিয়ে লেখা সেই ছোট পত্রে তিনি লিখেছিলেন 'পবিত্র কুরআন শরীফে শহীদের মর্যাদা সর্বোচ্চ। শহীদের মর্যাদার ওপরে কোনো মোমিন-মুসলমানের আর কোনো সর্বোচ্চ মর্যাদা ইসলাম ধর্মে নেই। আমার শহীদ হওয়ায় আমার মর্যাদার জন্য তুমি ও আমার সন্তানরা গৌরবান্বিত হবে ও সব সময় গর্ব করবে।'

রাত পৌনে চারটার দিকে অকস্মাৎ নাভারন সাতক্ষীরা রোডের মুখে মেজর জয়নাল আবেদীন, ক্যাপ্টেন মেহেদী পাক ডিফেন্স ভেঙে তছনছ করে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। পাকিস্তানি কর্নেল আফরোজের স্মার্ট, ওয়েল ইকুইপড ফোর্সকে একেবারে তাড়া করে নিয়ে চললো দুর্ধর্ষ মেজর জয়নাল আবেদীনের বাহিনী ও মিত্রবাহিনী। কয়েক মাইল দৌড়ে এসে দুইটি ট্যাঙ্ক মিত্র বাহিনীর হাতে খুইয়ে খুলনার একেবারে শহরের মুখে চাঁচড়ায় এসে ডিফেন্স গড়লো পাক কর্নেল আফরোজ। অপর দিকে ১

কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রামবাসী ফোর্স নিয়ে গেল ফাহামউদ্দিন সেনহাটির পশ্চিমের গোয়ালপাড়ার শত্রু সৈন্যদের ওপর আঘাতে হানতে। বোরহান উদ্দিনের অধীনে ১ কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা চন্দনী মহল, শোলপুর ও রাজাপুরে পজিশন নিয়ে ৭নং জেটি এবং সদর হসপিটালের পাক সেনাদের ব্যস্ত রাখছে। নোমাউল্লাহর অধীনে ১ কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রামবাসী বীজ খামারে পজিশন নিয়ে খুলনা রেডিও স্টেশনের শত্রু বাহিনীকে হানছে মারণ আঘাত।

আফজালের অধীনে ৯ কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা সাচিবুনিয়ায় পজিশন নিয়ে খুলনা লায়ন্স স্কুলের পাক সৈন্যদের ওপর আঘাত করছে। কুতুবউদ্দিনের অধীনে ১ কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রামবাসী কুলাটিয়ায় পজিশন নিয়ে শত্রুদের গল্লামারী রাস্তা ব্যবহার রোধ করে দিয়েছে। নৌবহরে ৬ পাউন্ডের গানসহ ও রূপসা নদীবক্ষে শিপইয়ার্ড আক্রমণ করছে টুটপাড়ার দিক থেকে মেজর জয়নাল আবেদীন, নেভাল কমান্ডো রহমতউল্লাহ। লে. আরেফিন ও বাবর আলী পাক হানাদারদের বৃষ্টির মতো গুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের বাহিনী নিয়ে। এখানে আমাদের ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হয়। শত্রুপক্ষে বহু জীবনহানি হয়। খুলনা শিপইয়ার্ডে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও নৌ-বাহিনীর ওপর শত্রুপক্ষ প্রবলভাবে গুলিবর্ষণ শুরু করলো অকস্মাৎ খিজির ও লে. আরেফিনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পাল্টা ফায়ার শুরু করে। শত্রুদের ফেলে যাওয়া একটা ক্ষুদ্র বার্জের ওপর পাওয়া দুটি সিক্স পাউন্ডের গান (শত্রুরা ফায়ারিং পিন খুলে নিয়ে যায়) পিনের পরিবর্তে একটি ছেনি ব্যবহার করে বাঁশের মুগুরের সাহায্যে পিটিয়ে পিটিয়ে খিজির শত্রুর পজিশনে ফায়ার চালাতে থাকেন। আল্লাহর আশ্চর্য রহমত যে প্রত্যেকটি ফায়ার অব্যর্থ নিশানায় আঘাত করে শত্রুকে ঘায়েল করে। ফলে শত্রুরা পনেরো মিনিটের মধ্যে শিপইয়ার্ড ত্যাগ করে পালাতে থাকে। কিন্তু তাদের পালাবার প্রাক্কালে মুক্তিযোদ্ধারা উল্লসিত হয়ে বাঙ্কার পজিশন ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে আসে। সেই ভুলের মাসুলে এক শত্রু গোলার আঘাতে এক জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় ও ১৬ জন গুরুতর আহত হয়। মেজর মঞ্জুরের পরিকল্পনা অনুসারে ১৬ ডিসেম্বর ভোর ৪টা অবধি সমগ্র খুলনার চারপাশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা সাড়াশি আক্রমণ জোরদার করে তোলে।

এদিকে ১৬ ডিসেম্বর রাত ৪টায় শিরোমণির ট্যাংক ব্যাটেলের পুরো কমান্ডে আসেন মেজর মঞ্জুর। খুলনার চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের যে সাঁড়াশি আক্রমণ, সকল শক্তি নিয়োগ করে কর্নেল আফরোজকে যে পিছু হটিয়ে আনা ও শিরোমণির ট্যাংক ব্যাটেলে মঞ্জুরের ওপর বাংলাদেশ ও এ্যালাইড ফোর্সেস তথা সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় ৯ পদাতিক ডিভিশনের প্রথম কলামের কমান্ড ন্যস্ত এবং সে বিষয়ে ইস্টার্ন কমান্ডার জগজিৎ সিং আরোরার সম্মতি একই পরিকল্পনায় ঘটতে থাকে।

এতোক্ষণে, মঞ্জুর প্রস্তুত হন ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ এর চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে।

শিরোমণির ডান দিকের এফএফ কলামটাকে ফ্রন্ট লাইনের পেছনে সেকেন্ড ডিফেন্স-এ আনেন। কমান্ড দেন মেজর হুদাকে। ফ্রন্ট লাইনের এ্যালাইড ফোর্সকে শিরোমণির ডানের ডিফেন্সে পাঠান। বাম দিকের দুটি ও পেছনের কমান্ডো কলাম তিনটিকে ফ্রন্ট লাইনের ডিফেন্সে-এ বসান। ডানে পেছনে সে স্থানে চলে যায় এ্যালাইড ফোর্স। মেইন রোডের নিচে ঘাপটি মেরে বসে থাকা মিত্রবাহিনীর ট্যাংকগুলোর চারটিকে সংকেত অনুযায়ী শিরোমণি খুলনার মেইন রোডে ও অন্য বারোটিকে ডানদিকের নিচু বেত গাছের পাশ দিয়ে হেভি ক্যাজুয়ালটি মেনে নিয়েও দুর্ভেদ্য পাক ডিফেন্সের পেছনের পজিশনে ক্ষিপ্র গতিতে পৌঁছে যাওয়ার জন্য তীক্ষ্ণভাবে প্রস্তত করেন। প্রত্যেকটা ট্যাংকের পেছনে জুড়ে দেন শহীদ হতে প্রস্তুত ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডোকে। পুরো ফ্রন্টকে নতুন স্ট্রাটেজিতে সাজানোর মধ্যেই এক জন মিত্রবাহিনীর ও তিন জন মুক্তিবাহিনী গুরুতর আহত হলো। মুক্তিবাহিনীর দুজন পরে শহীদ হলেন।

ডেট লাইন : শিরোমণি, ১৭ ডিসেম্বর রাত ৪টা ৫০ মিনিট।

সেক্টর কমান্ডর মেজর মঞ্জুর ইন কমান্ড।

সামনে পঁচিশটিরও বেশি পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক, দেড় শতাধিক কামান, কয়েকশ মর্টার। প্রতি সেকেন্ডে উদগীরণ করে চলেছে হাজার হাজার গোলা, সীসা ও বারুদের দলা।

ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ ইন কমান্ড।

কী হলো? চারদিকের সেই কামানোর গোলা, বারুদের গোলা আর ট্যাংকের গর্জনের মধ্যে দিয়ে এসএলআর উঁচিয়ে কার হাত সবার আগে উঁচু হয়ে ছুটছে?

কমান্ডো মেজর মঞ্জুর। মেঘের মতো তাকে জড়িয়ে, উল্কার মতো ছুটছে স্যুইসাইডাল ঝটিকা কমান্ডোরা। তাদের সামনে পড়ছে কামানের গোলা, পেছনে পড়ছে স্প্লিন্টার ওপরে পড়ছে ঝলকানো বারুদের দলা। এঁকে বেঁকে, কাত হয়ে, গড়িয়ে লাফিয়ে-উহ, অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য একটা গোলাকার মাংসপিণ্ডের মতো হয়ে তার ঝটিকা কমান্ডোদের নিয়ে দৃষ্টির ওপারে কোথায় গেলেন তিনি? অর্ডার অনুযায়ী মিত্রবাহিনীর চারটি টি-৭২ ট্যাংক শিরোমণির মেইন রোড দিয়ে ও ডান দিকে থেকে বারোটি মিত্রবাহিনী টি-৭২ ট্যাংক মাটি কামড়ে ছুটলো তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে। ছুটলো আরো ১২ জন করে স্যুইসাইডাল কমান্ডো প্রতি ট্যাংকের গায়ে গা মিশিয়ে। ফ্রন্ট লাইনের কমান্ডো কলামটা যত লম্বা পা ফাঁক করা যায়, লাফিয়ে ছুটে গেল কমান্ডারের গতিপথের দিকে। ওদের জীবনের যেন কোনো মায়া নেই। যেন কোনো হুঁশ নেই। যেন জীবনের শেষ রাতের শেষ খেলা খেলছে ওরা এ জীবন তুচ্ছ করে এ বাংলা মাকে ভালোবেসে!

১৭ ডিসেম্বর সেই ভোর রাত সোয়া পাঁচটার দিকে শিরোমণির বুকে মঞ্জুর তার কমান্ডারদের নিয়ে পাকিস্তানি ব্যুহের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। তিনি ও তার কমান্ডোরা

বেঁচে আছেন না শহীদ হলেন, কেউ জানে না! চরম বিপর্যয় ও বিপদের এই মুহূর্তে মেজর হুদা সেকেন্ড লাইনকে তৎক্ষণাৎ ফ্রন্ট লাইন আগলাতে বললেন। মিত্র বাহিনীর আর্টিলারির ছত্রছায়ায় হানাদারের গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র তুলে যার শরীরে যতো শক্তি ছিল তত বেগে দৌড়ে গেল ফ্রন্ট লাইনের বাঙ্কারে, পজিশনে। ডানদিক থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে গেছে দুই ডজন ট্যাংকসহ মিত্রবাহিনী। তিন মাইল জুড়ে দুপক্ষের কামান ও ট্যাংকের গোলা বর্ষণে শিরোমণি, কাঁপতে লাগলো। আশপাশের গাছপালার ডাল, নারিকেল গাছের মাথা ভেঙে পড়তে লাগলো। কামানের গোলা, ট্যাংকের গোলায় দিনের আলোর মতো ঝলসে ঝলসে উঠছে শিরোমণির আকাশ-জমিন। বাতাসের প্রতি পরমাণু বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে ৩০০ গজ সামনে শত্রু ব্যূহের কোন দিকে কোন গহবরে তাদের কমান্ডার হারিয়ে গেছে সেদিকে তাকিয়ে সবার চোখ সজল হয়ে উঠেছে। এক অজানা আশংকায় দুলে উঠছে বুক। ততক্ষণে হায়াৎ এর কামানের গোলা, ট্যাংকের গর্জন আর মর্টার শেলিং এর ব্যূহের মধ্যে বজ্রের কড় কড় আওয়াজে উল্কার বেগে ঢুকে পড়েছেন কমান্ডো মেজর মঞ্জুর তার স্যুইসাইডাল কমান্ডো স্কোয়াড নিয়ে। পাকিস্তানি কর্নেল-ব্রিগেডিয়ারদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে চোখের নিমিষে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গেল হায়াৎ এর ডিফেন্স, দুর্ভেদ্য বাঙ্কার ভেঙে ফেটে চৌচির। জ্বলন্ত পাকিস্তানি এম-২৪ ট্যাংক থেকে ভীত বিহবল সব হানাদাররা বেরিয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ছে। শিরোমণি পেছনে ফেলে হায়াৎ খানেরা পেছনে দৌড়াচ্ছে। একজন কমান্ডো দৌড়ে এসে খবর পৌছে দেয় 'খানরা ভেগে যাচ্ছে'। 'জয় বাংলা' বলে মুক্তিসেনারা দ্বিগুণ তেজে শত্রুদের ধাওয়া করে নিয়ে চলে। এ সময় ভোর পৌণে ছটায় এল মিত্রবাহিনীর জঙ্গি বিমানের বহর। তুমুল বোমা বর্ষণ ও রকেট হামলায় হানাদার বাহিনীকে গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে ফেললো। পাঁচ সহস্রাধিক আত্মসমর্পণ, শত শত আহত ও ১৫৭ টি মৃতদেহ রেখে ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ শিরোমণির মাটিতে হাঁটু গেড়ে ভারতীয় ৯ পদাতিক ডিভিশনের এবং মেজর মঞ্জুরের কাছে আত্মসমর্পণ করলো।

শিরোমণির সেই অবিশ্বাস্য ট্যাংক ব্যাটলে জয় লাভকরা আল্লাহর রহমত ছাড়া সম্ভব হতো না। চোখে না দেখলে এটা কি করে সম্ভব হলো কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। সে জন্যেই বোধ হয় ভারতের দেরাদুন ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমী ও ব্রিটেনের স্যান্ডহার্স্ট আর্মি রয়্যাল মিলিটারি একাডেমীসহ অন্যান্য দেশের আর্মি একাডেমীতে 'ট্যাংক ব্যাটল অফ শিরোমণির' ওপর একটা চ্যাপ্টার পড়ানো হয়।

সেই ব্যাটল ফিল্ডে অন্যান্যের সঙে আমি ছিলাম বলেই বলছি, বিশ্ববিখ্যাত আল আমিনের ট্যাংক ব্যাটলের যে ভয়াবহতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে পড়েছি, শিরোমণির ট্যাংক ব্যাটল তার অপেক্ষা কোনো অংশে কম ভয়াবহ বা অবিশ্বাস্য ছিল না। ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আল আমিন ট্যাংক ব্যাটলের নাম যদি থাকে,

থাকবে বাংলার মুক্তিযুদ্ধের 'শিরোমণির' ট্যাংক ব্যাটলের নাম। আর তার পাশে ঝলমল করে জ্বলবে বাংলার বীর, বাংলার নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কমান্ডো মেজর মঞ্জুরের নাম।

এত তোড়জোড়, এত শক্তি সমাবেশের পর এই পরাজয়ে ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ এর অধীন পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল শেষ হয়ে যায়। তারা প্রস্তুত হয় আত্মসমর্পণের জন্য। যদিও রীতি অনুযায়ী ওদের ইস্টার্ন সেক্টরের কমান্ডার লে. জেনারেল নিয়াজীর অর্ডার অনুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর দুপরে আত্মসমর্পণ করা সামরিক বিধি ছিল এবং সে বিধি ভঙ্গ করে পুরোদস্তুর এক রাত ও অর্ধদিন যুদ্ধ চালাবার দায়ে মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য ছিল, তবু তাদেরকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হলো পরাজিত হওয়ার পর। তারা ঢাকার একদিন পর ১৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় আত্মসমর্পণ করে। সকালেই খুলনা সার্কিট হাউজের ওপর সর্ব প্রথম পতাকা তোলেন মেজর জয়নাল আবেদীন ও নেভাল কমান্ডো রহমত উল্লাহ।

কিন্তু পাক হানাদারদের পোড়ামাটি নীতির ফলে আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পূর্বে হানাদাররা সকালেই খুলনা অয়্যারলেস টাওয়ার বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয় ও ব্যাংকের নোট ও পাটের গুদামসহ অন্যান্য সম্পদে আগুন ধরিয়ে দেয়। অন্যান্য জেলা থেকে খুলনা অভিমুখী মহাসড়ক সমূহের সকল ব্রিজ, খুলনা শহরের বড়ো বড়ো সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি মালখানা ও অন্যান্য পণ্যের গুদাম ঘর সমূহ ধ্বংস করে, পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংস করে ও পুড়িয়ে ছাই করে দেয় হানাদার পাকিস্তানিরা।

খুলনা সার্কিট হাউজের সামনে সকাল সাড়ে বারোটায় এসে হাজির হন ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ ও তার বাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা। সারেন্ডারং সেরিমনি হবে ১-৩০ মিনিটে। উপস্থিত হলেন মেজর জলিল, মেজর মঞ্জুর, মেজর জয়নাল আবেদীন। হেলিকপ্টারে এসে নামলেন মিত্রবাহিনীর ভারতীয় ৯ পদাথিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল দলবীর সিং ১ টা ১১ মিনিটে।

সার্কিট হাউজের সামনে একটি টেবিল একটি চেয়ার। ময়দানের প্রান্তে মিত্রবাহিনীর ১১টি এনফেবিয়াস ও টি -৭২ ট্যাংক। চেয়ারে বসলেন মে. জে. দলবীর সিং। তার সামনে প্রায় দশগজ দূরে দুই সারিতে এটেনশান পজিশনে দাঁড়ালো ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ এবং তার অন্য সিনিয়র অফিসাররা। মে. জে. দলবীর সিং এর এ্যাটাচি থেকে একজন স্টাফ বের করলেন পূর্বাহ্নে টাইপ করা 'সারেন্ডার ইন্সট্রুমেন্ট'। কাঠের ছোট টেবিলটার ওপর রেখে সেটি পড়লেন তিনি। পড়া শেষে তাকালেন ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ এর দিকে। ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ ও তার সহকর্মী অন্য অফিসাররা সেল্যুট দিয়ে বুক টান করে দাঁড়ালো। মে. জে. দলবীর সিং ইনস্ট্রুমেন্টটি টেবিলের ওপর রাখলেন। ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ এবং তার সাথী আরো আটজন অফিসার দু'কদম

সামনে এসে রিভলবারসহ বেল্ট খুলে নিচু হয়ে ময়দানে মাটির ওপর রাখলো। ব্যাজেস অফ র‍্যাঙ্কস খুলে দেওয়ার সময় ছিপছিপে লম্বা, টুকটুকে ফর্সা চেহারার ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ-এর চোখ দিয়ে পানি নেমে এল। তার দুজন অফিসার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকলো।

ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ ও তার যে অফিসার ও জওয়ানরা বাংলার হাজার মা বোনের ইজ্জত লুটছে নয় মাস, যে রিভলবারে, রাইফেলে লক্ষ বাঙালি জননী, বধূর বুক খালি করেছে, ১৭ ডিসেম্বর সকালে সেই উদ্ধত দানবেরা নত মস্তকে দাঁড়ালো। হাতের অস্ত্র বাংলার পূত-পবিত্র মাটির ওপর রাখতে হলো। জান বাঁচাতে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে হলো বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে।

সারা খুলনাবাসী তখন সার্কিট হাউসের চতুর্দিকে থেকে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছে। সেই মুহুর্মুহ 'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্যে হানাদার বাহিনীর কমান্ডার হায়াৎ ১টা ৫৫ মিনিটে স্বাক্ষর করলো সারেন্ডারিং ইনস্ট্রুমেন্টের ডান দিকে, মে. জে. দলবীর বামদিকে স্বাক্ষর করলেন এবং বললেন 'আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি যে, POW (Prisioner of War)-দের প্রতি জেনেভা কনভেনশনের সকল রুলস পরিপূর্ণভাবে পালন করবো'। সার্কিট হাউস ময়দানের চারপাশে তখন উদ্বেলিত জনতার উল্লাস ধ্বনি 'জয় বাংলা'। আকাশ ভেদ করে গগন বিদাহী আওয়াজে যেন নেমে আসছে লক্ষ কণ্ঠস্বরে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু'।

ও জেনারেল, মাই জেনারেল
মোফাজ্জল করিম

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল আমি তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে উপসচিব হিসেবে যোগদান করি। ঐ মন্ত্রণালয়ের অধীনে তখন আল্লার দুনিয়ার তাবৎ যোগাযোগ বলতে যা বোঝায় তার সবই ছিল; সড়ক, রেলপথ, জাহাজ, বন্দর, বিমান, ডাক, তার ইত্যাদি সব। আমার ভাগে পড়ল জাহাজ ও বন্দর। আমি ডেস্ক অফিসার। জাহাজের খবর নেয়ার দায়িত্ব আমার। জীবনে কোনোদিন গয়নার নাওয়ের চেয়ে বড় কোনো জলযান আমি দেখিনি। এখন আদার বেপারি থেকে এক গুঁতোয় জাহাজের খবর নেয়ার চাকরি।

প্রথমে দিন একটা টেলেক্স-বার্তায় দেখলাম 'বিল অব লেডিং' কথাটা লেখা আছে। ভাবলাম ছাপার ভুল-বিল অব লোডিং হবে। ঐদিনই বিকেলে নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকানে ডিকশনারি অব শিপিং খুঁজতে গেলাম। মিলল না। বুঝলাম, কপালে দুঃখ আছে।

সর্প হয়ে যে দংশন করেছিল সেই সরকারই ওঝা হয়ে ঝাড়ল মাত্র দু'দিনের মাথায়। মন্ত্রিসভায় বিরাট ওলট-পালট হয়ে গেল। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে হলো তিন টুকরো- (১) সড়ক, রেলপথ ও বন্দর, (২) জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও বিমান এবং (৩) ডাক, তার ও টেলিফোন। মন্ত্রী যথাক্রমে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী এবং মোল্লা জালালউদ্দিন। তিন মন্ত্রণালয়ের বাটোয়ারানামায় আমার নাম লেখা হলো দ্বিতীয়টিতে।

১৩ এপ্রিল সকালে মন্ত্রী এলেন দপ্তরে। তখনকার দ্বিতীয় নয়তলা দালানের অষ্টম ও নবমতলার কিয়দংশে আমাদের মন্ত্রণালয়। মন্ত্রীর কামরা নয়তলায়। তার ওপরে আকাশ। সরকার মন্ত্রী মহোদয়কে নি:সন্দেহে খুব উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে মন্ত্রীর কামরার ঠিক নিচের কামরায় আটতলায় বসতাম আমি। অর্থাৎ আমার মাথার ওপরে শব্দার্থেই ছিলেন মন্ত্রী।

প্রথম দিনে মন্ত্রী এসেই ঘুরে ঘুরে সব কামরায় গেলেন। হাত মেলালেন পিয়ন-চাপরাশি থেকে শুরু করে আমাদের সকলের সঙ্গে। তিনি একাই ঘুরলেন একজন সঙ্গী নিয়ে। পরনে আদ্দির সাদা পাঞ্জাবি ও আলীগড়ি কাটের পাজামা। মাথায় কাল রামপুরি টুপি আর সেই কাল টুপির সঙ্গে কনট্রাস্ট হিসেবে তার তুষারধবল সুবিশাল

ট্রেড মার্ক গোঁফ-জোড়া, যে গোঁফের কারণে আড়ালে-আবডালে কেউ কেউ তাকে ডাকত জেনারেল মোচমানী বলে। কথায়-বার্তায় বিনয়ে বৈষ্ণব।

খর্বকায় ওসমানী সাহেবের খড়ের আঁটির মতো দুই বান্ডিল গোঁফ ছাড়া বাদ বাকি চেহারা ছবি দেখে জেনারেল বলে মনেই হতো না। তার উচ্চতা নিয়ে তিনি একটি কাহিনী অনেককেই শুনিয়েছেন। কিংস কমিশনের মৌখিক পরীক্ষায় বোর্ডের একজন পরীক্ষক তাকে বলেছিলেন, মি. ওসমানী, তুমি কি তোমার এই খর্বাকৃতি অবয়ব সম্বন্ধে অবহিত আছ? ওসমানী সাহেব বললেন, হ্যাঁ, আছি। ঐ প্রশ্নকর্তা আবার বললেন, এই ছোটখাট শরীর নিয়ে তুমি কী করে বিশালদেহী পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাঠানদেরকে কম্যান্ড করবে? তরুণ ওসমানী জবাব দিলেন, স্যার, আমার খর্বাকৃতি সম্বন্ধে আমি যেমন সচেতন আছি, তেমনি আমি অবগত আছি নেপোলিয়ন বোনাপার্টি থেকে আমি দু'ইঞ্চি লম্বা।

আমরা ভেবেছিলাম মন্ত্রী বোধহয় সব অফিসারকে নিয়ে পরিচিতি সভা গোছের কিছু একটা করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। প্রথমদিন থেকেই শুরু করলেন কাজ -কর্ম। আমরা ফাইল পাঠাতে শুরু করলাম। নিতান্ত সাদামাঠা দু'-একটা ফাইল ব্যতীত বাকীগুলো আর ফেরত আসে না। খুব জরুরি বিষয় তৎকালীন সচিব জনাব নূরুল কাদের খান (মরহুম) নিজেই ফাইল নিয়ে আলাপ করতে যেতেন মন্ত্রীর সঙ্গে।

এদিকে আমি পানি থেকে একলাফে উঠে গেলাম আকাশে। দায়িত্ব পেলাম, বাংলাদেশ বিমান, বেসামরিক বিমান চলাচল অধিদপ্তর (তখন ওটা অধিদপ্তরই ছিল), বিমান বন্দর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সেল, প্রশাসন ইত্যাদির। তখন মন্ত্রণালয়গুলোতে অফিসারদের সংখ্যা এখনকার মতো এত বেশি বেশি ছিল না। আমাদের একেকজনের প্লেট ছিল তাই টুব-টুব।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মন্ত্রী সব ব্যাপারেই মোটামুটি সড়গড় হয়ে গেলেন। ফাইল ও ফেরত আসতে লাগল হুড়মুড় করে। যে ফাইলই আসে তাতেই আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি। কারণ? কারণ মন্ত্রী শুধু স্বাক্ষর করে ফাইল ফেরত পাঠান না, লম্বা নোট লেখেন। লম্বা বলে লম্বা। হাতে লিখে প্যারার পর প্যারা। কখনো দু'তিন পৃষ্ঠা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, নোটের শুরুতেই হয়ত লিখলেন 'ইয়েস' এবং সেটাতেই একটা অনুচ্ছেদ নম্বর দিলেন বসিয়ে। তারপর সেই এক শব্দের অনুচ্ছেদের পরে আরেকটি অনুচ্ছেদ এবং সেটা শুরু 'বাট্' (কিন্তু) শব্দ দিয়ে। তারপর উপ-অনুচ্ছেদ, তস্য উপ-অনুচ্ছেদ, এবিসিডি, রোমান ওয়ান, টু, থ্রি ইত্যাদির ছড়াছড়ি। হাতের লেখা যেমন তেমন, কিন্তু কাটাকাটিতে ভরতি। আবার কবি জীবনানন্দর মতো লাইন টেনে টেনে মার্জিনে নিয়ে গিয়ে ওখানেই কিছু কিছু সংযোজনী, সংশোধনী। মন্ত্রী মহোদয়ের আসল সিদ্ধান্ত বা নির্দেশটা যে কী তা বুঝতে প্রায়শই আমাদের গলদঘর্ম হতে হত। রীতিমতো যেন প্রাচীন মিশরীয় শিলালিপি পাঠোদ্ধারের জন্য গবেষণা। প্রায় প্রত্যেকটি নোটে থাকত নানাবিধ উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা। তার

সবই যে বিষয়ানুগ হতো না তা নয়। তবে একথা ঠিক, সবগুলোতেই মাননীয় মন্ত্রীর অভিজ্ঞতার ছাপ থাকত এবং সেইসঙ্গে তার মন্ত্রণালয়ের সকলের যাতে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় তার জন্য আন্তরিক চেষ্টা।

তখন ইংরেজীতেই বেশিরভাগ চিঠিপত্র, নোট ইত্যাদি লেখা হত। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ব্রিটিশ ভারতের কিংস কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার, আজীবন সাহেবী কায়দা-কানুনে অভ্যস্ত জেনারেল ওসমানীর জন্য তাতে সুবিধাই ছিল। ইংরেজী লিখতেন জলের মতো, বলতেন অনর্গল। লেখা এবং বলা দু'টোতেই সাহেবী ঢং। তবে লেখাটা ছিল ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের। কখনো কখনো এক বাক্যে নোটের আধাপৃষ্ঠা কাভার। দেদার কমা,সেমিকোলন, ড্যাশ ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে বাক্যগুলো ছিল বুটিদার শাড়ির জমিনের মত। কখনো কখনো যখন বাংলা লিখতেন সে বাংলা ছিল বেশ মজার। দেখলেই বোঝা যেত ইংরেজির কষ্টকর অনুবাদের মতো করে লেখা বাংলা। একবার এক নথিতে লিখলেন; 'হাশিয়াতে আমার নির্দেশ দেখুন'। ভাগ্যিস, নথিটি ছিল আমার শাখার। অন্য কারো হাতে পড়লে হয়ত 'হাশিয়া' শব্দের অর্থ খুঁজতে সেমিনার ডাকতে হত। শব্দটি আমাদের সিলেটের গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়, অর্থ কিনারা। মন্ত্রী মহোদয় ইংরেজী 'মার্জিন' শব্দের পরিবর্তে লিখেছিলেন 'হাশিয়া'। তার বাংলা বানানজ্ঞানের জন্যও, আর যাই হোক, তিনি খুব একটা প্রসিদ্ধ লাভ করেননি। শ স ষ এবং ন ণ-এর স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার ছিল সর্বত্র।

ইংরেজী চিঠি লিখতেন খুব চমৎকার। তার সাহেবী উচ্চারণের জন্য স্টেনো টাইপিস্টরা সকলেই নাকানি-চুবানি খেত। ফলে বেশিরভাগ চিঠিই লিখতেন নিজের হাতে। সে সব চিঠির কায়দা-কানুনও ছিল অন্যরকম। সম্বোধনটা কী রকম হবে, শ্রদ্ধা বা শুভেচ্ছা জানাবেন কী বলে, চিঠির পৃষ্ঠার ডান-বাঁয়ের 'হাশিয়াতে' জায়গা ছাড়তে হবে কতটুকু, খামের ওপরে প্রাপকের নাম কীভাবে লেখা হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটির ব্যাপারে তিনি ছিলেন দারুণ খুঁতখুঁতে। বিশেষ করে পত্র প্রাপকের নামের বানান, ডিগ্রি-ডাগ্রির উল্লেখ, পদবী প্রভৃতি সঠিক ও নির্ভুল না হলে রীতিমতো ফাঁসির আদেশ হয়ে যেত সংশ্লিষ্ট টাইপিস্ট বা কর্মকর্তার। আর মন্ত্রী মহোদয় চিঠিও লিখতেন বটে। অজস্র চিঠি। এর বেশিরভাগই বিভিন্ন মানুষের জন্য সুপারিশ করে। আর না হয় উন্নয়নমূলক কাজ-কর্মের ব্যাপারে। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা, প্রাক্তন সৈনিক, এলাকাবাসী দরিদ্র ব্যক্তিদের চাকরি-বাকরি, চিকিৎসা, জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে হরদম চিঠি লিখতেন।

সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জন্য তার অবারিত দ্বার ছিল ঠিকই, তবে তা ২৭, মিন্টো রোডের বাসায়। যারা দেখা করতে আসতেন তারা বেশিরভাগই হয় মুক্তিযোদ্ধা, না হয় অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, আর না হয় নিজ এলাকার দরিদ্র মানুষ। কালো টাকার মালিক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি কিংবা টাউট কিসিমের নেতা-ফেতারা বড় একটা ধারে-কাছে ভিড়তে সাহস পেত না। আর সত্যি কথা বলতে কী, এ ধরনের মানুষকে তিনি

ভালো চোখে দেখতেন না। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার এবং সাবেক সৈনিকদের জন্য। আর চিরকুমার ওসমানী সবচেয়ে অস্বস্তি বোধ করতেন বোধ হয় মহিলাদের উপস্থিতিতে। কথা-বার্তায় তখন ফুটে উঠত কেমন একটা লাজুক ভঙ্গিমা। সেইসঙ্গে সারাক্ষণ 'এটিকেট' সচেতনতা।

জেনারেল ওসমানীর দেশপ্রেম, সততা, ন্যায়পরায়ণা, সময়ানুবর্তিতা ছিল প্রবাদ প্রতিম। এসব গুণে কোন্‌টি কম তা বলা মুশকিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবকিছুর ওপর স্থান দিতে হবে দেশের স্বার্থ-এই নীতিতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অবিচল। কেউ তাকে এ ব্যাপারে অথবা অন্য যেসব নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন তা থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে চাইলে তার রসগোল্লার মত বড় চোখ দুটি মুহূর্তে রয়েল রসগোল্লায় মত বড় চোখ দু'টি মুহূর্তে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চোখের মত জ্বলে উঠত। আর সেইসঙ্গে দাঁত দু'পাটির কিড়মিড় শব্দসহযোগে অজস্র



জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী

ইংরেজী খিস্তি-খেউড়ের অকুণ্ঠ ব্যবহার। শুনে আমাদের কান গরম হয়ে যেত। রেগেমেগে প্রায়ই বলে বসতেন, 'ইফ আই হ্যাভ টু এগ্রি টু দিস দেন আই শ্যাল রাইট নাও আস্ক বঙ্গবন্ধু টু টেক মাই জব ব্যাক'। এমনিভাবে মুখে মুখে কতবার যে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছেন। শোনা যায়, দু'একবার লিখিত ইস্তফাপত্রও দাখিল করেছিলেন তিনি বাকশাল ইস্যুতে শেষমেষ মন্ত্রিত্ব ও সংসদ সদস্যপদ ছেড়ে দেয়ার আগেই।

অনেক বিষয়েই চট করে রেগে যেতেন তিনি। এর একটি ছিল সময়ানুবর্তিতার লঙ্ঘন। এ ব্যাপারে জেনারেল সাহেব বোধ হয় ব্রিটিশদেরও হার মানাতেন। যাকে বলে, 'মোর ক্যাথলিক দ্যান দ্য পোপ অব রোম হিমসেলফ'। একবার তার এক নির্বাচনী মিটিংয়ে তিনি গেছেন এক গ্রামে। মিটিং হবে অপরাহ্ন তিনটা না চারটার দিকে যেন। তিনি তো কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির। কিন্তু লোকজন কেউ তখনো আসেনি বড় একটা। গ্রামের মানুষের সময়জ্ঞান তো আর অত টনটনে নয় তার মত। তার ওপর সময়টাও বড় বেখাপ্পা। যা হোক, বাংলাদেশে এসব বিষয়ে আমরা সকলেই মোটামুটি অভ্যস্ত। কিন্তু জেনারেল ওসমানী বলে কথা। তিনি অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রেগেমেগে চলে গেলেন সভাস্থল ত্যাগ করে। যাওয়ার সময় নাকি বলে গেলেন, যাদের সময়জ্ঞান নেই মোটেই তাদের ভোটের আমার দরকার নেই।

১৯৭৩ সালের একটা ঘটনায় আমরা টের পেলাম ওসমানী সাহেব কী রকম দৃঢ়চেতা। ঐ বছর আগস্ট মাসে ভারত থেকে একটা প্রতিনিধি দল আসে আমাদের সঙ্গে বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষর করতে। ওরা আসার আগে আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে বার বার বৈঠক করে আমাদের 'ব্রিফ' চূড়ান্ত করি। এর অনেকগুলো বিষয় ছিল উভয়পক্ষের জন্য খুবই জরুরি। আমরা জানতাম ওগুলোতে কোনো পক্ষই ছাড় দেবে না। তবুও মন্ত্রী মহোদয় আমাদের বলে দিলেন একেবারে কঠিন অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে কতদূর পর্যন্ত আমরা ছাড় দিতে পারব। আর ঐ শেষ অবস্থার নামও শিখলাম তার কাছ থেকে : ওটা নাকি 'ডিগ-ইন' পজিশন। সামরিক পরিভাষা। অর্থাৎ পিছু হটতে হটতে ঐ স্থানে পৌছার পর মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বন্দুক তাক করে বসে থাক, শত্রু তোমাকে খতম করুক তবু আর পিছু হটা যাবে না।

লড়াই যখন শুরু হলো অর্থাৎ ভারতীয় দলের নেতা, তাদের যুগ্মসচিব মি. খোসলা এবং আমাদের নেতা যুগ্মসচিব মকসুদ আলী যখন বিনাযুদ্ধে আর সুঁচ পরিমাণ ভূমিও ছাড় দিতে নারাজ তখন ড. আলী আমাকে কানে কানে বললেন, যাও মন্ত্রীকে গিয়ে অবস্থা জানিয়ে এস,. আর এখন কী করা যায় শুনে এস। আমি গেলাম পাশের কামরায় মন্ত্রীর কাছে, অনেকটা করদ রাজ্যের রাজদূতের মত। গিয়ে বললাম ভারতীয়রা কিছুতেই মানছে না আমাদের প্রস্তাব। এখন কী করব? 'শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন...'। দূতহত্যা নিতান্তই রাষ্ট্রাচার বিরোধী, নইলে সেদিন আমার সশরীরে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। তবে আমাদের প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে যেসব শব্দাবলী প্রয়োগ করলেন তা কহতব্য নয়।

এমন সময় মন্ত্রীর একান্ত সচিব ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী ছুটতে ছুটতে এসে জানাল ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার জে এন দীক্ষিত আসছেন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। স্পষ্টতই বোঝা গেল চুক্তিজট এবং আমাদের বিতণ্ডার খবর পৌঁছে গেছে ভারতীয় দূতাবাসে। তার মানে, পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠেছে। মন্ত্রীর ওপর এখন পড়বে কূটনৈতিক চাপ। মন্ত্রী তো একেবারে 'নট নড়ন চড়ন, নট ইস্টেট নাথিং, অবস্থান নিয়ে আছেন। তা হলে কী করা যায়? কে যেন এসে বলল দীক্ষিত বাবু লিফট থেকে বের হয়ে পিএস ইফতেখারের রুমে গিয়ে ঢুকেছেন।

এসব ক্ষেত্রে আমার 'শোল মাছের এক লাফ' বুদ্ধি দেখেছি খোলে ভালো। আমি সাহস করে মন্ত্রীকে বললাম সেই মুহূর্তে কেটে পড়তে, যাতে মি: দীক্ষিতের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ না হয়। মন্ত্রী তাই করলেন। টেবিলের ওপর থেকে রামপুরি টুপিটি তুলে নিয়ে মাথায় বসিয়ে, দু'চারটি জরুরি কাগজ বগলদাবা করে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা চলে গেলেন মাঝখানের সিঁড়ির দিকে। যেতে যেতে বলে গেলেন আমাদের অবস্থান থেকে একতিলও না সরতে। যেন বড়ইবাড়ি বিডিআর ফাঁড়ির জওয়ানদের প্রতি সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশ। .....সেবার সাতদিন যমে-মানুষে টানাটানির পর খোসলা সাহেবের দল চুক্তি স্বাক্ষর না করেই আলোচনার টেবিল থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যায় তেজগাঁ বিমানবন্দরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর ফ্লাইট ধরতে। আমরা পিছু পিছু গিয়ে কত সাধলাম তাদের আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু সকলি গরল ভেল। মন্ত্রী মহোদয়কে যখন ঘটনা জানালাম তখন তিনি দাঁত কিড়মিড় করে ঐ পুরানো কথাই আবার উচ্চারণ করলেন; 'লেট দেম গেট......। ইফ আই হ্যাভ টু এগ্রি.....'। ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে ওটাই ছিল ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রথম কোনো ব্যর্থ আলোচনা। জেনারেলের দৃঢ়তার জন্য আমাদেরকে, তার ভাষায়, 'ডটেড লাইনে' স্বাক্ষর করতে হয়নি। আরো উল্লেখ্য, পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে আমরা যখন উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপে দিল্লী যাই এই আলোচনা আবার শুরু করতে, তখনও জেনারেল সাহেবের একই কথা, ভাঙ্গিও কিন্তু মচকাইও না। সুখের বিষয়, দিল্লীতে ভারতের তৎকালীন বিমান মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রবীণ আইসিএস অফিসার মি. সায়গলের নেতৃত্বাধীন দলকেও আমরা ছাড় দেইনি, আমাদের দাবিগুলো অক্ষুণ্ন রেখেই আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করি। সেবারও আমাদের দলপতি ছিলেন ড. শেখ মকসুদ আলী। তিনি ছিলেন একজন মৃদুভাষী অথচ নীতির প্রশ্নে আপোষহীন ও সৎ সিভিল সারভেন্ট।

১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জন্ম। ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে পাওয়া একটিমাত্র ডাকোটা এরোপ্লেন (প্রথম বিমান ফ্লাইট ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ এবং একটি ট্রেনিং ফ্লাইটের সময় ১০ ফেব্রুয়ারি ওটা বিধ্বস্ত হলে ক্যাপ্টেন নাসির হায়দারসহ কয়েকজন মারা যান) এবং পিআইএ থেকে আগত বাঙ্গালি কর্মকর্তা-কর্মচারী- পাইলট-প্রকৌশলী নিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এর যাত্রা

শুরু। ঐ ডাকোটা এয়ারক্রাফটটি দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর ভারত থেকে দু'টি পুরনো এফ-২৭ পাওয়া গেল। '৭২-এর জুন মাসে টেম্পলউড কোম্পানি থেকে একটা বোয়িং-৭০৭ এয়ারক্রাফট লিজ নিয়ে প্রথম ঢাকা -লন্ডন ঢাকা আন্তর্জাতিক রুটে জাতীয় পতাকাবাহী বিমান উড়ল আকাশে। ক'দিন পর অস্ট্রেলিয়া দিল দু'টি পুরানো এফ-২৭ এবং ডাচ সরকারের অনুদানে ঐ ধরনের আরো দু'টি নতুন বিমান কেনা হলো ফোকার কোম্পানি থেকে। এভাবে যখন বিমান কেবল ডানা মেলতে শুরু করেছে তখন স্বভাবতই সরকারের উৎকণ্ঠা এয়ারলাইনটি উড়তে না উড়তেই যেন মুখ থুবড়ে না পড়ে। জেনারেল সাহেবের নাওয়া-খাওয়া হারাম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টায়। তিনি শুরু থেকেই সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন। নিজের নিয়ন্ত্রণে মানে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে। ছোট বড় সব সিদ্ধান্তই দেবে মন্ত্রণালয়। ফলে শিশু বিমান কেবল হামাগুড়ি দিতে থাকল, দু'পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শিখল না। এ ব্যাপারে তখনকার বিমান সচিব জনাব সুলতানুজ্জামান খান (জনাব নূরুল কাদের খানকে মাস তিনেকের মধ্যেই সরিয়ে দেয়া হয় মন্ত্রণালয় থেকে) মন্ত্রীকে যথেষ্ট বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু ফলাফল শূন্য। মন্ত্রীর ধারণা, সূতো একটু ছেড়ে দিলে ভো-কাট্টা হয়ে যাবে ঘুড়ি। মন্ত্রীর ভাষায় : 'ইফ ইউ লিভ ইট উইথ দেম, দে উইল কুক দ্য গুজ'। আমরা লক্ষ করলাম, মন্ত্রী মহোদয় ভীষণ সন্দেহপ্রবণতায় ভোগেন। হয়ত বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্বন্ধে কোনও গোয়েন্দা সংস্থাও তার কাছে বেশি বেশি লাগিয়ে থাকবে।

একবার হলো কী, বিমানের এক সিনিয়র কর্মকর্তা আমার কাছে ছুটতে ছুটতে এলেন। কী ব্যাপার? না আমেরিকা থেকে তারবার্তা এসেছে-তার বড় ভাই মৃত্যুশয্যায়। তাকে আজ রওয়ানা হতে হবে ভাইকে শেষ দেখা দেখতে। এই ভাইটি তাকে পড়াশুনা করিয়েছেন, মানুষ করেছেন।

তখন নিয়ম ছিল, বাইরে যেতে হলে মন্ত্রীর অনুমতি লাগবে। (ভালো কথা, আজকাল নাকি ব্যক্তিগত প্রয়োজন বাইরে যেতে চাইলে চরফ্যাশনের একজন পিয়নের নথিও প্রশাসনিক সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যায় অনুমোদনের জন্য। এরূপ ব্যবস্থাপনায় পিয়ন পদের মর্যাদা দেখে যেমন ঈর্ষা লাগে তেমনি এ ধরনের ছোট-খাট বিষয়ে অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রতাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ব্যস্ত রাখার আমাদের কূটকৌশল দেখেও অবাক হতে হয়)। যা হোক, জেনারেল ওসমানীর আবার কাউকে বিদেশ যেতে দিতে ভীষণ এলার্জি ছিল। আমরা তাই বাইরে যাবার 'কেস'গুলো প্রচলিত নীতিমালার আলোকে খুব যাচাই-বাছাই করে দেখতাম। তা ঐ অফিসারের নথিটি মানবিক কারণে আমি তক্ষুণি যুগ্ম সচিব ও সচিবের কাছে হাতে হাতে গিয়ে সই করিয়ে নিলাম। তারপর নিজেই গেলাম মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে। এদিকে ঐ আবেদনকারী অফিসার সাশ্রুনয়নে আমার কামরায় বসে আছেন। মন্ত্রী মহোদয়ের মুড দেখলাম খারাপ না। আমি খুব তরিবতের সঙ্গে বিষয়টি বললাম। ও আল্লা। মন্ত্রী দেখি কোথায় সহি করবেন তা না আমাকে বললেন, প্লিজ সিট ডাউন।

লেট আস ট্রাই টু ভেরিফাই দ্য কেস। আমি মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হলাম। একটা লোকের ভাই মারা যাচ্ছে ১২ হাজার মাইল দূরে, আর এই হুজুর কেস ভেরিফাই করতে বসলেন। আমি সাহস করে বললাম, কিন্তু স্যার, ওর ভাইটি যদি ইত্যবসরে পটল তোলে? তিনি বললেন, মরার হলে তো ভাই আমেরিকা পৌঁছার আগেও মরতে পারে। বলতে বলতে লাল টেলিফোন তুলে তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব জনাব কিবরিয়ার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। লক্ষ্মৌয়ি ও সিলেটি শরাফতির সঙ্গে মিলিটারি ও কূটনৈতিক সার্ভিসের রাষ্ট্রাচারের ভিয়েন দিয়ে দীর্ঘ কুশলাদি বিনিময়ের পর (পাঞ্জাবীরা এ ব্যাপারে খুব বৈষয়িক। তারা বিবি-বাচ্চাদের খোঁজ-খবর নেয়ার পর মাল-মবায়েশিয়া, ডাঙ্গর অর্থাৎ সয়সম্পত্তি, গবাদিপশু ইত্যাদিও খায়-খয়রিয়াত জিজ্ঞেস করে। উল্লেখ্য, পাঞ্জাবে আগে-এখন জানি না, খুব মহিষ চুরি হত। সংঘবদ্ধমহিষ চোরদের যারা প্রতিরক্ষণ করত তাদের বলত রসাগীর অর্থাৎ আসল রশিটা থাকত তাদের হাতে)। তিনি বললেন, কিবরিয়া, ইন ওয়ান অব মাই আউটফিটস দেয়ার ইজ এ চ্যাপ কল্‌ড.....। হি টেলস আস দ্যাট হি হ্যাজ গট এ টেলিগ্রাম ফ্রম দ্য স্টেটস। .....প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বললেন, একটু খোঁজ নিন তো ব্যাপারটা সত্যি কিনা। বাট সুয়্যরলি দিস শুড বি ডান ডিসক্রিটলি এ্যান্ড আ লিটল কুইকলি বাই আওয়ার মিশন ইন ওয়াশিংটন। মন্ত্রী মহোদয়ের এ ধরনের গোয়েন্দাগিরি আমার ভালো লাগল না। বেচারার ভাই মারা যাচ্ছে বিদেশে আর উনি গোয়েন্দা লাগাচ্ছেন তার পিছে। তাছাড়া বিমানের কর্মচারীদের বিদেশ যেতে টিকেট বাবদ সরকারি-বেসরকারি কোনো খরচই লাগে না, যেহেতু এসব সিনিয়র অফিসাররা ইন্টারলাইন ট্রাভেলের সুবিধা পান। যা হোক, কী আর করা। 'বস্ ইজ অলওয়েজ রাইট' এই থিয়োরি তো চাকরিতে ঢুকেই মুখস্থ করেছি। মন্ত্রী বললেন, ফাইলটা তার কাছে রেখে আসতে এবং ঐ অফিসারকে বলতে যে দু' একদিনের মধ্যে আদেশ জারি হয়ে যাবে। মন্ত্রী আজ ব্যস্ত তাই আজ আর হলো না। তবে অফিসারটি যাত্রার প্রস্তুতি নিতে পারেন।

দু'দিন পর মন্ত্রী হঠাৎ ফোন করলেন আমাকে। করিম, ক্যান ইউ প্লিজ শাট ডাউন ইওর শপ ফর এ মিনিট এন্ড কাম টু মাই অফিস? ছুটতে ছুটতে গেলাম মন্ত্রীর রুমে। ঢুকতেই তিনি আমাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন এবং একটি ট্যালেক্স বার্তা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, রিড ইট। দেখি বার্তাটি এসেছে বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন থেকে। তার সারমর্ম হচ্ছে, অমুকের বড় ভাই অমুকের খোঁজ নিয়েছি আমরা তার বাসায় লোক পাঠিয়ে। তিনি বহাল তবিয়তে আছেন। তবে আমরা খোঁজ নিচ্ছি দেখে তিনি কিছুটা আপসেট হয়ে যান।

এবার টেলেক্স- বার্তা পড়ে আমার তো পুরো সেটআপই আপসেট হওয়ার দশা। জেনারেল শুধু মৃদু হাসলেন এবং বললেন 'বেটাকে এবার মাফ করে দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে তার পশ্চাদ্দেশে কষে লাগানোর জন্য একটি পদাঘাত তোলা রইল' নথিতে

বিশেষ কিছু না লিখে শুধু লিখলেন, ইট ইজ অলওয়েজ গুড টু গেট থিংস চেকড্ এ্যান্ড দেন বি স্যুয়র। হ্যাঁ, স্বীকার করি, সন্দেহ প্রবণতার বাতিক ছিল জেনারেল ওসমানীর। কিন্তু নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনে তাকে প্রায়শই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তার সেনাজীবনে যেমন এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে অনেক গল্প আছে, মন্ত্রী হয়ে বিমান, বিমানবন্দর, জাহাজ, সমুদ্রবন্দর ইত্যাদিতেও এর প্রয়োগ নিয়ে তার বাড়াবাড়ি সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু এও ঠিক, স্বাধীনতার পর এ সকল নতুন নতুন সংস্থায় একজন কড়াকড়ি না করলে এগুলোর অস্তিত্ব আঁতুড়েরই হয়তো বিপন্ন হয়ে পড়ত।

নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলার প্রয়োগে তাকে কোনো স্বজনপ্রীতি বা দলীয়প্রীতির প্রশ্রয় দিতে দেখিনি কখনো। তখন ব্যাঙের ছাতার মতো ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা গজিয়ে উঠছে চারদিকে। সদ্য স্বাধীন দেশ, লোকজনের বিদেশ যাত্রা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে বলেই এ ব্যবসার রমরমা। অনেক ঠক-জোচ্চোর ঢুকে পড়েছে এই ব্যবসায়। মন্ত্রী মহোদয় আইন করে দিলেন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কেউ এই ব্যবসা করতে পারবে না। কড়া কড়া শর্ত লাগিয়ে দিলেন অনুমতিপ্রাপ্তির জন্য। ফলে প্রায় সব দরখাস্তই তার কাছে গিয়ে না হয়ে আসে। একবার এক দরখাস্ত পেলাম, দরখাস্তকারীর গ্রামের নাম দয়ামীর। মন্ত্রী সাহেবের গ্রামের লোক বা আত্মীয়-টাত্মীয় হবে। নথি পাঠিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম দেখি এই পরীক্ষায় মন্ত্রী পাস করেন কিনা। এটাও না হয়ে এল। মন্ত্রী দশে দশ পেলেন পরীক্ষায়। এমনি অসংখ্য উদাহরণ আছে।

তার কাছে কোনো ফাইল একদিনের বেশি কচিৎ পড়ে থাকতে দেখেছি। অফিসে অনাবশ্যক আড্ডা বা ফালতু দর্শনার্থীর ভিড় ছিল না বলে টেবিলে নাক ডুবিয়ে কাজ করতেন নিরিবিলি বসে। 'প্লিজ ডিসকাস' বা 'আলাপ করুন' বলে নথি ফেরত দিতেন খুব কম। আলোচনা করতে হলে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ডেকে নিতেন অফিসে।

আমার আবার কখনো কখনো তার বাসায় (২৭নং মিন্টো রোড) ডাক পড়ত অসময়ে। আমার আস্তানা ছিল কাছেই, বেইলি রোডের সার্কিট হাউসে। আমি হয়ত রাত ৮টা/৯টায় অফিস থেকে ফিরেছি পরিশ্রান্ত হয়ে। হয়ত কেবল খেয়ে-দেয়ে উঠেছি, এমন সময় ফোন। স্যার বলছেন? তার বাসায় তার অতি বিশ্বস্ত এন.সি.ও সাত্তার যে ছিল তার ফ্রেন্ড, ফিলসফার এ্যান্ড গাইড-এর গলা। স্যার, মিনিস্টার সাহেব কথা বলবেন। আমি তখনই বুঝতাম আজ রাত দুপুর পর্যন্ত আরাম হারাম হয়ে গেল। তবে তার আমন্ত্রণটি ছিল মন-কাড়া। করিম? হাউ আর ইউ? হাউ ইজ ম্যাডাম? হাউ আর দ্য চিলড্রেন ডুয়িং?---করিম, উড ইউ মাইন্ড ইফ আই সেন্ড ডাউন মাই রামশ্যাকল কার ফর ইউ? আই উড বি গ্রেইটফুল ইফ ইউ উড কাম টু মাই প্লেস ফর এ ফিউ মিনিটস টু ডিসকাস ওভার এ কাপ অব কফি হোয়াট আই থিংক কোয়াইট আরজেন্ট---। ২৭ নম্বরের দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকের প্রথম ঘরটা ছিল তার বেডরুম। বাহুল্যবর্জিত, তবে সাহেবী কায়দায় সাজানো গোছানো বিছানার পাশেই

টিপয়ের ওপর দামী ডক্যান্টার। আরেক পাশে ছোট বুক শেলফে সুন্দর করে সাজানো পুঁথি-পুস্তক, ছোট্ট একটি ওয়ার্ডরোব। ডিক্যান্টার শুধু সাজানোর জন্যই, এর কোনো ব্যবহার ছিল না।

এখানে বলা উচিত, জেনারেল ওসমানীকে কখনো মদ্য স্পর্শ করতে দেখিনি। অনেকে হয়ত জানেন না, জেনারেল সাহেব নামাজ-কালাম পড়তেন, প্রায় প্রতিদিন কোরান শরীফ পাঠ করতেন। তবে সবই নীরবে, লোকচক্ষুর আড়ালে।

সিঁড়ির ডান দিকের ঘরটি ব্যবহার করতেন অফিস কামরা হিসেবে। একদিন রাতে তার আহ্বানে গিয়ে দেখি জেনারেল ঐ ঘরে বসে এক মনে কাজ করছেন। গরমের দিন। জেনারেলের গায়ে শুধু একটি হাতাকাটা গেঞ্জি। টেবিলের নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে লুঙ্গি গুটানো উরু পর্যন্ত। ঘরটিতে এয়ার কন্ডিশনার নেই। মাথার ওপরে ঘটাং ঘটাং করে শুধু একটা শব্দায়মান ফ্যান চলছে জোরে জোরে। সামনের ফাইলটি শেষ করে শুরু করলেন শরাফতি। তুমি সারাদিন অফিসে কাজ কর, এমনকি ছুটির পরও অফিসে থাক তিন চার ঘন্টা। তোমার কাজের চাপ বেশি। তোমার বেগম সাব নিশ্চয়ই আমাকে শাপান্ত করেন। কিন্তু কী করব বোঝই তো.....ইত্যাদি। তবে ভাষা সেই ইংলিশ। সিলেটি বা বাংলা কোনোটাই না। ভাবখানা, বাড়িতে এসেছে তাতে কী হয়েছে? তুমি তো আফটার অল সিভিল সার্ভিসের একজন অফিসার এবং আমিও তো আলীগড় ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট তথা ব্রিটিশ আর্মির কমিশন্‌ড অফিসার। অতএব......। অতএব, চা খাবে না কফি? সঙ্গে চিকেন টিক্কা আর আমার কুকের নিজের বানানো চিলি সস্‌। কয়েক টুকরো গাঁজর, টমেটো দু'টুকরো, দু'টুকরো অষ্টগ্রামের পনীর আর হাউ উড ইউ লাইক টু স্লাইসেস অব টমেটো অলসো। ভাত খেয়ে এসেছ তাতে কী হয়েছে। ইউ আর এ ইয়ংম্যান। ইউ নো, হুয়েন আই ওয়াজ ইন দ্য জাঙ্গলস্‌ অব বার্মা ডিয়োরিং দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ওয়াঙ্গ ইট সো হ্যাপেন্ড....।

ব্যস খুলে গেল স্মৃতির দুয়ার, শুরু হলো গল্পের আসর। বার্মার জঙ্গল থেকে তরাইনের বাঘ শিকার ('দ্যাট ম্যাজেস্টিক ক্রিয়েচার') তার বাবার চাকরিস্থল শিলং-গৌহাটির গল্প, 'সোলেন হেডেড'পাকিস্তানি ড্রাংক জেনারেলদের কাহিনী এমনি এক গল্প থেকে আরেক গল্প। যেন আরব্যরজনীর পাতা উল্টিয়ে চলেছেন এক গল্পদাদু কিংবা অনেক অচেনা বন্দরের কাহিনী শোনাচ্ছেন এক এইনশন্ট মেরিনার। আমি মোহাবিষ্ট শ্রোতার মতো শুনছি আর ভাবছি, আশ্চর্য, এই লোকটিকে না আমরা কত ভয় পাই, ভাবি লোকটা কী কাঠখোট্টা। জেনারেল গল্প বলতে বলতে কখনো চোখদু'টো বিস্ফারিত করছেন, কখনো ঠোঁট বাঁকাচ্ছেন কাউকে নকল করতে, কখনো হাসছেন মৃদু মৃদু। এক ফাঁকে হঠাৎ যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে ফিরে এলেন বাস্তবের জগতে। সরি, করিম। আই হ্যাভ ডাইগ্রেসড টু মাচ। সরি ফর দ্যাট। একচুয়েলি আই ওয়ান্টেড টু ডিসকাস দ্য লিজিং অব দ্য নিউ বোয়িং ৭০৭, এ্যান্ড লুক এ্যাট মি,

হোয়াট এ্যাম আই ডুয়িং? বাই দ্য ওয়ে, হোয়াট ডু ইউ রিয়ালি মিন বাই ড্রাই লিজিং?--- তার আকাশী নীল রংয়ের পুরোনো মার্সিডিস বেন্জ গাড়িটি যখন আমাকে বাসায় নামিয়ে দিল, সার্কিট হাউস তখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন।

১৯৭৩ -আর আগস্টে তো ইন্ডিয়ানরা এসে তম্বি-তন্বা করে চলে গেল। আমরাও জেনারেলের শেখানো 'শির দেগা, নাহি দেশ আমামা' মন্ত্রের বলে মোটামুটি ভালোই মোকাবেলা করলাম তাদের। কিন্তু তার আগের মাসে অর্থাৎ জুলাইয়ের ২ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত ১৭টি দিন কিন্তু ছিল অন্যরকম হিসাব-কিতাব। তখনো ছিল বিমান চলাচল চুক্তি নিয়ে আলোচনা। এবার প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। একদিকে একটি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আনাড়ি দল যারা টেস্ট খেলা তো দূরের কথা, কোন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচেও নামেনি কোনোদিন, আরেকদিকে অস্ট্রেলিয়া। ফলে আলোচনার টেবিলে আমাদের নাকানি-চুবানি খাওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। নেদারল্যান্ডস দলের ব্রেট লি ছিল ঐ দলের মি: ফিনেস্ট্রা নামের এক তরুণ আইনজীবী। আমার চাকরি জীবনে পরেও তার মতো এমন তুখোড় নিগোশিয়েটর খুব কম দেখেছি। যা হোক, এই দলটির সঙ্গে আমাদের দর কষাকষি দাঁড়াল অনেকটা ক্যাট এ্যান্ড মাউসের মত। তবে বিরাট ফায়দা হলো একটা-১৭ দিনে আমরা সবাই শিখলাম অনেককিছু। যেন ইন-সার্ভিস ট্রেনিং কোর্স করলাম একটা মন্ত্রণালয়ের সবাই। যার ফলে এরপর ইন্ডিয়া বা অন্য প্রতিপক্ষরা, জেনারেল ওসমানীর ভাষায়, 'কুডন্ট্ টেক আস ফর এ রাইড'।

কিন্তু ঘটনা একটা ঘটে গেল ঐ জুলাই মাসেই। ডাচরা যখন প্রথম ন'তলা দালানের শীর্ষতম তলার সম্মেলন কক্ষ থেকে ১৭দিন আমাদের এই নিচে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল তখন আমার টেবিলে জমে ওঠে ফাইলের পাহাড়। (আমার এক অধ:স্তন সহকর্মী তার বিশেষ উচ্চারণের কারণে 'ফাইলস হ্যভ পাইলড আপ' বলতে পারত না, বলত 'পাইলস হ্যাভ ফাইলড আপ'। আমি এর বাংলা করে বলতাম 'অর্শরোগের ওপর ফাইল খোলা হয়েছে'। প্রায়ই নথিতে সে লিখত, আমরা এই পত্রের 'কফি' (কপি) বিমানে পাঠাতে পারি। বিরক্ত হয়ে একদিন আমি লিখলাম রোজ রোজ 'কফি' না পাঠিয়ে মাঝে মাঝে চা পাঠাবেন। কফির দাম বেশি। একদিন অফিসে তার মুখে তার মামার 'হেনীতে পাউন্টেন ফেনের' দোকানের গল্প শোনার পর হাসির চোটে আর কাজকর্ম করতে পারিনি আমরা।

আসলে ঐ দিনগুলোতে আমি সকাল ন'টার দিকে অফিসে গিয়ে ঢুকতাম আলোচনা কক্ষে, আর বেরোতাম রাতে। ঐ কামরাতেই খাওয়া-দাওয়া হত। ফলে খুব জরুরী নথি ছাড়া নথি দেখা হতো না। আমার পি.এ. লক্ষ্মীকান্তকে বলা ছিল মন্ত্রী বা সচিবের কাছ থেকে যেমন নথি আসবে বা যেগুলো জরুরীভিত্তিতে তাদের কাছে যাবে সেগুলো যেন সে অবশ্যই আমার নজরে আনে। সে তা করতও বটে। আমি রাতে বাসায় ফেরার সময় লালসালু কাপড়ে বেঁধে ঐসব নথি নিয়ে গিয়ে পরদিন ফেরত আনতাম। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তের বেখেয়ালিতে একটা অতি জরুরী ফাইল প্রায়

দশদিন চাপা পড়ে যায় আমার টেবিলে। ঐ নথিতে মাননীয় মন্ত্রী কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ বিমানের শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার ওপর। এর কয়েকটি ছিল তাদের অনুকূলে। প্রসঙ্গত, কিছু কিছু বিষয়ে বিমানের শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে আমার মতানৈক্য ছিল বলে তারা তক্কে তক্কে ছিল আমাকে বিপদে ফেলার জন্য। মন্ত্রীর ফাইল দশদিন আমার টেবিলে পড়ে থাকায় এরা গিয়ে মন্ত্রীকে বলল, আমি নাকি এন্টি গভর্নমেন্ট, এন্টি স্টেট, এন্টি আওয়ামী লীগ ......। মন্ত্রী যখন ফাইলের খোঁজ করলেন তখন ডাচরা চলে গেছে। আমি ফাইল খুঁজে বের করে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু তার আগেই বোমা ফেটে গেছে। মন্ত্রী কনভিনস্‌ড হয়ে গেছেন আমি সত্যি রাষ্ট্রদ্রোহী, সত্যি দেশদ্রোহী, সত্যি.....।

আমার সহকর্মী মাহে আলম তখন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব। সে আমাকে জানাল আমার মন্ত্রী অবিলম্বে আমাকে তাঁর মন্ত্রণালয় থেকে সরাতে বলেছেন তৎকালীন যুগ্ম-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় জনাব এটিএম সাইদ হোসেনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে। আরো বলেছেন, আমাকে শুধু বদলিই নয়, 'এত বড় রাষ্ট্রদ্রোহী, সরকার বিরোধী অফিসারকে আজই পি.ও নাইন-এর আওতায় চাকরি থেকে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা নিন' শুনে তো আমার হাত-পা ঠাণ্ডা।

ঐ সময়ে আমার 'বস' সচিব জনাব সুলতানুজ্জামান খান সাত দিনের জন্য গিয়েছিলেন পূর্ব জার্মানী। উদ্দেশ্য, ঐ সরকারের সঙ্গে জাহাজ চলাচল চুক্তি স্বাক্ষর করা। তার অবর্তমানে আমি কাউকে খুঁজে পেলাম না যে বিষয়টি বলব। একমাত্র বুদ্ধিদাতা গণেশ মন্ত্রীর একান্ত সচিব ইফতেখার। ও বলল, করিম ভাই, ওল্ড ম্যানের সঙ্গে আপনি দেখা করে বুঝিয়ে বলেন ব্যাপারটা। আমি রাজি হলাম, কিন্তু ওল্ড ম্যান রাজি হলেন না। একটা রাষ্ট্রদ্রোহীর সঙ্গে দেখা করা যায়? মাথা খারাপ? ইফতেখার তখন মন্ত্রীর জানী দোস্ত মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুর রবের শরণাপন্ন হল। জেনারেল রবের মতো এমন বিশাল হৃদয় পরোপকারী মানুষ খুব কমই দেখেছি। তিনি বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী নাকি সব শুনলেন, বললেন না কিছু। পরে জেনারেল রব আমার কামরায় এসে আমাকে বলে গেলেন, বুড়োকে বলেছি, কেউ বলল চিলে কান নিয়ে গেছে, আর অমনি দৌড়াতে শুরু করলে চিলের পেছনে? ডোন্ট উওরি ইয়ংম্যান, রিল্যাক্স। এদিকে ইফতেখারের মারফত উপ-সচিবদের ব্যক্তিগত নথির স্তূপ আনাতে শুরু করেছেন জেনারেল, উদ্দেশ্য, আমার পরিবর্তে একজন যোগ্য লোককে বেছে নেয়া। কিন্তু কোনটাই তার পছন্দ হয় না। 'নো, নান ক্যানম্যাচ দ্যাট ব্লাডি গাই'। শুনলাম, এন.এস.আই, ডি.এফ.আই. ঘাঁটাঘাঁটি করেও নাকি আমার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। আমি অপেক্ষা করছি সচিবের ফিরে আসার। নীরবে কিনে চলেছি সময়। একেকটা দিন কাটছে একেটা বছরের মত। আট-ন'দিন পর সচিব জনাব সুলতানুজ্জামান খান ফিরলেন অফিসে। আমি তাকে জানালাম কী যন্ত্রণায় কাটছে আমার দিন। সব শুনে তিনি একটি সিগ্রেট ধরিয়ে অভ্যাসমতো প্রথমেই একটা

সুখটান দিলেন, মুখে কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি মন্ত্রীর কাছে গেলেন ওপরের তলায়। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে তিনি ফিরে এলে আমি পড়ি কি মরি করে ঢুকলাম তার ঘরে। শুনলাম ঝড় থেমেছে।

পরে ইফতেখারের কাছে শুনেছি সচিব নাকি মন্ত্রীকে বলেছেন, ওকে যদি এখান থেকে সরান তা হলে আমাকেও সরিয়ে দিন। বিনা দোষে একজন অফিসারের বিরুদ্ধে আপনি এরকম ব্যবস্থা নিতে পারেন না। আল্লাহকে ধন্যবাদ, সুলতানুজ্জামান সাহেবের এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী জীবনে আমি নিজেও অনুসরণ করেছি জুনিয়র সহকর্মীদের আপদে-বিপদে।

জেনারেল সঙ্গে এই 'লাভ এ্যান্ড হেইট' সম্পর্কের পরবর্তী পর্যায়ে ঘটল আরেক কাণ্ড। মন্ত্রী দেখি আমার সব কাজেই শুধু দারুণ সন্তুষ্টই নন, কথাবার্তা আচার-আচরণে কেমন বিগলিত বিগলিত ভাব।

এরপর যখন ভারতীয়রা এল এবং আমরা খুব' 'পলাইটলি বাট ফার্মলি' তাদের মোকাবেলা করলাম, মন্ত্রীর আস্থা তখন আরো বেড়ে গেল।

পরের বছর অর্থাৎ চুয়াত্তর সালের জুন মাসের দিকে হঠাৎ করে এফ-২৭ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারটা খুব নাজুক হয়ে দাঁড়াল। সবগুলো এয়ারক্রাফট বসে যাওয়ার যোগাড়। জরুরি ভিত্তিতে কোন এয়ারলাইনের সঙ্গে চুক্তি না করলে বিপদ। মন্ত্রী তখন তার পাকস্থলী সংক্রান্ত চেকআপের জন্য সি-এমএইচ-এ ভর্তি হয়েছেন। তার পাশের কামরায় গলব্লাডার অপারেশনের পর সুস্থ হয়ে উঠছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.জি. মাহমুদ, বিমানের পরিচালক (অপারেশনস)। এক শনিবার বিকেলে সচিব আর আমি নথিপত্র নিয়ে গেলাম সিএমএচ-এ। মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হলো বিষয়টি নিয়ে। আলোচনায় এ.জি. মাহমুদ সাহেবও এসে শরীক হলেন। সিদ্ধান্ত হলো বিমানের ম্যানেজার (প্রকৌশল) হুমায়ুন কবীর এবং বিমানে কেএলএম-এর কারিগরি উপদেষ্টা মি: টেমস পরবর্তী ফ্লাইটে যাবেন সিঙ্গাপুর। পরবর্তী ফ্লাইটে মানে থাই এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে, মঙ্গলবার দুপুরে। জেনারেল আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এ্যান্ড সেন্ড দিস জেন্টেলম্যান অলসো উইথ দ্য টিম। শুনে আমি হকচকিয়ে উঠলাম। আমি? আমি কেন? এসব কারিগরি বিষয়ের আমি কী বুঝি? ফিসফিস করে পাশে বসা সচিবকে আমার অনীহার কথা বললাম। তিনি বললেন, চুপ কর। মন্ত্রী কী বলছেন শোন। আমি সাহস করে মন্ত্রীকেই বলআম, স্যার, বিষয়টি পুরো টেকনিক্যাল। আমি তো এসব নেগোশিয়েশনের কিছুই বুঝব না। আমার বোধহয় না যাওয়াই উচিত। মন্ত্রী রুলিং দিলেন : নো ইউ উড গো এজ মাই রিপ্রেজেন্টেটিভ।

আমি এর আগে পাকিস্তানের চাকরি করা ব্যতীত কখনো বিদেশে যাইনি। ফলে একদিনের মধ্যে পাসপোর্ট করে, কোনও রকম করে দু'দিনের ভেতর এক জোড়া কোট-প্যান্ট ঠিকঠাক করে, আমার সেই আমলের লম্বা বাবরি চুল পাইট করে মন্ত্রীর প্রতিনিধি হয়ে ছুটলাম সিঙ্গাপুর।

এর মধ্যে শোনা যাচ্ছিল আমাকে ডি.সি হয়ে যেতে হবে কোনো জেলায়। (উড় , উড় শোনা যায় তপতী সেনের নাকি বিয়ে; নরেশ গুহ।) আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কারণ আমার স্ত্রী তখন ঢাকায় অধ্যাপনায়রত, বাচ্চারা পড়ে স্কুলের নিচের ক্লাসে। এদেরকে ঢাকা থেকে লাগেজ বানিয়ে কোথাও সঙ্গে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই সরকারের শনির দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। বরিশালের ডি.সি শামসুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী কবি জাহানারা বেগম সড়ক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে মারা যাওয়ার পর ওখানে ডি.সি. হিসেবে আমাকে পাঠানোর কথা উঠল। শুনে জেনারেল সাহেব ছুটে গেলেন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে এবং ওটা ঠেকিয়ে দিলেন। আমি খুশি হলাম। যদিও আমি তাকে কিছুই বলিনি বদলির ব্যাপারে। কিন্তু নভেম্বর চুয়াত্তরে যখন কুষ্টিয়া যাওয়ার আদেশ হলো আমার, তখন জেনারেল ফেল মারলেন, উনি আর কিছুতেই ঠেকাতে পারলেন না। ১৬ নভেম্বর বিকেলে আদেশ পেয়ে ১৯ নভেম্বরই আমাকে কুষ্টিয়া রওনা হতে হলো বিমান মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের দায়িত্ব ছেড়ে। বিদায় নেয়ার সময় জেনারেল আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন কিছুক্ষণ। মুখে বললেন, আই উইশ ইউ ওয়েল, মাই বয়। গড ব্লেস ইউ। তার কামরা থেকে চলে আসার সময় ভুল দেখলাম কিনা জানি না, মনে হলো জেনারেলের চকমকি জ্বলা ব্যাঘ্রচোখের কোণে পানি।

এপিটাফ : তার কাছ থেকে শেখার ছিল অনেক কিছুই -দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, অনেক কিছুই। হয়ত শেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঐ মাপে পৌছা অসম্ভব না হলেও নি:সন্দেহে দুরূহ।

যখনই সিলেটে হযরত শাহজালাল (র.) এর মাজার জিয়ারত করতে যাই, জেনারেলের কবরের পাশে গিয়ে অবশ্যই দাঁড়াই কিছুক্ষণ। জিয়ারত করি তার কবর। কেন জানি মনে হয়, তিনি আমার সামনেই বসে আছেন। এবং আমার কাছে সব সময়ই, এমনকি আজ তার মৃত্যুর এতদিন পরেও, শুধু নেপোলিয়নই নয়, সারা দুনিয়ার অনেক অনেক জেনারেলের চাইতে সেই ছোট মানুষটিকে অনেক বেশি দীর্ঘকায়, অনেক বড়মাপের মানুষ মনে হয়।

ইচ্ছে হয় হুইটম্যানের কবিতাটির শিরোনাম বদলিয়ে 'ও জেনারেল, মাই জেনারেল' করে পুরো কবিতাটিই নিবেদন করি তার উদ্দেশে।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়

লে. কর্ণেল এম. এ. মঞ্জুর, বীর উত্তম

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী যা মুক্তিবাহিনী হিসেবেই বেশি পরিচিত তা গঠিত হয়েছিল প্রাক্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, সেনাবাহিনী, নৌ, বিমানবাহিনী, পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ সদস্যদের দ্বারা গড়ে তোলা নিয়মিত বাহিনী এবং ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবী কৃষকদের নিয়ে গঠিত গণবাহিনীর দ্বারা। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল ৩,০০০ নিয়মিত বাহিনী ও ২৫,০০০-য়ের উপরে গণবাহিনীর যোদ্ধা। এছাড়া ছিল, স্থানীয়ভাবে সংগঠিত এবং পরিচালিত অসংখ্য প্রতিরোধ গ্রুপ। ৪ মাউন্টেন ডিভিশন, ৯ পদাতিক ডিভিশন, একটি প্যারাসুট ব্যাটালিয়ন এবং বেঙ্গল এরিয়ার এক ব্রিগেড শক্তিসম্পন্ন একটি বাহিনী নিয়ে ভারতীয় ২ কোর চূড়ান্ত আক্রমনে অংশ নেয়।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যৌথবাহিনীর (ভারতীয় সেনাবাহিনীর ও বাংলাদেশ বাহিনীর) রণকৌশল ছিল যত দ্রুত সম্ভব এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পদের সবচে কম ক্ষতিসাধন করে পাকিস্তানি বাহিনীকে ধ্বংস করা। যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ছিল;

(ক) নিয়মিত বাহিনী দ্বারা যত দ্রুত সম্ভব কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা দখল করা।

(খ) শত্রুপক্ষের অবস্থানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে একই সময় গেরিলা আক্রমণ তীব্র করা।

(গ) গোয়ালন্দ ও আরিচা ঘাটের মাঝ দিয়ে পদ্মা পাড়ি দিয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকা।

একাত্তরের ২০ শে নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম শুরু করে। এর আগে মুক্তিবাহিনী নিজেদের মতো করে কাজ করে এবং ছয়টা জেলাতেই নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। নিয়মিত বাহিনী দেশের ভেতরের মুক্তাঞ্চলে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে, যেখন থেকে তারা গণবাহিনীর গেরিলা অপারেশনসমূহ পরিচালনা করত। এসব ঘাঁটিগুলোর অধিকাংশ নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হতো; চুয়াডাঙ্গায় ক্যাপ্টেন তৌফিক, মাগুরায় ক্যাপ্টেন ওয়াহাব, নড়াইলে লেফটেন্যান্ট সিদ্দিকী ও সার্জেন্ট নজরুল ইসলাম, গোপালগঞ্জে হাবিলদার হেমায়েতউদ্দীন, মাদারীপুরে স্টুয়ার্ড মুজিব ও ফরিদপুরে

জনাব নূর মোহাম্মদ (যার সঙ্গে পরে যোগ দেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামাল উদ্দিন চৌধুরী এমসিএ,) মণিরামপুরে সফিকউল্লাহ ও ফ্লাইং অফিসার ফজলুর রহমান, সাতক্ষীরায় চিফ পেটি অফিসার রহমাতুল্লাহ ও লেফটেন্যান্ট আরেফিন, বাগেরহাটে তাজুল ইসলাম (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রাক্তন জুনিয়র কমিশনড্ অফিসার), সুন্দরবনে লেফটেন্যান্ট জিয়া, পটুয়াখালিতে লেফটেন্যান্ট মেহেদী, বরিশালে ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর এবং ভোলায় হাবিলদার সিদ্দিক। নিয়মিত বাহিনীর একটা বড় অংশ বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তজুড়ে মুক্ত এলাকায় বেশ্ কয়েকটি ঘাঁটি গড়ে তোলে যেখানে গণবাহিনীর তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের ভেতরে গেরিলা অপারেশনসমূহ চালানোর জন্যে নিয়োজিত করা হতো। এসব ঘাঁটি থেকে সরবরাহসমূহ প্রদান করা হতো। এসব ঘাঁটিগুলা ছিল সাব-সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে যারা দেশের গভীরে অবস্থিত যেসব কমান্ডারদের কথা আগে বলা হয়েছ তাদের মাধ্যমে নিজ নিজ অঞ্চলের গণবাহিনীর অপারেশনসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতেন। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে পরিচালিত নৌ-কমান্ডোর অপারেশনসমূহও এসব ঘাঁটি থেকে পরিচালনা করা হতো।

চূড়ান্ত যুদ্ধের সময়টাতে পুরো রণক্ষেত্রটাতে নিয়মিত বাহিনীর জন্যে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। বিভাজনরেখাটা ছিল পশ্চিমে চৌগাছার উত্তর পর্যন্ত এবং পূর্বে মধুমতী নদী পর্যন্ত। উত্তরে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪মাউন্টেন ডিভিশন এবং ৯ পদাতিক ডিভিশন ছিল দক্ষিণে। বেঙ্গল এরিয়ার সৈন্যরা সাতক্ষীরা ও আরো দক্ষিণের অপারেশনসমূহের দায়িত্বে ছিলেন।

দক্ষিণাঞ্চলের আক্রমণ শুরু হয় চৌগাছার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই যুদ্ধটি, যা আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল, ২০ শে নভেম্বর ১৯৭১ শুরু হয়ে ২৫ শে নভেম্বর শেষ হয় যখন গরীবপুরে পাকিস্তানিদের শেষ পাল্টা আক্রমণকে মোকাবেলা ও প্রতিহত করা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে চালিত এক দ্বিমুখী আক্রমণে চুয়াডাঙ্গারও পতন ঘটে ১৯৭১-য়ের ২৪শে নভেম্বর। এই যুদ্ধে পাকিস্তানিরা ১২ টি শ্যালো ট্যাঙ্ক হারায়। আমরা যখন চুয়াডাঙ্গায় প্রবেশ করলাম তখন এক করুণ দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম। কপোতাক্ষের উপর ব্রিজটা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, বাজারে আগুন জ্বলছে, স্থানীয় ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লুট করা হয়েছে এবং চার-পাঁচটা পরিত্যক্ত বাসের ইঞ্জিন খুলে নেয়া হয়েছে। বাজারের পশ্চিম দিকের একমাত্র দোতলা বাড়িটার উপরের তলাটি ট্যাঙ্ক ও কামানের গোলায় উড়ে গেছে। পুরো এলাকাটা যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষত বহন করছিল। মনে হচ্ছিল এটা যেন এক ভৌতিক শহর। কেবল দূরে দূরে কিছু তরুণ মুখ দেখা যাচ্ছিল যারা মিত্রবাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করছিল। হয়তো তারা ভাবছিল গত নয়মাসে তাদের গ্রামবাসীরা দখলদার বাহিনীর হাতে যে দু:স্বপ্নময় আচরণ পেয়েছে এরপরে এই তাদের জীবন নতুন কোন্ পথ খুলে দেয়।

আমরা চুয়াডাঙ্গা থেকে যশোরের পথে চার মাইল এগিয়ে সিংহজুলিতে এসে ৫ই

ডিসেম্বর পর্যন্ত রইলাম যতক্ষণ না বেনাপোল রোডের ঝিকরগাছার পতন ঘটল এবং যশোরের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালানো হলো। উত্তর দিকের বাহিনীটি ৫ তারিখ রাতে যশোর-ঝিনাইদহের রাস্তায়-পৌঁছল এবং এই আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের ৯ম ডিভিশন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। মাঝের বাহিনীটি আর্মাড গাড়িতে চেপে 'চিত্তের বিলে'র জলাভূমির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল এবং দক্ষিণের বাহিনীটি যশোর- বেনাপোল রোডের দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হলো। পাকিস্তানের ১০৭ ব্রিগেড যশোর পরিত্যাগ করল এবং অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে খুলনার দিকে পালিয়ে গেল। কোনো গুলি খরচ ছাড়াই ৭ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর হাতে যশোর শহরের পতন ঘটল। এটা ছিল এক বিরাট বিজয়। যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল ঘাঁটি, তা এখন আমাদের দখলে। জীবন নিয়ে পালাতে নিয়ে পাকিস্তানিরা প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ এবং বেশ কিছু অস্ত্রও ফেলে রেখে গিয়েছিল। কিছু কিছু ব্যারাকে সৈন্যদের জন্যে বিছানা সাজানো ছিল এবং সৈন্যদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্রও রাখা ছিল অক্ষতভাবে, যেসব সৈন্যরা আর কখনোই ফিরে আসেনি। ৯ম ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারের অপারেশন রুমের (দাউদ পাবলিক স্কুলে) ম্যাপগুলো পর্যন্ত যুদ্ধের পরিস্থিতির নানা চিহ্নসম্বলিত অবস্থায় দেয়ালে ঝুলানো ছিল। কিন্তু কিছু গুদাম পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। বিমানবন্দরটিকে খুঁড়ে রাখা হয়েছিল যাতে মিত্রশক্তির বিমানবাহিনী তার ব্যবহার করতে না পারে (সেটা অবশ্যই খুব দ্রুতই সারানো হয় এবং ওখান থেকে বিমান ওঠানামা শুরু করে)। ওরা কোনো যুদ্ধ ছাড়াই কেন যশোর ত্যাগ করল তা আমি বুঝতে পারিনি। কারণ গোটা ক্যান্টনমেন্টের চারধার জুড়েই তো ওদের বাঙ্কারসহ প্রতিরক্ষাব্যূহ ছিল।

যশোর শহরে উৎফুল্ল জনতা আমাদেরকে বরণ করে নিল যাদের অনেকেই সে সময় অস্ত্র বহন করছিল। আমরা যেখানেই গেছি সেখানেই আমাদেরকে স্বাগত জানানো হয়েছে। আমি আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলাম এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর সাংবাদিক যখন আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল আমি বললাম যে ৭ই ডিসেম্বরই হচ্ছে তখন পর্যন্ত আমার জীবনের সবচে আনন্দময় দিন।

ওই দিনটাতে আমার সবচে চিন্তার বিষয় ছিল যতটা দ্রুত সম্ভব কোনোরকমে একটা বেসামরিক প্রশাসন শুরু করানো। আমি তৎক্ষণাৎ সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর কে. এন. হুদাকে আদেশ করলাম যেন উনি সার্কিট হাউজে তার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন এবং বেসামরিক প্রশাসনকে সংগঠিত করেন। আমরা কেন্দ্রীয় জেলখানা থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ও একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে পেলাম (যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা না করার কারণে জেলে ছিলেন) এবং ওদেরকে বললাম শহরে এবং তার চারপাশের এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মেজর হুদাকে সাহায্য করতে। (এর কিছু পরেই সরকার জনাব ওয়ালিউল ইসলামকে ডেপুটি

কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করে)। লেফটেন্যান্ট আখতারকে কালিগঞ্জে এবং লেফটেন্যান্ট অলীককুমার গুপ্তকে ঝিনাইদহে পাঠানো হলো। অপারেশন ওমেগা-র দু'জন স্বেচ্ছাসেবক, একজন পুরুষ ও একজন ভদ্রমহিলা, যাদেরকে বাংলাদেশে প্রবেশের জন্যে পাকিস্তানিরা জেলে পুরেছিল তাদেরকে আমার আদেশে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হলো।

মিত্রবাহিনী খুলনার দিকে এগিয়ে এবং রূপদিয়া ও নোয়াপাড়ায় দুটো বাঁধাদানকারী প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে শিরোমণিতে (খুলনার উত্তরে) পাকিস্তানি ডিফেন্সের মুখোমুখি হলো। শিরোমণির যুদ্ধ ছিল একটা কঠিন যুদ্ধ যা চার-পাঁচদিন স্থায়ী হয়েছিল। পাকিস্তানের ১৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট যে অবস্থায়টায় ছিল তা ছিল খুবই সুবিধাজনক-পশ্চিমে জলাভূমি আর পূর্বে নদী। এই অবস্থানকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। এই যুদ্ধে শত্রুরা তাদের ট্রেঞ্চগুলিতেই রয়ে গিয়েছিল এবং ওখানেই মারা পড়ছিল। অবস্থানটা দখলে নেয়ার পর ওদের অফিসারদের সঙ্গে দেখা হলো। সবচে সিনিয়র অফিসারটি, একজন মেজর, আমার পূর্বপরিচিত ছিল। শিরোমণির পতন হলো ১৬ই ডিসেম্বর সকালে (আত্মসমর্পণের ঘোষণার চার ঘন্টা আগে)। ইতোমধ্যে, ১১ই ডিসেম্বর থেকে খুলনা শহর দক্ষিণ দিক থেকে মেজর জয়নাল আবেদীনের ৯ নম্বর সেক্টরের বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল। তারা দক্ষিণ দিক থেকে রূপসা নদী দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

সাতক্ষীরার পতন ঘটল ৭ই ডিসেম্বর অগ্রসরমান দুটো সৈন্যদলের দ্বারা, লেফটেন্যান্ট হুদার অধীনে কালীগঞ্জের ৯ নম্বর সেক্টরের বাহিনী এবং পশ্চিম দিক থেকে ক্যাপ্টেম মাহবুবের ৮ নম্বর সেক্টরের সেনাদের দ্বারা। ক্যাপ্টেন মাহবুবের বাহিনীর একটা অংশ কলারোয়ার গেল। লেফটেন্যান্ট হুদা আগেই কালিগঞ্জ দখল করে ফেলেছিলেন। ৭ই ডিসেম্বর বরিশাল ও পুটয়াখালীতে আড়ম্বরের সঙ্গে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলো। ভাটিয়াপাড়ার (ফরিদপুর) প্রতিরক্ষার একটা ছোট অবস্থান আমাদের বেশ ভোগাচ্ছিল। শেষমেষ তারা ১৭ই ডিসেম্বর মেজর কে.এন. হুদার কাছে আত্মসমর্পণ করে। লেফটেন্যান্ট এম. এইচ. সিদ্দিকী এই যুদ্ধে তার একটা চোখ হারান।

উত্তরে জীবননগরের পতন হয় ২৭শে নভেম্বর এবং দর্শনার ৪ঠা ডিসেম্বর (এই অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মেজর মুস্তাফিজুর রহমান পাকিস্তানি পজিশনের উপর হামলা করতে যেয়ে আহত হন)। একটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন ও একটি আর্মার্ড স্কোয়াড্রনের সাহসী এক হামালায় ঝিনাইদহ দখল করা হয় ৬ই ডিসেম্বর সকালে। ঝিনাইদহ দখল ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিজয়। এটা পাকিস্তানের ৫৭ ব্রিগেডের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে ওদেরকে একদম বিপর্যস্ত করে দেয় এবং কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের দিকে পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ওদের সামনে খোলা থাকে

না। ঝিনাইদহে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দুর্গের মতো প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে এবং এক মাসের বেশি চলার মতো যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ, জ্বালানী ও অন্যান্য সরবরাহ মজুদ করে রাখে। কিন্তু অবস্থানটা ধরে রাখার মতো যথেষ্ট শক্তি এদের ছিল না। এটা ছিল এক মারাত্মক ভুল। ঝিনাইদহের পতন ওদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলল। ঝিনাইদহ থেকে একটা বাহিনী কুষ্টিয়ার দিকে, আরেকটা মাগুরার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ৮ই ডিসেম্বর দুপুরে কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল টি. এন. রায়না এবং আমি অগ্রবর্তী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে মাগুরায় প্রবেশ করলাম। কয়েক মাইল দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল বিমান আক্রমণের শিকার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পেট্রল পাম্পের আগুনের ঘন ধোঁয়া। (এই বিমান আক্রমণটা ক্যাপ্টেন ওয়াহাব চেয়েছিলেন যিনি কাছেই ঘাঁটি গেড়েছিলেন)। চারিদিকে ছিল আনন্দমুখর জনতা। আমাকে ক্রমাগত থাকতে এবং রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে বক্তৃতা করতে হচ্ছিল। তাদেরকে আশ্বস্ত করছিলাম যে তাদের জীবন ও সম্পদ এখন নিরাপদ এবং তাদের এলাকায় শান্তি এসেছে যা চিরকাল রইবে। মাগুরা শহরে আমার বক্তৃতার সময় একজন বৃদ্ধ মানুষ দৌড়ে কাছে এলেন এবং জেনারেল রায়না ও আমাকে ছুয়ে আশীর্বাদ করলেন। তার দুচোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। তিনি ১৯৭১-য়ের মার্চ মাস থেকেই পালিয়ে পালিয়ে থেকেছেন এবং ওদিনেই প্রথম বাইরে এসে মুক্ত বাতাসে নি:শ্বাস নিলেন।

কুষ্টিয়ায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং তা ৯ই থেকে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। ভারতীয় অগ্রবর্তী বাহিনীর ট্যাঙ্কসমূহ শহরের কিছুটা দূরেই গোলাগুলির মুখোমুখি হয়। ১১ই ডিসেম্বর আমি কুষ্টিয়া গিয়ে দেখলাম যে যুদ্ধ ভেড়ামারার দিকে সরে গেছে। কিছুটা দূরে থেকে আমি হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানমূহ দেখলাম। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, ব্রিজটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম এবং আমার মনটা ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চলাচলকে বাধাগ্রস্থ করতে, আমার হৃদয়ের গভীরে এক দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর অক্টোবর মাসে আমরা ব্রিজটা উড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি জানতাম এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগটি ধ্বংস করলে স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশের পুন:নির্মাণ বাধাগ্রস্থ হবে। তবে যুদ্ধের সময় সামরিক বিবেচনা অনেক সময়ই একজনের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে ছাপিয়ে যায়। এই লক্ষ্যে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মিশন পাঠানো হয়েছিল। তবে যেহেতু ব্রিজটি খুব সুরক্ষিত ছিল ফলে তারা সবাই অসফল হয়ে ফিরে এসেছিল। যখনই কোনো মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসত আমি মনের ভেতরে সুখী হয়ে উঠতাম। আর এখন আমাকে দেখতে হলো যে শত্রুরা পশ্চাদপসরণের সময় ব্রিজটা ধ্বংস করে গেছে! এর ফলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে যে দূর্ভোগ নেমে আসবে তা ভেবে আমি বিচলিত হলাম।

কুষ্টিয়াতে ক্যাপ্টেন তৌফিক-এ-এলাহী, ফ্লাইং অফিসার কালাম ও লেফটেন্যান্ট

নুরুন্নবীর সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেন। খুব শীগগিরই ডেপুটি কমিশনারে হিসেবে জনাব শামসুল হক ওর সঙ্গে যোগ দিলেন (শামসুল হক ১৯৭১-য়ের মার্চ মাসে কুষ্টিয়ার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন যখন ২৭ বালুচের একটা কোম্পানি মুক্তিবাহিনীর হাতে নির্মূল হয়ে যায়)।

দুই কোম্পানি শক্তি নিয়ে মেজর আজম চৌধুরী ৬ই ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করলেন এবং পরের দিন চৌগাছায় পৌঁছে গেলেন। মেহেরপুরে পাকিস্তানি বাহিনী বিদ্যুৎ জেনারেটিং স্টেশনটা পুড়িয়ে দিয়েছিল। যেখানে ১৮ পাঞ্জাব দখলদারির দিনগুলোতে তাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছিল সেই ভোকেশনাল স্কুলের উল্টোদিকের গণকবরে আমি গলায় দড়ি বাঁধা কঙ্কাল দেখেছি।

ফরিদপুরের দিকে আমাদের অগ্রযাত্রা ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ব্যাহত হয় মধুমতীর পশ্চিম পারে কামারখালি ঘাটে পাকিস্তানী বাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষার কারণে। নদী এখানে ছিল ৩০০ ফুট দীর্ঘ এবং নদী পার হওয়ার সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে পাকিস্তানিরা প্রহরা বসিয়েছিল। তাদের সেসময় উন্মত্ত অবস্থায় তখন এ অঞ্চলে কোনো বেসামরিক লোককে দেখলেই তারা তাকে গুলি করত। ফলে ওদের প্রতিরক্ষা অবস্থাসমূহ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারা কঠিন হচ্ছিল। মুক্তিবাহিনীর যেসব স্বেচ্ছাসেবকেরা তথ্য সংগ্রহে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আমি দুজন তরুণকে জানি যারা তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ফিরে আসার পথে বন্দি হয়। একজনকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হয় এবং আরেকজন আংশিক গলা কাটা অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়। ও যখন মিত্রবাহিনীর পজিশনে ফিরল তখন ও কথা বলতে পারছিল না। একটা পেন্সিল ও কাগজ নিয়ে ও ওর সংগৃহিত তথ্যগুলি লিখে দেখাল। পরে ও মারা যায়-দেশমাতৃকার প্রতি উৎসর্গীকৃত আরো আরেকজন শহীদ। লেফটেন্যান্ট মুস্তাফার অধীনস্থ স্থানীয় মুক্তিবাহিনী এই অঞ্চল থেকে কিছু ছোট জেলে নৌকা সংগ্রহ করে এবং ১৪ই ডিসেম্বর রাতে দুই ব্যাটেলিয়ন শক্তি নিয়ে কিছুটা উপরে মধুমতী নদী অতিক্রম করাটা সম্ভব হয়। ১৫ তারিখের মধ্যে পাকিস্তানিদের কামারখালি প্রতিরক্ষার পতন ঘটে যায়। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করে। আমাদের ঢাকা পর্যন্ত আর মার্চ করতে হয়নি। সবকিছু শেষ হয়ে এসেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এবং দেশের সর্বত্র যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমরা স্বাধীন হলাম।

১৯৭১-য়ের ডিসেম্বরে এবং তারপরেও কয়েক মাস ধরে আমার চিন্তার প্রধান অংশ জুড়ে ছিল কী করে আর রক্তপাত বন্ধ করা যায়। বাংলাদেশে যথেষ্ঠই রক্ত ঝরেছে এবং আমরা আর রক্তপাত চাই না। আমি যেখানেই গেছি সেখানেই সবাইকে সংযত থাকার আবেদন করেছি এবং বলেছি যে রাজাকার এবং দালালদের ধরে বেসামরিক প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে হবে এবং তাদের হত্যা করা যাবে না। যেসব বেসামরিক কর্মচারী ও পুলিশ তাদের পাকিস্তানী প্রভুদের সেবা করেছিল তাদেরকে

ক্ষমা করা দেয়া হলো। আমাদের বিজয়ের পরে আমরা উদারহৃদয় হতে চেয়েছি। আমরা বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রচেষ্টাকে পূর্ণসমর্থন জানাই। পুলিশকে পুনর্গঠন করা হলো এবং আমরা তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গুলিগোলা সরবরাহ করি। চারিদিকে ছড়ানো যে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়া যাচ্ছিল তা সংগ্রহ করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। বেশ কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিক চেষ্টার পর আমরা প্রায় ৩০,০০০ অস্ত্র ও ৩৬ লক্ষ গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হই। গণবাহিনী ভেঙে দেওয়া হলো। তাদের কেউ কেউ তাদের লেখাপড়ায় বা পূর্বতন পেশায় স্বেচ্ছায় ফিরে গেল। কাউকে কাউকে সেনাবাহিনী ও পুলিশে নিয়ে নেয়া হলো। কিন্তু অধিকাংশই জানত না তারা কী করবে। আমার ভালো লাগত যদি ওদের জন্যে আরো কিছু করা যেত। সরকারের নীতি এ ব্যাপারে খুব পরিষ্কার ছিল না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে জাতি গঠনের কর্মসূচিতে এসব যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করার একটা সুবর্ণ সুযোগ আমরা হারিয়েছি।

আমাদের সৈনিকদের কাছে স্বাধীনতা মানে সংগ্রামের শেষ নয়, বরং আরো বেশি বেশি করে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ চালিয়ে চাওয়া। স্বাধীনতাটা কেবল শুরু মাত্র।

[নোট : লে. কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) এম এ মঞ্জুর, বীর উত্তম এ লেখাটি ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দি মনিং নিউজ পত্রিকায় ছাপা হয়। ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.)।

স্মৃতিময় কুকিতল ক্যাম্প
ডা. মৃগেন কুমার দাস চৌধুরী

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এক গৌরবোজ্জ্বল বীরগাথা মাইলফলক। জাতির কলঙ্কময় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার যে স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল দীর্ঘকাল পর বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা কালে কালে ইতিহাসের সোপান সৃজন করে সে কলঙ্ক উন্মোচন করে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর পুনরায় ছিনিয়ে আনে বহু লালায়িত বুকচেরা স্বাধীনতার লাল সূর্যটি, রচিত হয় বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়। শাসনের নামে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে ২০০ বছরের শোষণের যাতাকলে পিষ্ট উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর জীবনপণ গণআন্দোলনের মুখে সাতচল্লিশে ইংরেজরা শাসনভরা ছেড়ে পালালো, তবে প্রোথিত করে গেল ধর্মের নামে এ অশুভ বীজ। ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশে জন্ম নিল দুটো দেশ, ভারত ও পাকিস্তান। বাঙালির ভাগ্যে তা ছিল শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তন মাত্র। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব পাকস্তানীদের উপর প্রথম থেকেই প্রভূত্ব সুলভ আচরণ প্রতিষ্ঠিত করলো। বাংলা ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিক অবজ্ঞা করলে আমাদের জাতিসত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। স্বল্প সময়েই তথাকথিত মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মুখোশ উন্মোচিত হল। পাকিস্তানের জন্মের বছরের মাথায় ১৯৪৮ সালে উর্দুকে বাঙালির মাতৃভাষা হিসাবে চাপিয়ে জিন্না সাহেবের ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙালির প্রথম চেতনার উন্মেষ ঘটে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। পাকিস্তানি সামন্ত প্রভুদের শোষণ, বঞ্চনা ও অপশাসনের নিগ্রহ থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদে বিদ্রোহী হয়ে উঠে বাংলার আপামর জনগণ। সেই স্ফুলিঙ্গই দাবানলে পরিণত হয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

এ যুদ্ধ স্বত:স্ফূর্তভাবে শুরু হলেও শীঘ্রই তা জনযুদ্ধে পরিণত হয়। দেশের আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ দুর্বার গতি লাভ করে। সমস্ত যুদ্ধের অনেক অনেক বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী অসংখ্য শহীদ ও বিজয়ীদের বীরত্বগাথা ইতিহাস বিস্মৃতিতে তলিয়ে পড়ছে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তা সঠিকভাবে তুলে ধরা দেশপ্রেমিক প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। গেরিলা কৌশলে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সমগ্র ভূখণ্ডকে এগারোটি সেক্টরে ভাগকরা হয়। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় চার নম্বর সেক্টর, অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল চিত্ত রঞ্জন দত্ত (সি আর দত্ত)। প্রশাসনিক সুবিধা ও

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সিলেট সেক্টরকে দু'টি সাব সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। চার নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত অন্যতম সাবসেক্টর ছিল কুকীতল (KTL) তা ছিল বাংলাদেশের লাঠিটীলা সীমান্তের নিকটবর্তী। অন্যান্যগুলো ছিল, জালালপুর, বারপুঞ্জি, আমলসিদ, কৈলাশহর ও কমলপুর। লোহারবন নামক স্থানে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়া হত। মৌলভীবাজার মহকুমার (বর্তমান জেলা) কমলগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি আমাদের অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সারির অন্যতম সংগঠক ছিলেন আমার প্রয়াত পিতৃদের মন্মথ কুমার দাস চৌধুরী। উনারই প্রেরণায় আমরা সমস্ত ভাইরা স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা লাভ করি। ভারতের করিমগঞ্জ শহরে অবস্থানরত জকিগঞ্জের এমপি আ. লতিফ (বর্তমান প্রয়াত) ও সিলেটের এমপি দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেবের উৎসাহে সি আর দত্তের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হই। সাব সেক্টর কুকিতলে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দেই। জেসিও পদবীতে সেখানে তালিকাভূক্তি হই। সে ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে রচিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলি। স্মৃতির নিরিখে পরম পরিতৃপ্তির সাথে স্মরণ করছি সেখানকার কিছু দৈনন্দিন স্মৃতি।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি দিনগুলোতে চা-বাগানে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহত হন আর্টিলারি অফিসার ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন শরিফুল হক (ডালিম)। চিকিৎসার্থে অন্যত্র চলে যাওয়ার এর পরবর্তীতে তিনি আর ফিরে আসেন নি। পরবর্তীতে ফ্লাইট লে. নূরুল কাদের ক্যাম্প কমান্ডার পদে নিযুক্ত হন। উনাকে সহায়তা করতেন বয়োজ্যেষ্ঠ নায়েব সুবাদার মতিউর রহমান। সক্রিয়ভাবে কর্মতৎপর থাকতেন প্রবীণ প্রকৌশলী জনাব রব ও নবীণ প্রকৌশলী সালাদীন। এমআই রুমের চার্জে স্বাস্থ্য পরিচর্যায় আমার সহকারী ছিলেন ফার্মাসিষ্ট মকবুল আহমদ (নোয়াখালী) ও পরবর্তীতে যোগ দেন বিয়ানীবাজারের খলিলুর রহমান। অপারেশন টিমের সাথে আমাকে প্রায়ই ক্যাম্পের বাইরে থাকতে হত। উনারা এম আই রুমের কাজ সুচারুরূপে চালাতেন আমার অবর্তমানে। অনেকের নাম ঠিকানা আজ স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে পড়েছে। ভারতীয় ও আমাদের জাতীয় পর্যায়ে অনেক নেতা ও সংগঠক ক্যাম্পে এসেছেন একাধিকবার। তাদের মধ্যে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী, সেক্টর কমান্ডার সি.আর. দত্ত., জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান প্রবাসী সরকারের স্বাস্থ্য মহাপরিচালক জনাব টি হোসেন, বঙ্গবন্ধু সহোদর শেখ নাসের প্রমুখ। এ সুযোগে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় ভিতর দিয়ে বিভিন্ন রণকৌশল ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হতো। বাধ্যতামূলকভাবে ভোরে অবশ্যই সবাইকে পিটিতে যে আসতে হতো। জাতীয় পতাকা উড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হত। শ্রদ্ধাভরে সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে। এ সময়ে কারো কারো চোখ ছলছল করতে দেখেছি। ঘরবাড়ি, আত্মীয় স্বজনের, দেশের ভবিষ্যত চিন্তায় মাঝে মাঝে মনে কাতরতা আসতো। সকালের নাশতা ও দিনে দু'বার খাবার

পরিবেশিত হতো লঙ্গরে। খাবার প্লেটে বা বাঁশির শব্দে দৌড়াতো সবাই সারিবদ্ধভাবে থালা হাতে নিয়ে। ভদ্রবাবু ও শাহাবুদ্দীন উনারা ছিলেন এ দায়িত্বে। লঙ্গরের পাশে ভাতের ফেনের গন্ধ আজও নাকে লাগে। মাঝেমাঝে একটু ভালো খাবারের ব্যবস্থাও হতো সেখানে ক্যাম্পের জনসংখ্যা উঠানামা করত। হাইড আউট ক্যাম্প ও বিশেষ বিশেষ অপারেশনে কখনও কখনও বড় সংখ্যক সদস্যরা বাইরে থাকতেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে আমাদের ক্যাম্পে রিক্রুটেড যোদ্ধার স্বল্পতা বিশেষ বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমদিকে সিলেটের বিভিন্ন রণাঙ্গণে গেরিলাযুদ্ধে অংশ নিতে অস্থানীয় অসিলেটী সদস্যরা খুবই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতো। যুদ্ধের বিশেষ কৌশল হিসাবে গেরিলাযুদ্ধে স্থানীয় জনগণের সাথে স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল অপরিহার্য্য। স্থানীয় ভাষাগত বৈষম্য ও বিভিন্ন এলাকায় রাজাকার, আলবদর ও আলসামস ইত্যাদির প্রাধান্যে এরা হিমসিম খান। এদিকে ক্যাম্পে নিয়মানুবর্তিতা ও কাজের চাপ ছিল প্রচুর। এক সময় ক্যাম্পের রক্ষীদের চোখে ধুলা দিয়ে রাতের অন্ধকারে দলে দলে পালানো শুরু হলো। রাস্তায় ওৎ পেতে, রেল স্টেশনে, ট্রেনে, রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি তল্লাসী করে ফিরিয়ে আনা হলো। অবশ্য পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে জনগণের আস্থা প্রগাঢ় হলেও দক্ষ গাইডের সহযোগিতায় এ দৈন্য কেটে গিয়েছিল। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছড়াগুলোর স্বচ্ছ পানিতে আমাদের রান্না-বান্না গোছল, কাপড় ধোয়াসহ দৈনন্দিন কাজ চলতো। খাবার জন্য আমরা কিছু কিছু সংরক্ষিত গর্তে সঞ্চিত পানিতে পানি-শোধন করে বা পাউডার দিয়ে পান উপযোগী করে রাখতাম। সকালের নাশতায় থাকতো তেলে ভাজা দুটো বড় লুচি ও একমগ চা। দুবেলা খাবারে শাক সবজি, ছাগল, ভেড়ার মাংস, মাছ, ডিম, ডাল ইত্যাদি থাকতো যথেষ্ট পরিমাণে। চতুর্দিকের সুউচ্চ টিলা ক্যাম্পের বেষ্টনী প্রাচীর হিসাবে নিরাপত্তা বিধান করতো উঁচু স্থানে বা পাহাড়ের উপরে তাবু টানানো নিষিদ্ধ ছিল। রাতে মিটমিট আলো তাবুর ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রতি রাতের নিরাপত্তা চেক ও পাসওয়ার্ড নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হতো। উচ্ছিষ্ট খাবারের সন্ধানে আসা কুকুরের সংখ্যা বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে গুলি করে মেরে ফেলা হতো। ক্যাম্প কমান্ডার বাইরে যাবার সুযোগে সবাই এ সময়টুকুতে আনন্দফূর্তি করে নিতো। ক্যাম্পে জোরে কথাবার্তা বলা শব্দ করা সম্পূর্ণ মানা ছিল। নিয়ম ভঙ্গের জন্য কড়া শাস্তির বিধান ছিল।

রাতে প্রোগ্রাম মতো অপারেশন সমাপ্ত করে ভোরে দলনেতার নেতৃত্বে ক্যাম্প-ফেরত দলগুলো রিপোর্ট করতে হতো। কখনও সাথে আলামত আনতে হতো। কখন সাথে থাকতো চোখ বাঁধা যুদ্ধাপরাধী। নির্দিষ্ট শিবিরে আবদ্ধ রেখে তথ্য সংগ্রহের জন্য সোপর্দ করা হতো গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে। কঠোর শাস্তির বিধান ছিল ওদের জন্য। তবে বিনা কারণে যাতে কেউ নাজেহাল না হয় সেজন্য কড়া নির্দেশ ছিল কর্তৃপক্ষের। এ সম্পর্কিত সংরক্ষিত একটা সতর্কীকরণ পত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো।

পাকসেনা দ্বারা নির্যাতিত বেসামরিক লোক এমনকি পাকসেনাদের দোসরদের প্রতিও আচরণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্দ্ধারিত ছিল। কোনোভাবেই যাতে আমাদের কর্মপ্রবণতা মুক্তিযুদ্ধের মহান উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ন না করে এ ব্যাপারে তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল কর্তৃপক্ষের। জনগণের প্রগাঢ় আস্থাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের শক্তিশালী হাতিয়ার।

SECRET

Copy of HQ BDF ltr. No. 0016 G Dated 30 Oct. 71.

1. It has been brought to the notice of this HQ that civilians coming out from Bangladesh in view of inhuman torturing by Pak Army

2. In future if any such action is brought to the notice of this HQ the Offier/JCO responsible for such illegal action should be dealt with severely.

3. Another source report indicates that Muslim leaguers and Jamat-e-Islam pers arrested by Mukti Bahini.....

It is apprehended that our war efforts may be jeopardized and we may loose the confidence of the people of Bangladesh.

4. The following guidelines enumerated bellow should be adhered to strictly:-

a. Civs coming out from Bangladesh.

Only the suspected cases should be interrogated and handed over to supporting forces HQ for further interrogation and screening.

b. Muslim Leaguers/ Jamat-e-Islam etc. may be dealt with as per existing instructions. Nobody should be harassed unnecessarily.

5. The above instructions should be followed strictly with immediate effect.

To All subscctors

....copy

HQ Sector BDF
C/0 99 AAD
No 10071G
08 Nov. 71
Sd/
Sec. comd.

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পুর্যন্ত 'হিট এন্ড রান' কৌশল অব্যাহত ছিল। এরপর দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যবস্তু ইত্যাদিতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে বা বিস্ফোরণ দিয়ে উড়িয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করা হতো। ২৯ অক্টোবর কুকিতল ক্যাম্পে যোগ দিলেন আর্টিলারির ক্যাপ্টেন এ. এম. রাশেদ চৌধুরী সে. লে. সাজ্জাদ। পরবর্তীতে এলেন ব্যাটারি কমান্ডার পদে মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ, আরটিলারি ইন্সট্রাক্টর, গান ও বাহিনী সদস্য। যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তনের সাথে ক্যাম্পের অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লে সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে ২য় ফিল্ড আর্টিলারি বাহিনীর সাথে একত্রীভূত হলাম আমি। ১৯ নভেম্বর শুক্রবার বেলা দু'টায় পাথারিয়া পাহাড়ের গান পয়েন্ট থেকে 'আল্লাহু আকবর', 'জয় বাংলা', ধ্বনিতে আমাদের প্রথম গোলা নিক্ষিপ্ত হলো শত্রুদের উপর। পরবর্তীতে ৪ ডিসেম্বর গান নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ। ক্রমে এ অগ্রযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটলো সিলেট শহর শত্রুমুক্ত করার যুদ্ধে মোগলাবাজার রেলস্টেশন থেকে সর্বশেষে গোলা নিক্ষেপণের মাধ্যমে সেই ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বর। পুনর্বার ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করে ২৪ ডিসেম্বর সব গুছিয়ে বিদায় নিলাম স্বাধীনতা যুদ্ধের এক পূণ্য স্মৃতিময় কুকিতল ক্যাম্প থেকে। বিজয়ের আনন্দের মাঝেও বিদায়ের এ বিষাদ অন্তরকে ক্ষণিকের জন্য শোকাতুর করে তুললো। সারা ক্যাম্প জুড়ে বিশাল শূন্যতা। বিদায় জানালো কুকিতল টিলা আকাশ আর ভারী বাতাস। স্মৃতির মন্দিরে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে পূণ্যময় কুকিতল।

সবার উর্দ্ধে আজ আমরা স্বাধীন, নিজের পরিচয়ে পরিচিত।

নাগেশ্বরী থানার এক যুদ্ধ
ক্যাপ্টেন (মুজাহিদ) আজিজুল হক, বীর প্রতীক

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ৬নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কামান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেস উদ্দিনের অধীনে যুদ্ধে যোগদান করি। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ আমার পিতা মরহুম ছখি উদ্দিন আহমেদ বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু বরণ করেন। আমি আমার পিতার প্রথম পুত্র হয়ে ও তার নামাজে জানাজায় উপস্থিত থাকতে পারিনি। সেসময় আমি ভুরুঙ্গামারী-বাঘভাণ্ডার ডিফেন্স লাইনে ছিলাম। ১১ সেপ্টেম্বর দুপুরে আমি ডিউটি চেক করে ২-০০ টার সময় ক্যাম্পে ফিরে সংবাদ পাই-কমান্ডার সাহেব আমাকে সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারে (সাহেবগঞ্জ) ডেকে পাঠিয়েছেন। দুপুরের খাবার শেষে সুবেদার বোরহান আমাকে বার বার হেডকোয়ার্টারে যাবার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। আমি হেড কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিয়ে বিকেল ৫-৩০ ঘটিকায় হেড কোয়ার্টারে পৌছি। গেটে প্রবেশকালে স্যান্ট্রি জানাল,-"স্যার আপনার Father মারা গেছেন, আপনার ভাই একরামুল টেলিফোন করেছিল।" কমান্ডারের নির্দেশে আমি ভারতীয় ট্রাকে চড়ে কুচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। রাত ১০-০০ টায় আলিপুর দুয়ারে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি। আমার আত্মীয় স্বজন রাতে আমাকে যেতে না দেয়ায় সকালে আমার পরিবারের আশ্রয়স্থল ঢালকর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে সকাল ১০-০০টায় পৌছাই। সেখানে পৌছে শুনি রাত ১১-০০টায় আমার পিতার জানাজা হয়ে গেছে। আমার পরিবারের সঙ্গে ২/৩ দিন অবস্থান করে কুলখানি শেষে সাবসেক্টর হেড কোয়ার্টারে ফেরত আসি।

আমার পিতার মৃত্যুর দুইমাস পর নভেম্বরের ১২ তারিখ সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেস সাহেব আমাকে ডিফেন্স লাইন থেকে রাত ১১-০০ টায় ডেকে পাঠিয়ে আমার কুশালাদি জানলেন এবং আমাকে একটি বিশেষ অপারেশনের দায়িত্ব দিলেন।

কুড়িগ্রাম-ভুরুঙ্গামারী রোডের বর্তমান নাগেশ্বরী উপজেলার সন্তোষপুর নামক স্থানে সড়ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য অপারেশন ম্যাপ দেখানো হলো। সন্তোষপুরে মুক্তিযোদ্ধারা ২টি সেকশন অবস্থান করতেছিল। এক সেকশন কমান্ডারের নাম নূরুল হক সরকার এবং অপর সেকশনের দায়িত্বে ছিলেন মঞ্জরুল ইসলাম। প্রয়োজনীয় আর্মস্-এমুনেশন নিয়ে সেকশন ২টির সঙ্গে যোগাযোগ করে নাগেশ্বরী- ভুরুঙ্গামারী সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়া হলো, যাতে করে পাক সেনা নাগেশ্বরী

হতে ভুরুঙ্গামারী ও ভুরুঙ্গামারী হতে নাগেশ্বরী যেতে না পারে। নভেম্বরের ১৩ তারিখ বিকাল ৩-০০ টায় আমাকে তৎকালীন মেজর ডা. এম.এম. হোসেনের শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা বাবু মোটর সাইকেলযোগে সন্তোষপুরে পৌছে দেয়। সেদিন অপারেশন স্থল রেকি করার পর সন্ধ্যায় একটি ছোট খাটো অপারেশন করা হয়। এই অপারেশন করতে গিয়ে ২" মর্টার চালক আহত হয়। সেখানে মর্টার চালানোর মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কেউ না থাকায় আমি আহত মর্টার চালকের নিকট থেকে মর্টার পরিচালনা করার কারিগরি কৌশল শিখে নেই। আহত মর্টার চালককে হাসপাতালে পাঠানোর পর আমি মর্টার পরিচালনার দায়িত্ব নেই এবং সেটি আমার সঙ্গেই রাখি।

১৪ তারিখ দিনের বেলা যেখানে সড়ক বিচ্ছিন্ন করা হবে জায়গাটি রেকি করার পর রাত আনুমানিক ৯-০০ ঘটিকা হতে অপারেশনের কাজ শুরু করি। প্রথমে ১টি বড় আম গাছে মাইন দিয়ে চার্জ করে গাছটিকে রাস্তার উপর ফেলা হয় এবং রাত ১২-০০টার দিকে হাই এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ৫ থেকে ৭ ফুট রাস্তা কেটে ফেলা হয়।

পরের দিন ১৫ তারিখ সকাল থেকে আমরা অবজারভেশনে ছিলাম। বিকাল ৩-০০ টার দিকে ভুরুঙ্গামারীর উদ্দেশ্যে পাক আর্মির একটি ট্রাক অপারেশনস্থলের রাস্তায় Obstacle দেখে থেমে যায় এবং রাস্তাটি পূণ: চালু করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। আমরা তখন ২" মর্টার, LMG, SLR, Riffle দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালাই। একটানা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। সন্ধ্যায় তারা নাগেশ্বরীর দিকে ফিরে যায় এবং আমরা আমাদের ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসি। রাত আনুমানিক ৮-০০ টায় স্থানীয় এক ব্যক্তি ক্যাম্পে এসে জানায়-" আপনাদের ফায়ারিং-এ ১ জন পাক আর্মি মারা গেছে, আমাদের বাড়ির পার্শ্বে রক্তাক্ত অবস্থায় তার লাশ পড়ে আছে।" তিনি আমাদেরকে ঘটনাস্থলে যাবার অনুরোধ করেন। আমরা তাকে পাক বাহিনীর চর হিসেবে সন্দেহ করে তার সঙ্গে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা তাকে বলে দেই-আপনি যান আমরা পরে আসতেছি।

১৬ তারিখ সকাল আনুমানিক ৭-৩০ টায় আমি গোলাবারুদ লোড না করে ২" মর্টার নিয়ে ১জন সৈনিক সহ ঘটনাস্থলের দিকে যাই এবং একজনকে LMG, একজনকে SLR, দুইজনকে Riffle ও একজনকে ২" মর্টারের গোলা নিয়ে আমাদের পিছনে আসতে বলি। ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে আমরা কেটে দেয়া রাস্তায় উঠি। গোলা বারুদ ও অস্ত্র বহনকারী ৫ জন আমাদের বেশ কিছু দূর পিছনে ছিল। আমরা স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় অপারেশনকৃত রাস্তাটি অনেক গভীর করে গর্ত করার প্রস্তুতি নেই। এমন সময় আমার এক সহযোদ্ধা দেখতে পান ২জন পাক সেনা রায়গঞ্জ হতে ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আমাদের দিকে মেইন সড়ক অভিমুখে আসছে। সে আমাকে ডেকে দেখায় 'স্যার, ২জন খান সেনা আমাদের দিকে আসছে'। আমি তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই ২জন খাকি পোশাকধারী পাক সেনা পাকা ধানের রংয়ের সঙ্গে মিশে আমাদের দিকে আসছে। আমার সহযোদ্ধা পাক সেনা দুইজনকে দেখে বিচলিত হয়।

কারণ আমাদের কাছে তখন শুধু গোলাবারুদ বিহীন অস্ত্র ছিল। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম -তুমি ঘাবড়াবে না, চুপচাপ দেখ আমি কী করছি। এই বলে আমি আমার ২” মর্টারটি হ্যান্ড গার্ড পজিশনে নিলাম এবং উচ্চ স্বরে বলতে লাগলাম ‘কোন হায় আগে বার্নেকা কোশিশ মত করো’ অর্থাৎ “কে আছ আগে আসার চেষ্টা করো না।’ এক কদম হিলেগা তো গুলি কর দেগা অর্থাৎ এক পা আগালে গুলি করে দিব। এই কথাগুলি দুই তিন বার রিপিট করি। আমি উর্দু ভাষা ভালোভাবে ও কিছু কিছু পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারতাম। আমার কথাগুলি খান সেনারা হয়তো বুঝতে পেরেছে। তারা এক পা দু'পা করে আমাদের দিকে আসতে থাকে। আমি আবারও উচ্চ স্বরে বললাম” হিলো মত আগার হিলেগা তো গুলি কর দেগা” অর্থাৎ নড়বে না, নড়লেই গুলি করব। কিন্তু, এদিকে আমার কাছে ২” মর্টারের ব্যারেল ছাড়া আর কিছুই নেই। আমার মনের সাহস ছিল প্রবল। আমি নিজে বিচলিত হই নাই। পাক পিরিয়ডে আমার এক ওস্তাদ আমাদের ট্রেনিং দেয় ‘দোশমন কো কভি পিঠ মত দেখাও, মরনা হায়তো ছিনাছে মরো অর্থাৎ শত্রুকে দেখে কখনো পালাবার চেষ্টা করবে না, মরলে বীরের মতো মর। আমার সে মুহূর্তে ওস্তাদের কথাটি মনে পড়ল। আমি এও ভাবলাম আমার পিতা ভারতে মারা গেল, যদি আমি মারা যাই- আমার লাশ হয়তো বাংলাদেশে ফিরবে না। আমি তখন মনস্থির করলাম-যদি মরি বীরের মতো মরব, পালাবার চেষ্টা করব না। কারণ, আমি পালালে আমার সহযোদ্ধারা সহ আমাদের পিছনে মাটি খননের কাজে নিয়োজিত নিরস্ত্র সাধারণ জনগণ নিশ্চিত মারা যাবে। আমার শেষোক্ত নির্দেশের পর দেখলাম ১ জন খান সেনা অস্ত্র নিচে রাখল, অপরজন অস্ত্র রাখছে না। আমি আবারও বললাম, ‘দোনো গ্রাউন্ড আর্ম কর, মেরা পাছ আজাও” অর্থাৎ দুইজনেই মাটিতে অস্ত্র রেখে আমার কাছে আস। দু'জনেই অস্ত্র নিচে রাখল। আমি পুনরায় বললাম-“হাত উপর করকে অ্যাডভান্স কর” অর্থাৎ হাত উপর করে অগ্রসর হও। দু'জনে হাত উপর করে আমার কাছে আসল। একজন আমার হাত ধরে বলল-“আপ লোক কোন হায়” অর্থাৎ আপনারা কারা। আমি উত্তরে কৌশলে বললাম ‘হাম রাজাকার হায়” অর্থাৎ আমরা রাজাকার। সে আবার বলল- “আপ লোক ইধার কিয়া কর রহে’ অর্থাৎ আপনারা এখানে কী করতেছেন। উত্তরে বললাম-‘দেখো সালা মুক্তি লোকনে রাস্তা খারাপ কর দিয়া, নাগেশ্বরী মে লেফটেন্যান্ট ছাহেব নে হাম লোককে রাস্তা ঠিক করনেকা অর্ডার দিয়া, ইছি রাস্তাছে কানভাই আনে ওয়ালা হায়, ভুরুঙ্গামারী মে এ্যাটাক করনা হায়” অর্থাৎ শালা মুক্তিরা রাস্তা খারাপ করে দিয়েছে, নাগেশ্বরী হতে লে. সাহেব আমাদেরকে রাস্তা ঠিক করতে অর্ডার দিয়েছে। এ রাস্তা দিয়ে ভুরুঙ্গামারী আক্রমণ করার জন্য কনভয়-আসবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক বাহিনীতে নতুন অফিসার লেফটেন্যান্ট হতে ক্যাপ্টেন পর্য্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধে পাঠাত। এই ধারনা করে আমি লেফটেন্যান্ট এর কথা বলি। তাদের একজন আমাকে একজন লেফটেন্যান্ট-এর নাম বলে বলল ‘ওহি; লে. ছাব হায় না-নাগেশ্বরী

মে? খান সেনারা যার নাম বলল-আমি তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললাম 'হাঁ ওহি লে. ছাহাব নাগেশ্বরী মে হায়'। খান সেনারা আমাদের বলল 'হাম লোককো লে. ছাহাব কা পাছ পৌছাইয়ে' অর্থাৎ আমাদের কে ঐ লে. এর নিকট নিয়ে যান। তারা কতজন আছে জিজ্ঞাসা করলাম 'আপ লোক কেতনা আদমী হায়'। উত্তরে তারা বলল 'হাম লোক দো আদমী হায়, রাতকো জো ফায়ার হোয়া সব আদমী ভাগ গিয়া হাম লোক নয়া আদমী, রাস্তা নেহি জানতে ভাগনে নেহী ছেকা" অর্থাৎ রাত্রে যে গোলাগুলি হয়, তখন সবাই পালায়, আমরা নতুন রাস্তা জানা ছিল না বলে পালাতে পারিনি। তখন আমি তাদের কোমরে হাত দিয়ে দেখলাম তাদের নিকট কোনো গ্রেনেড আছে কী না। কারণ যুদ্ধের সময় প্রত্যেক সৈনিককে আত্মরক্ষার জন্য দুটি করে গ্রেনেড ইস্যু করা হয়। গ্রেনেড না থাকায় তাদের কোমরে বাধা চাইনিজ পোচ এমুনেশনের বান্ডুলিয়ার খুলে নিলাম। দেখলাম তাতে চাইনিজ রাউন্ড ভর্তি করা ছিল। আমার সঙ্গী এক মুক্তিযোদ্ধাকে ইশারা করলাম-পিছনে ফেলে আসা খান সেনাদের অস্ত্র দুটি নিয়ে আসতে। সে অস্ত্র নিয়ে এস বলল-অস্ত্র এনছি স্যার। যে মুক্তিযোদ্ধাটি অস্ত্র আনল তার কাছে ছিল S.L.R । খান সেনা ২টি S.L.R দেখে বলল "ইয়ে হাতিয়ার তো মুক্তি কা হায়" অর্থাৎ এই অস্ত্র তো মুক্তিযোদ্ধাদের। খান সেনাদের ভয় পাওয়ার কারণ হলো-যুদ্ধের সময় S.L.R থাকত শুধু ভারতীয় সৈনিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট, পাক সেনাদের কোনো S.L.R ছিল না। আমি খান সেনাদের আশ্বস্থ করে পাঞ্জাবী ভাষায় বললাম-"আলাকা তোম লোক ঘাবড়া গিয়া? ইছে হাতিয়ার হামলোক মুক্তিছে কজা কিয়া" খান সেনা দু'জন আমর কথায় আশ্বস্ত হলো। তারা মনে করর আমরা তাদের লোক। তাই তারা আমাদের বলল-"হাম লোক দোদিন ছে কোছ খায়া নেহি, আপলোক কা কেম্প মে লে জাইয়ে কুছ খানেকা দিজিয়ে" অর্থাৎ আমরা দুই দিন থেকে কিছু খাইনি, আপনাদের ক্যাম্পে নিয়ে আমাদের জন্য কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমার সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধাটি পাকিস্তান আর্মিতে ছিল, সে ছুটিতে আসার পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সেও উর্দু বলতে পারত। সে বলল -"খোদাকি কছম হাম লোক আপলোককো হামারা কেম্প মে লে জাইংগে ঘাবড়াও নেহি"। ইতোমধ্যেই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এসে গেছে। একজনকে রশি আনার জন্য বললাম। রাস্তার পাশেই একটি ছাগল বাধা ছিল। ছাগলটি ছেড়ে দিয়ে রশি আনল। রশি দিয়ে যেই খান সেনাদের হাত বাধতে যাচ্ছি, তারা বলল-"আপ লোক কেয়া কর রহে" অর্থাৎ আপনারা কি করছেন। তখন খান সেনাদের বললাম -"সালে লোক জানতে হো হাম লোক কৌন হায়? হাম লোক রাজাকার নেহি হায়, হাম লোক মুক্তি হায়। জয় বাংলা বোলো" অর্থাৎ আমরা রাজাকার নই, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। তাদেরকে জয় বাংলা বলতে বলায় তারা বল।'-" জয় বাংলা কেয়া হায়" অর্থাৎ জয় বাংলা কী? অমনি দু'জনের গালে সজোরে চড় মারলাম। এরপর আর কাউকে মারতে দেই নাই। জানি, এরা দু'জনতো একরকমই মরেই গেছে, তাদেরকে আর মেরে কী হবে। এই ভেবে

তাদের চোখ হাত বেধে নিয়ে আসতেছি। তখন সকাল সাড়ে নয়টা বা দশটা হতে পারে। খান সেনা ধরার খবর পেয়ে চৌধুরীরহাট হাই স্কুলের ছাত্ররা প্রত্যেকের হাতে লাঠি নিয়ে খান সেনাদের মারার জন্য দল বেধে আসতেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে আমরা রাস্তা বেরিকেড দিলাম যাতে ছাত্ররা কিছু করতে না পারে। খান সেনাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য চৌধুরীর হাট B.S.F ক্যাম্পে তাদের রেখে আমি সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টারে আসি। উইং কমান্ডার বাশার সাহেব ও সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেস সাহেবকে বিস্তারিত ঘটনা জানাই এবং খান সেনা দু'জনকে আনার জন্য একটি গাড়ি চাই। তারা দুইজনেই আমাকে এই কাজের জন্য প্রশংসা করলেন। পাশাপাশি আমাকে সাবধান করে দিলেন এরকম সাহস যেন আর না দেখাই। পরে আমাকে একটি জিপ গাড়ি দিল। আমি খান সেনা দু'জনকে B.S.F ক্যাম্প থেকে নিয়ে হেড কোয়ার্টারে পৌছিয়ে দেই। এরপর তাদেরকে (POW (Prisioner of War) বা যুদ্ধবন্দি হিসাবে জেলে পাঠায়। আমি সেদিন দেখেছি মৃত্যুর আগে মানুষের অবস্থা কেমন হয়। আটককৃত খান সেনারা জানত তাদের নিশ্চিত মৃত্যু। তাদের দু'চোখে অঝরে পানি পড়ছে আর যত রকম কলেমা আছে তারা পাঠ করছে।

জীবিত দুই খান সেনা ধরা পড়ার সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সাংবাদিক ক্যামেরাম্যান আসে। ফটো তোলে, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ভারতের কয়েকটি পত্রিকায় ছবি সহ সংবাদ ছাপান হয়। পরে যুদ্ধের মোড় এগুতে থাকে, এ সমস্ত সংবাদ রাখার আর চেষ্টা করি নাই।

এই ঘটনার চারদিন পর অর্থাৎ ২০/১১/২০০২ইং ছিল আমাদের ঈদ-উল-ফিতরের দিন। ঐদিন আর এক হৃদয় বিদারক ঘটনা আছে। ঈদের দিন সকালে লে. সামাদ শহীদ হন।

যে দুইজন খান সেনাকে সশস্ত্র অবস্থায় আটক করা হয়েছিল। তাদের একজনের নাম-সিপাহী আতা মোহাম্মদ, ৪৮ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট এবং অপরজন সিপাহী আসলাম খান নেওয়াজী, ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। দুই জনের নিকট হতে ২টি ৭.৬২ চাইনিজ রাইফেল ও ২০০ + ২০০ = ৪০০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত চাইনিজ রাইফেল দুইটির মধ্যে একটির নম্বর ছিল 05492 । ১৫ তারিখে পাক সেনাদের সঙ্গে গোলাগুলির সময় তাদের ফেলে আসা MMG-এর গুলি ১১১০ রাউন্ড, ৭.৬২ চাইনিজ রাইফেলের গুলি ১৯৪০ রাউন্ড ঐ স্থান হতে উদ্ধার করা হয়।

মধু মিয়ার যুদ্ধগাথা

নিজামউদ্দিন লস্কর

বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব রণাঙ্গনের ৫ নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত বালাট সাব-সেক্টরের মহান মুক্তিযুদ্ধের এক মহানায়কের নাম মধু মিয়া। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক বিরাট উপকরণ মধু মিয়া। ইতিহাস তৈরি হয়, লেখা হয় না। মধু মিয়া একদিকে ইতিহাস তৈরি করেছেন এবং অপরদিকে নিজেই তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আর কেউ সেটা করেছেন কী না আমার জানা নেই। তবে আমাদের ইতিহাসের পাতায় মধু মিয়ার স্থান মহানায়ক হিসেবে তো দূরের কথা, নায়কের পার্শ্বচরিত্র হিসেবেও নেই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দিন থেকে আমরা আমাদের সন্তান সন্ততিকে কাল্পনিক যুদ্ধ করা শুনিয়ে আসছি, রেডিও টেলিভিশনে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কাল্পনিক নাটক দেখিয়ে আসছি, একেকবার একেক রকমের ইতিহাস তৈরি করে তুলে দিচ্ছি তাদের হাতে, আবার যখন আজকের প্রজন্মের কেউ প্রশ্ন-করে 'স্বাধীনতা যুদ্ধে সত্যিই কি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা লড়েছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে, নাকি ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল?' তখন আবার ক্ষেপে উঠছি। তবুও মধুর মিয়াদের যুদ্ধগাথা, যুদ্ধকথা তুলে ধরছি না তাদের সমান।

কে এই মধু মিয়া? গণযোদ্ধা মধু মিয়া। একাত্তরের ডাক যাকে ঘর থেকে টেনে বের করেছিল, তার স্ত্রীর মুখের ভাষায় যুদ্ধে যাবার সময় স্বামী তাকে বলেছিলেন- 'দেশের উপর এত বড় বিপদ, যাওন তো লাগবো, চিন্তা কইরো না, আল্লায় তুমরার হেফাজত করব।' স্ত্রী-পুত্র-দোকানপাট সবকিছু স্রষ্টার হেফাজতে রেখে ঘর-সংসার ছেড়ে দেশের হেফাজত করার উপদেশ বেরিয়ে যাবার মতো বুকের পাটা ছিল যার আমি সেই মধু মিয়ার কথা লিখছি।

জন্ম ইতিহাস ঘটলে দেখা যায় ১৩৪৪ বাংলায় অর্থাৎ ১৯৩৭ ইংরেজীতে ভারতের নওগাঁ জেলার গিলানী গ্রামে আবুল কালাম ওরফে মধুমিয়ার জন্ম হয়। পিতা-মৃত আব্দুল বারীক, মাতা-মৃত সাকেরা বেগম। মধু মিয়ার বয়স যখন ১০ বছর তখন তাদের ৩ ছেলে আর ২ মেয়েকে নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং বালাটের সীমান্তবর্তী এলাকাস্থ বাংলাদেশের ডলুরা গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। মধু মিয়া পরবর্তী সময়ে আনসার বাহিনীতে যোগ দেন, উত্তর ডলুরা নিবাসী মৃত সাহেদ আলীর বড় মেয়ে হেলিনাকে বিয়ে করে সুনামগঞ্জ শহরে বসবাস শুরু করেন। পাঠশালা পাশ মধুমিয়া সুনামগঞ্জ শহরে মাইকের ব্যাটারি চার্জের ও মাইক ভাড়া দেওয়ার একটি দোকান খুলেন। এটাই ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে এবং পরে

তার রুটি-রুজির একমাত্র মাধ্যম। মধুমিয়া যখন ঘর সংসার-ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ঠিক তখন ডাক এল স্বাধীনতা সংগ্রামের। বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ালেন আনসার কামান্ডার মধু মিয়া।

জুন মাসের পহেলা সপ্তাহে মেঘালয়ের ট্রেনিং সেন্টার, সাঙ্কেতিক নাম ইকো-১ এর ১নং ব্যাচের ট্রেনিং শেষ হবার পর পাঠানো হলো আমাদের একটি দলকে বালাট সাব-সেক্টর। আমি, এনামুল হক চৌধুরী বীর প্রতীক, সিরাজ উদ্দিন আহমদ বীর প্রতীক, আকিল চৌধুরী, কাশেম এই কজন আমরা সিলেটের এবং বাকি সবাই সুনামগঞ্জ ও আশেপাশের এলাকার দলটিতে ছিল। আজন্ম শহরে বেড়ে ওঠা কেউ যদি হাওড়-বাওড়, পাহাড়-টিলা, নদী-নালায় পরিবেষ্টিত কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে হঠাৎ ছিটকে পড়ে তাহলে তার অবস্থা যেমন হবে মিলিটারি ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামার পর আমাদের কয়েকজনার অবস্থাও ঠিক তেমন হলো। প্রকৃতির এই মনকড়া দৃশ্য যে কোনো কাউকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য। কিন্তু যুদ্ধভূমি হিসেবে এরকম অঞ্চল ভীষণ দুর্গম এবং কষ্টকর টের পেলাম তিনদিন যাবার আগেই জয়বাংলা বাজারে মধু মিয়ার সাক্ষাৎ পাবার পরমুহূর্তেই।

ভারতের বালাট সীমান্তের শেষ মাথায় নোম্যান্স ল্যান্ডের (No Mar's Land) পর থেকে যেখানে বাংলাদেশের শুরু সেই গ্রামটির নাম ডলুরা। সেখানেই সীমান্তের কোল ঘেঁষে যুদ্ধকালীন মানুষের সুবিধার জন্য স্থাপিত হয়েছে স্বাধীন মাটিতে জয়বাংলা বাজার। দুদেশের পণ্য বিক্রি হয়, দুদেশের টাকাই চলে এই বাজারে। দেখা হলো মধু মিয়ার সাথে। বাজারের মালিক না পাহারাদার মধুমিয়া টের পেলাম না মোটেই। ছিপছিপে হালকা পাতলা গড়নের মেদহীন শরীরের মানুষটির পরনে আনসারের খাকি পোষাক, মাথায় সামনের দিকে বাড়ানো কাপড়ের টুপি পায়ে জঙ্গল বুট। খটাশ করে সামরিক কায়াদায় স্যালুট দিলেন। তার পেছন পেছন গিয়ে বসলাম চায়ের দোকানে আমার সাথের গাইড মজলিশ (পরে শহীদ) কে নিয়ে ওর্ডার দেবার আগেই চা-বিস্কুট চলে এল। আমাদের আসার খবর পেয়ে ভীষণ আনন্দিত তিনি। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম সুবেদার গিয়াস উদ্দিনের (বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার) এর নেতৃত্বে ইপিআর, আনসার এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈনিক নিয়ে এ যাবত তারা লড়াই চালিয়ে এসেছেন। মধুমিয়াও সরাসরি এ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসাতে কয়েকদিন যাবত কোনো যুদ্ধ নেই এলাকাতে। গোলা-বারুদ হাতিয়ার নিয়ে আমরা এসেছি, পেছনে আরো আসছে অনেকে এবং এখন থেকে একের পর একটা ব্যাচ আসতে থাকবে প্রশিক্ষণ শেষ হবার সাথে সাথে; আমাদের সেক্টর কমান্ডার, সাব-সেক্টর কমান্ডার আসবেন, সরাসরি তাদের কমান্ডে যুদ্ধ পরিচালিত হবে-এসব জেনেই তার এতো আনন্দ। বললেন- 'আপনেরা উচিত সময় আইছইন। এই যে দেখতাছইন পানি আর পানি, কুন যেগাত বুক সমান, আবার কুন যেগাত মাতা সমান, এর মাইজে শাপ কোপ, পাহাড়ি জোকে ধরলে ছয়মাস লাগে শুকাইতে, ধান ক্ষেতর আরলিও আছে পানির নিচে, হামুখ আর কাপনার মতো বাদ

অই দিলাম, এক গেরাম থাইক্যা আরেক গেরামে যাওন লাগে নৌকা দিয়া, মার্চ এপ্রিল মাসে ইকান আছিল ফসলর ক্ষেত, আল্লার আজব লিলা দেখইন, আইজ ই জাগাতে পানি আর পানি। আপনেরার কষ্টের কতা চিন্তা করলে কিছুডা খারাপ লাগলেও শত্রুপক্ষর অবস্থা এক্কেরে টাইট, হাতার যানে না শালার বেটাইনতে, পানিত লামতে ডরায়, এই সুযোগে যাইত্যা ধরুম আমরা।'.তন্ময় হয়ে শুনছিলাম আমরা তার কথা। যেন যুদ্ধের শেষ পরিণতিটাও ধরা ছিল তার চোখের সামনে অভিজ্ঞ সমর নায়কদের মতো। কথা বলার সময় মধু ঝরে মধু মিয়ার মুখে। প্রথম দর্শনেই কাছে টেনে নিলেন আমাদের। বয়সে আমাদের চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় হবে মানুষটি। বললাম- আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আপনি বলার সাথে সাথে ক্ষেপে উঠলেন- 'আপনারা স্যার শিক্ষিত মানুষ, অফিসার মানুষ, তুমি না বললে দুঃখ পাই আমি।' তুমি না বললে দুঃখ পায় মধু মিয়া। আরেকটি কথা বলেছিল, তুমি নাকি আপন মানুষের সম্বোধন। তার তুলনায় অনেক বেশি লেখাপড়া জানা হলেও অনেক দিন পর কথাটির মর্ম বুঝতে শিখেছি। সেই থেকেই তুমি বলা শুরু করেছি তাকে অর্থাৎ তার ভাষায় আপনজন।

এরপর থেকে দেখা হয়েছে প্রায়ই তার সাথে। যতবার দেখা হয়েছে ততবারই যুৎসই একটা স্যালুট উপহার পেয়েছি তার কাছ থেকে। সবসময়ই ব্যস্ত মধু মিয়া। জয় বাংলা বাজারে তাবু খাটিয়ে একটি রেডক্রস সেন্টার খুলেছে। আরেকদিন জানালেন দেওয়ান ওবায়দুর রাজা তৎকালীন এমএনএ, তার সাথে আলাপ করেছেন একটি গোরস্থানের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্থান নির্বাচন করার জন্য এবং রাজা সাহেব তাকে নাকি কথা দিয়েছেন সেটা করে দেবেন। তারপর তিনি তার যুদ্ধে, আমি আমার যুদ্ধে, যুদ্ধের ক্ষেত্র বেড়েছে। আমাকে আসতে হয়েছে সুনামগঞ্জ, আহছান মারা, জয়কলশ, উজানি গাউ, বেরিগাউ, দরিয়াবাজ, আমবাড়ি, বইয়াখউরি, মুক্তখাই, জিবদারা, কাংলার হাওর, করচার হাওর, বেজবাড়ি, হুরুয়াকান্দা, বাদেরটেখ, সদরপুর, পাগলা অপারেশনে চলে এসেছি এবং আহত হয়ে বালাট ফিরে এসেছি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে স্থাপিত অস্থায়ী হাসপাতালে। শিলং মিলিটারি হাসপাতালে যাবার আগে একদিন একরাত ছিলাম আমি সেখানে। রাজা সাহেবসহ সবাই দেখতে আসেন আমাকে। মধুমিয়াও আসে। তার কাছ থেকে জানতে পারি শহীদদের জন্য যোদ্ধাদের গোরস্থান হয়েছে। এরপর আর মনে নেই তাকে.....।

স্বাধীনতার দু'মাস পর সুনামগঞ্জ গিয়েছি। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে মধু মিয়া, এসেই চিরাচরিত সেই স্যালুট। লাঠির সাহায্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমাকে হাঁটতে দেখে ভীষণ আফসোস করল প্রথমে, তারপরই মধুর হেসে মধু মিয়ার আবদার-'স্যার, লইন যাই ডলুরা আমার সাথে'। বলেছি আজ না, আবার আসছি, এলেই যাবো। ডাহা মিথ্যে বলে এসেছি, যাইনি ফিরে, পাছে নতুন কোনো দায়িত্ব বেড়ে যায় এই ভয়ে জিজ্ঞেস করিনি, মধু মিয়া কী রয়েছে সেখানে।

৯০ সালে আরেকবার সুনামগঞ্জ টাউন হলে সেক্টর কমান্ডার লে. জেনারেল মীর

শওকত আলী, অন্য আরো দুজন সাব-সেক্টর কমান্ডারের সাথে আমিও গিয়েছিলাম বালাট সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের এক সমাবেশে মধু মিয়ার সাথে দেখা। পরণে সাফারি, মাথায় বারান্দাওলা টুপি, স্যালুটের পর একখানা খাতা বাড়িয়ে দিল আমার হাতে-'স্যার দেখইন চাইন আপনার নামডা আছেনি ইখান।' বিস্ময়ে হতবাক আমি! পাতা উল্টিয়ে খুঁজে পেলাম আমার নাম বাবার নামসহ আমার সিলেটের ঠিকানা রয়েছে সেখানে, আমি যে আহত হয়েছিলাম সেটারও উল্লেখ আছে। আঠার মতো লেপ্টে আছে আমার চোখ তার ডায়রির পাতায়। আহত, শহীদ কারো নাম বাদ পড়েনি। মধু মিয়ার কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পেলাম-'স্যার লইন যাই ডলুরা। গোরস্থানটা দেইখ্যা আইবা।' যাবো মধু মিয়া তবে আজ নয়, বলে এসেছি। যাইনি। মূলত যাবার দায় ছিল না আমার। সংসারের টানাপোড়েন মানবিক অনুভূতিগুলোকে ভোঁতা করে দিয়েছিল তাই যাওয়া হয়নি।

২০০৪ সালে সিলেটে মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ড থেকে ৩/৪ জন পরিচিত মুক্তিযোদ্ধা আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন একদিন। চা নাস্তা শেষ করার পর মনে হলো কিছু বলার জন্য উসখুস করছেন তারা। আমিই জানতে চাইলাম বিষয়টা কী। নেহাত বাধ্য হয়ে তারা জানালেন, আগামীকাল আমাকে সিলেট মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডে একটু যেতে হবে, ভুলক্রমে আমার নাম নাকি মুক্তিযোদ্ধার নামের তালিকাতে ওঠেনি, ঢাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধা সেন্ট্রাল কমান্ড কাউন্সিলের একজন কর্মকর্তা আসবেন এবং সিলেটের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত থাকবেন যাচাই বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে। আমাকে সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রমাণ করতে হবে আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম কী না। তবে এও জানালেন তারা, আমি একা নই আরো বেশ কয়েকজনের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং আমার বন্ধু ইফতেখার শামিম ও বড়ভাই সদর উদ্দিন আহমদ চৌধুরী থাকবেন যাচাই বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে। তাদের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলাম আমি। বললাম যাবো না আমি এবং এও বললাম-'তোমাদের যাচাই বাছাই কমিটিকে বলে দিও আমার নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে।' যদিও তাদের কোনো দোষ ছিল না, তবুও অযাচিতভাবে দুর্ব্যবহার করে বিদায় করলাম তাদের। তারাও আমার তাৎক্ষণিক আবেগের কারণ বুঝতে পেরে চলে গেল। মনে পড়ল মধু-মিয়ার কথা। পাঠশালা পাশ করা মধু-মিয়া যখন যাকে পেয়েছে তাকে দিয়ে ডায়রিতে নাম লিখে রেখেছে মুক্তিযোদ্ধাদের। মধু মিয়ার ইতিহাসে আমার নাম আছে অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে নেই। সুনামগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা শামছুল হক জানালেন ঐতিহাসিক মধু মিয়া পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন মাত্র কয়েক মাস আগে।

২০০৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথামূলক আমার লেখা বই *একাত্তরে রণাঙ্গনে* প্রকাশিত হলো একুশের বই মেলাতে। নিজের যুদ্ধকথা লিখতে গিয়ে মধু মিয়ার কথা এসেছে সেখানে। তাতেই দায়সারা ভেবেছি নিজেকে। কিন্তু বইখানি পড়ার পর সুনামগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু এডভোকেট বজলুল মজিদ খসরু হঠাৎ একখানা চিঠি পাঠালো। প্রশংসায় ভর্তি চিঠি। আনন্দে নেচে উঠলাম আমি। নিজের প্রশংসা শুনতে

কার না ভালো লাগে। খসরুর চিঠিতে আরো ছিল-'মধু মিয়ার উপর দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় ৭ই জানুয়ারি ২০০৫ ইংরেজীতে প্রকাশিত আমার লেখার কপি পাঠালাম। মধু মিয়াকে আলোতে নিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তোমার পক্ষ থেকে কী করতে পার দেখবে।' চিঠি পড়া শেষ করেছি কিন্তু মধু মিয়ার ওপর লেখা পেপার কাটিং পড়িনি সময়ের অভাবে। জড়িয়ে পড়েছি নিজের জীবনযুদ্ধে।

২০০৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়ার কণ্ঠ ভেসে এল মোবাইল ফোনে। জিজ্ঞেস করলেন কিছু লিখছি কী না। উত্তরে জানালাম একটি বইয়ের অনুবাদ করেছি আরেকটি উপন্যাসের রূপান্তরও করেছি। ক্ষেপে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন-ওগুলো করার মতো বহু লোক আছে বাংলাদেশে এবং আপনার চেয়ে অনেক ভালো লিখে তারা, মুক্তিযোদ্ধের ওপর লিখছেন না কেন? সাথে সাথে উত্তর দিলাম-কেন লিখে ফেলেছি তো আমার স্মৃতিকথা। আরো বেশি ক্ষেপলেন তিনি-'কেন আপনি ছাড়া আর কেউ যুদ্ধ করেনি? আপনি একাই দেশটাকে স্বাধীন করেছেন নাকি? ওদের কথা লিখতে পারেন না? আর ক'দিন পর বলার মতো কেউ আর বেঁচে থাকবে না। ওসব বাদ দিয়ে যাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন ওদের কথা লিখুন।' কেটে দিলেন ফোন তারপর।

মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়ার মতে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের উপকরণ। ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন তার 'একাত্তরের বিজয়গাথা গ্রন্থে'র ভূমিকাতে লিখেছেন-'এখন তো আংশকা হয়, ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকা ও যুদ্ধের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে। কারণ উপাদান বিনষ্ট হলে কীভাবে রচনা করা যাবে ইতিহাস?' মধু মিয়া কী তাহলে আন্দাজ করতে পেরেছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হারিয়ে যাবে.....? বদলে যাবে.....? বিকৃত হবে.......? হারিয়ে যাবে ইতিহাসের সকল উপকরণ। এবং সে জন্যেই ডায়রির পাতায় লিখিয়ে রাখছিল সব কিছু।

বজলুল মজিদ খসরুর পাঠানো পেপার কাটিং খুঁজে বের করলাম। পড়লাম মধু মিয়ার কীর্তিগাথা। সুনামগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা খসরু আর আমি একসাথে ট্রেনিং করি কিন্তু তাকে যেতে হয় দোয়ারা বাজার-ছাতক সাব-সেক্টরের যুদ্ধে। মধু মিয়ার সাথে তার পরিচয় স্বাধীনতার পর। ২০০৫ সালের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার ৭ই জানুয়ারি সংখ্যাতে মধু-মিয়াকে নিয়ে তার লেখার শিরোনাম ছিল-'আত্মনিবেদিত মধু মিয়া, তার স্বপ্নের ডলুরা স্মৃতি সৌধ।' প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ পড়ার পর খসরুকে টেলিফোন করে পরদনিই সকালে গিয়ে উপস্থিত হলাম সুনামগঞ্জ ১৮ই মার্চ মঙ্গলবার ২০০৮ তারিখ সকাল দশটার সময় আরেক সতীর্থ মুক্তিযোদ্ধা সালেহ এর বাসায়। একসাথে ট্রেনিং নেবার পর সে চলে গিয়েছিল ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আমি গিয়ে পৌঁছার সাথে সাথে মধু-মিয়ার স্ত্রী হেলিনা বেগম এসে উপস্থিত হলেন। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ছেলেটা মারা গেছে প্রায় বছর খানেক তাই দোকানটাও এখন তাকে চালাতে হয়। একমাত্র মেয়ে মমতাও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে অনেক আগে। শাহাব উদ্দিন আফিন্দীর লেখা আরেকটি

পেপার কাটিং দিলেন মধু-মিয়ার স্ত্রী আমাকে। বললেন-এখানেই সব পাবেন তার সম্পর্কে। মধু মিয়া স্মরণে আফিন্দীর লেখার শিরোনাম-'আমাদের মুক্তিযোদ্ধা মধু ভাই।' লেখাটি পড়া শেষ করার আগেই সুনামগঞ্জ জেলা কমান্ডের আব্দুর রশীদ এসে উপস্থিত হলেন। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক ছিলেন। দলছুট হয়ে পরবর্তীতে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সাথে যুদ্ধে। আমার সাথে শিলং মিলিটারি হসপিটালে ছিলেন আহত অবস্থায়। অনেক দিন পর দেখা হতে দুজনেই আমরা বেজায় খুশি। তার ছেলে আলম, একটি স্থানীয় দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টার তাকে নিয়ে রওয়ানা হলাম মধু মিয়ার স্বপ্নের ডলুরা শহীদ স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে। আমার সাথে সিলেটের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সুপরিচিত মুখ আমিরুল ইসলাম বাবু।

হালুয়াঘাট এসে ইঞ্জিন নৌকায় সুরমা নদী পাড়ি দিয়ে বেবিটেক্সি রিজার্ভ করে ডলুরার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। রিক্সাও রয়েছে প্রচুর, তাছাড়া মোটর সাইকেল নিয়ে তরুণরাও অপেক্ষমান। সবচেয়ে দ্রুততম এবং অপেক্ষাকৃত কম ভাড়াতে মোটর সাইকেলে যেতে পারবেন আপনি সেখানে। আমরা তিনজন থাকাতে বেবিটেক্সি নিলাম। সিমেন্ট বাঁধানো সরু পাকা রাস্তা নদীর ঘাট থেকে শুরু হয়েছে। বাড়ি ঘর, বাঁশের ঝাড়, ধানের ক্ষেত, ফসলের মাঠ, পুকুর ডোবা, হাওর নদী ছায়াছবির দৃশ্যের মতো সরে যাচ্ছে পেছনের দিকে, মেঘালয়ের পাহাড়রাজীর মায়াবী হাতছানি ক্রমশ এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। বাঁদিকের বিস্তৃত একটি ফসলের মাঠের শেষ প্রান্তের সবুজে আমার চোখজোড়া আটকালো হঠাৎ। ড্রাইভারের ঘাড়ে হাত দিয়ে বেবিটেক্সি থামালাম। ভীষণ চেনা লাগছে জায়গাটি। ড্রাইভার জানাল গ্রামটির নাম ঢালার পাড়। মনে পড়ল, মদন হাবিলদারকে হারিয়েছিলাম ঐ গ্রামে। আহত হয়ে মদন চলে যায় শিলং হাসপাতালে, ফিরে আসেনি, মারা যাবার পর এসেছে, তবে কোনো মধু মিয়া সেখানে না থাকায় কবর কোথায় আজো কেউ জানে না। ইপিআর এর অকুতোভয় একজন সৈনিক মদন হাবিলদার সেদিনকার যুদ্ধে নিজের প্রাণের বিনিময়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। আবার চলতে শুরু করেছি, একে একে বেরিগাউ, ষোলঘর, কৃষ্ণনগর, নারায়নতলা চার্চ সব এসে উপস্থিত হতে শুরু হলো আমার চোখের সামনে, একই সাথে স্মৃতিগুলোও সব ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফেরা-বর্তমান থেকে অতীতে...মজলিশ, মধুমিয়া, কালাম, শামছুল হক, কবীন্দ্র, সিরাজ, মরম আলী, আরশ আলী, রশীদ, হাবিলদার হিরা মিয়া.....সবাই জীবন্ত রক্তমাংসের সৈনিক....রাইফেল, এলএমজি, স্টেনগান, টু-ইঞ্চি মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড সেই আগের মতোই...সেন্ট্রির চিৎকার.....হল্ট, পাসওয়ার্ড.....হিরা মিয়ার কণ্ঠস্বর.....বানচুতের বাচ্চারা.....। আমার মস্তিষ্কের পেছনে বসানো কোনো এক অদৃশ্য প্রজেক্টর থেকে কে যেন দৃশ্যগুলোকে নিক্ষেপ করছে আকাশের গায়ে। ঐ-তো হাওয়ায় ভেসে আসছে লাগামহীন আমার প্রিয় সেই লাল ঘোড়াটি। যাকে নিয়ে রাংপানির ব্রিজ পার হয়ে বিএসএফ এর ক্যাম্প থেকে গোলাবারুদ আর হাতিয়ার আনতে যেতাম। ঘাড়ে হাত পড়লো-ঐ যে আপনার নারায়নতলা চার্চ, আরো দুই কিলোমিটার পর ডলুরা। বাবুর ডাকে চোখের ঘুম পালালো। চোখের পলকে পার হলাম দুই

কিলোমিটার পথ দুপাশে ছড়িয়ে থাকা আমার প্রতি পরিচিত যুদ্ধভূমি দেখতে দেখতে, যার প্রতিটি ইঞ্চি ভূমি চষে বেড়িয়েছি আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে।

ডলুরার শহীদ স্মৃতিসৌধের গেটে এসে থামলাম। নদীর ঘাট থেকে এগারো কিলোমিটার পাকা রাস্তা এবং ডলুরা গ্রামের শেষও এখানেই। তারপর নো ম্যান্স ল্যান্ড। দেশ ও জাতির অতন্দ্র প্রহরী মধু মিয়া সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব কারো হাতে ছাড়তে মোটেই রাজি নন আজ অব্দি। ৪৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সমাহিত করেছেন তিনি এখানে, সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে। পাহারা দিচ্ছে আজও তারা, তিনিও সাথে রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪২ জনকে কবর দেওয়া হয় এবং ৬ জন হিন্দু মুক্তিযোদ্ধাকে দাহ করা হয়। আলাদাভাবে চিহ্নিত করে মার্বেল পাথরের ওপর নাম লেখা আছে তাদেরও। লোহার গেট পার হয়ে স্মৃতিসৌধের মূল পাকা গেইট। গেটের লোহার গ্রিলে বসানো সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ফটকের দরজা। লম্বায় ৮২ ফুট, প্রস্থে ৮১ ফুট এবং উচ্চতায় ৫ ফুট উঁচু পাকা দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে কবরস্থানকে। ভর দুপুরের রোদ্দুরও গাছের পাতার ডিফেন্স লাইন অতিক্রম করে সরাসরি মাটিকে স্পর্শ করতে পারে না, তবে ছায়াকে জড়িয়ে রোদের চিরন্তন ঝিকিমিকি খেলায় কোনো বাঁধা নেই সেখানে। নানান প্রজাতির গাছের সমারোহ এক অপূর্ব শান্ত প্রকৃতি রচনা করেছে। যে দুটি পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতিসৌধের ফটক সেখানে মার্বেল পাথরের ওপর কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে ৪২ জন সমাহিত মুক্তিযোদ্ধা এবং ৬ জন দাহ করা মুক্তিযোদ্ধাদের নাম। প্রতিটি কবরের মাথার দিকে পাথরের ওপর ক্রম অনুযায়ী নম্বর বসিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে একেকটি কবরকে। এই তালিকা থেকে কোনো নাম বাড় পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই যেমন ঠিক তেমনি নতুন কোনো নাম অন্তর্ভূক্ত করার কোনো উপায়ও সেখানে নেই। শুধু একটি নাম আছে তালিকার বাইরে, নম্বর নেই, নামটি কবরের মাথার দিকে পাথরের ওপরে লাল পেইন্ট দিয়ে লেখা-'মধু মিয়া।' পাশেই রয়েছে বিস্তৃত সবুজ মাঠ, মাঠ ঘিরে সারিবদ্ধ গাছের সমারোহ, লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আসা ক্লান্ত শ্রান্ত পথিকের কিংবা দর্শনার্থীদের জন্যে একপ্রান্তে বিশ্রামাগার। স্মৃতিসৌধের ঠিক উল্টোদিকে মাঠের সবুজের সীমানাতে সেন্ট্রি পোস্টের মতো একটি টংঘর। এগুলাম সেদিকে। চা-বিস্কুট পানসহ আরো টুকটাক অনেক কিছু রয়েছে দোকানটিতে। বয়স্ক একজন লোক বসে আছেন দোকানের ভেতরে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে কোনো মুক্তিযোদ্ধা আছেন কী না? বিস্ময় এবং বিরক্তি নিয়ে উত্তর দিলেন-'আমিইতো মুক্তিযোদ্ধা।' উত্তরটি দিয়ে পিটপিট করে তাকালেন চশমাহীন চোখে আমার মুখের দিকে, মুখের আদল চেনা লাগছে আমারও, লাফ দিয়ে নেমে এলেন টংগরের ভেতর থেকে। মুক্তিযোদ্ধা জসিম উদ্দিন, ডলুরার মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধ করেছি একসাথে, বর্তমানে স্মৃতিসৌধের অতন্দ্র আরেক প্রহরী। জসিমের পাঠানো খবর পেয়ে ছুটে এল মধু মিয়ার ভাই, সেও আমাদের সহযোদ্ধা। চা খাচ্ছিলাম জসিমের দোকানে তখন আরেকজন এল, আরো কিছুক্ষণ থাকলে বিরাট একটি মিলন মেলা জমে উঠতো সেখানে। ফেরার পথে জসিমকে সাথে নিয়ে

স্মৃতিসৌধ থেকে কয়েকশো গজ দূরে ছোট্ট বাজারে মধু মিয়ার ভাইয়ের চায়ের দোকানে বসে শর্ষে ভর্তা দিয়ে গরম গরম চিতই পিঠা খেলাম সবাই।

সিলেটে ফিরে আসার পথে ভাবছিলাম খসরু এবং অফিন্দীর লেখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যসহ ডলুরার শহীদ স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখবো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই পরিচিত দৃশ্য নজরে পড়ল। আহসানমারা ব্রিজ অতিক্রম করছিলাম আমরা, যুদ্ধকালীন সময়ে ফেরি ছিল। আরো কিছু সামনে এগুতেই থামালাম গাড়ি, এখানেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিলাম আমি, একই দিনে একাত্তরের ১৬ই আগস্ট আমার সহযোদ্ধা মরম আলী শহীদ হয়েছিল এখানেই কুখ্যাত রাজাকার সত্তার ও পাকিস্তানি মিলেশিয়া বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে এবং এখানেই বহাল তবিয়েতে ২০৫টি মামলার আসামী ঐ সাত্তার আজও বিরাজমান। *যুগভেরী*তে এ ব্যাপারে কিছু লেখা বেরিয়েছিল শুনেছিলাম কারো মুখ থেকে। টেলিফোন করলাম হ্যারল্ড রশীদকে। হ্যারল্ড জানালেন তিনি ঢাকায় আছেন তবে ব্যবস্থা করছেন আমার জন্য। পাঁচ মিনিট পর আবার ফোন পেলাম তার কাছ থেকে, বললেন রাত আটটার দিকে অপূর্বের কাছে গেলেই পেয়ে যাবো আমার কাঙ্খিত কাগজ। আটটায় অপূর্ব আমার হাতে যুগভেরীর সংখ্যাগুলো তুলে দিল। মধু মিয়ার ওপর কোনো কিছু আছে কী না জানতে চাইলে সে ২০০৭ এর ১৬ই ডিসেম্বরের যুগভেরীতে প্রকাশিত দীপংকর মোহান্তের লেখা-'একজন মধু মিয়া ও ডলুরা সমাধীস্থল' এই শিরোনামের লেখাটি দিল। তাদের অফিসে বসেই লেখাটি পড়ে শেষ করলাম। অপূর্বের কাছ থেকে জানতে পারলাম দীপংকর মোহান্তের কাছে আরো অনেক তথ্য ও প্রমাণ আছে মধু মিয়ার ব্যাপারে। সে মোহান্তের সাথে ফোনে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিল। মোহান্ত প্রশ্ন করলেন আমি কী জানতে চাই? আমি তাকে উত্তরে বললাম- 'আমি আপনার, বজলুল মজিদ খসরু ও শাহাব উদ্দিন আফিন্দীর লেখা সব পড়েছি, তা ছাড়া যুদ্ধকালীন সময় থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে চিনতাম কিন্তু এখন আমি তাকে আবিষ্কার করতে চাই।' মোহান্ত হয়তো আঁচ করলেন আমার কথা, বললেন শুক্রবার সকালে আপনি আসুন আমার বাসায়, মনে হয় আপনাকে আমি সন্তুষ্ঠ করতে পারব এবং শুক্রবার অর্থাৎ ২১শে মার্চ তার বাসায় যেতেই আমাকে তিনি মধু মিয়ার সেই মূল্যবান ডায়রির ফটোকপি হস্তান্তর করলেন, সাথে আরো বেশ কিছু অপ্রকাশিত তথ্যের কপি দিলেন। শহীদ স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার নেপথ্য কাহিনী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে চুড়ান্ত সাংগঠনিক নিরপেক্ষতার এবং স্বদেশপ্রেমের এক অত্যাশ্চর্য উপাখ্যানের নায়ক মধু মিয়ার প্রতিচ্ছবি উন্মোচিত হলো আমার চোখের সামনে এগুলো পড়ার পর।

যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন মুক্তিযোদ্ধারা আহত হতে লাগলো এবং বিভিন্ন পর্যায়ে শহীদদের জন্য করের কোনো নির্দিষ্ট জায়গা না থাকাতে মধু মিয়া খুঁজতে লাগলেন। কোথাও পর্যাপ্ত জায়গা না পাওয়াতে শেষ পর্যন্ত তার আপন চাচাতো ভাইগণের এবং নিজের নামের বন্দোবস্ত সরকারি খাসভূমি, কিতাব আলী, হযরত আলী ও সিকান্দর আলীর কাছ থেকে দান হিসেবে গ্রহণ করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি

তৎকালীন জাতীয় সংসদ সদস্য এমএনএ দেওয়ান ওবায়দুর রাজা সাহেবের বরাবরে অনুমতি চেয়ে এই মর্মে লিখিত আবেদন করেন। প্রতি উত্তরে তার দরখাস্ত মঞ্জুর করে সরকারিভাবে ডলুরা নিবাসী মধু মিয়াকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয় এবং একই সাথে একটি বাড়তি দায়িত্ব উক্ত কমিটিকে প্রথম করা হয়।

প্রথম-আহত মুক্তিযোদ্ধাদের হাসপাতালে প্রেরণ ও তাদের প্রারম্ভিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়- জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক শহিদকে তার নিজস্ব ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা ও দাহ করার ব্যবস্থা করা। তার কমিটিতে ছিলেন মুন্সী তারু মিয়া, যিনি মাওলানা হিসেবে জানাজার নামাজ ও গোছল কাফনে সাহায্য করতেন, কবর দিতে সাহায্য করতেন আফসার উদ্দিন, কিতাব আলী, আব্দুর রহিম, মগল মিয়া, হযরত আলী ও মফিজ উদ্দিন। হিন্দু মুক্তিযোদ্ধাদের দাহ করার কাজে তিনি নিপু ঠাকুরকে নিয়োগ দেন। নিপু ঠাকুরের ঠিকানা যেভাবে তিনি তার ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখেছিলেন- নিপু ঠাকুর, পিতা মৃত্যু মনমোহন ঠাকুর, লাল পানি, বালাট, মেঘালয়। তার বাংলাদেশি কাউকে এ কাজের উপযুক্ত না পেয়ে উপরোক্ত ভারতীয় নাগরিককে দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। এরাই ছিলেন তৎকালীন প্রবাসী সরকারের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্য।

মন্তাজ মিয়া : প্রথমেই যাকে কবর দেওয়া হয় তার নাম মন্তাজ মিয়া। সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ থাকার কামলাবাজ গ্রামে বাড়ি ছিল তার। আনসার ট্রেনিং নেওয়া মন্তাজ মিয়া শুরু থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাবার কিছুদিন আগে মীরের চর গ্রামের কাঁচা মিয়াকে নিজের পাঞ্জাবী আর চশমা দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন- 'চাচা আমি যদি মারা যাই, এগুলো আমার মায়ের কাছে পৌছে দেবেন।' কাচা মিয়া শহিদ মন্তাজের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর মা যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তার একমাত্র সন্তানের প্রিয় মুখটি দেখার জন্য মায়ের হাতে সন্তানের এমন একটি স্মৃতিচিহ্ন পৌছালো যে চশমা দিয়ে ছেলে তার মায়ের মুখটি দেখ। একাত্তরের ১৮ই জুলাই শহীদ হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মন্তাজ। তার পিতার নাম আব্দুল গনী।

রহিম বক্স : ইপিআর এর হাবিলদার রহিম বক্স। চাকরি করতেন সীমান্তে। বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার এওকিয়া গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে দেশমাতৃকার টানে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। রহিমবক্স তার প্রিয়জনকে দেখতে পারেনি। একাত্তরের ২৭ শে আগস্ট শহীদ হন তিনি। বেরিগাঁওয়ের একটানা কয়েকদিনের একটি যুদ্ধে রহিমবক্সের প্লাটুন আমাদের সাথে কাজ করেছিল, যুদ্ধভূমিতে তার সাহসের কথা চিরজীবন মনে থাকবে আমার। জনাব আলী : জন্ম সুনামগঞ্জ থানার মাছিমপুর গ্রামে। পিতার নাম কেরামত আলী। মুক্তাঞ্চলেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ৯ সেপ্টেম্বর শহীদ হন।

সুরুজ মিয়া : সুনামগঞ্জ সদর থানার মঙ্গলকাটা গ্রামে ১৯৫০ সালে জন্ম। পিতার নাম মছমত আলী। ১০ অক্টোবর শহীদ হন।

ওয়াছিদ আলী : হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানার দেওতৈল গ্রামে ১৯৪৮ সালে জন্ম। পিতার নাম নাম হরকুম উল্লা। ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ শেষে বালাট সাব-সেক্টরে যুদ্ধে এস যোদগান করেন ১০ অক্টোবর পাক বাহিনীর এক অতর্কিত হামলা প্রতিহত করার মুখে ওয়াছীদ আলী শহীদ হন।

জয়নাল আবেদিন : ১৯৫৩ সালে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার ঝরঝরিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম লস্কর মাহমুদ। ট্রেনিং মেষে যুদ্ধে এসে যোগাদন করেন। অসমসাহসিকতার সাথে বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই করেন। ১লা আগষ্ট শহীদ হন।

মহরম আলী : সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার থানার রামপুর গ্রামে ১৯৫৩ সালে মহরম আলীর জন্ম। পিতার নাম আজিজ উল্লা। ২৭শে নভেম্বর শত্রু বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

মো: আব্দুর রহমান : ১৯৪০ সালে সুনামগঞ্জ থানার সুরেশ নগর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম হাজী আকিব আলী। মুক্তাঞ্চলে ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন। ২২ শে আগস্ট পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে শহীদ হন।

মোস্তাফা মিয়া : ১৯৪৬ সালে মৌলভী বাজার জেলার সাধহাটি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম কুদরত উল্লা। ট্রেনিং সেন্টার থেকে আসেন বালাট সাব-সেক্টর। ৪ঠা নভেম্বর পাকবাহিনীর হাতে যুদ্ধে শহীদ হন।

আব্দুছ ছাত্তার : মূল বাড়ি সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট থানার ভিতরগুল গ্রামে। প্রশিক্ষণ নেবার পর আসেন বরাটা সাব-সেক্টরে। ২৭শে নভেম্বর পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হন।

আজমান আলী : বাড়ি সিলেট জেলার ডাকরি গ্রামে। ২৭শে নভেম্বর মঙ্গলকাটা এলাকায় যুদ্ধে শহীদ হন।

আবেদ আলী : ১৯৪৯ সনে সুনামগঞ্জ সদর থানার নওরজপুর গ্রামে তার জন্ম। পিতার নাম নিজাম উদ্দিন। আধা সামরিক ট্রেনিং নিয়ে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। ২৭শে জুলাই পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হন।

আতাহার আলী : রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানার বিরামপুর গ্রামে জন্ম। তিনি আনসার বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন। সুনামগঞ্জ থাকার সময় শুরু থেকেই তিনি জড়িয়ে পড়েন যুদ্ধে এবং ২৭শে জুলাই পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

লাল মিয়া : ১৯৪১ সালে সুনামগঞ্জ সদর থানার ছাতারকোনা গ্রামে তার জন্ম। পিতার নাম নেকবার আলী। মুক্তাঞ্চলে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। ১লা আগস্ট পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে শহীদ হন।

চান্দ মিয়া : কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি থানার কুড়িশাই গ্রামে ১৯৫১ সালে তার জন্ম। পিতার নাম ওয়াজ হোসেন। অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ১০ই অক্টোবর পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে শহীদ হন।

মো: ছিদ্দিক মিয়া : সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট থানার বিতরখাল হাওড় গ্রামে জন্ম। পিতার নাম শমশের মিয়া। নভেম্বর মাসের শেসের দিকে শহীদ হন।

আবুবকর ছিদ্দিক : কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার গুজারিয়া গ্রামে ১৯৫২ সালে তার জন্ম। পিতার নাম মো: কমর উদ্দিন। একাত্তরে তিনি এসএসসি পরিক্ষার্থী ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে গোপনে গৃহত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ২৭ শে নভেম্বর পাকবাহিনীর হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ হন।

সায়েদুর রহমান : সুনামগঞ্জ সদর থানার গামাইরতলা গ্রামে জন্ম। মুক্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। ১২ই অক্টোবর যুদ্ধে শহীদ হন।

আব্দুল হামিদ খান : সিলেট জেলার পাঠানচক গ্রামে ১৮৪৭ সালে জন্ম। পিতার নাম এমদাদ খান। লেখাপড়া শেষ করে ইপিআর বাহিনীতে যোগ দেন। ৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দি হন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জনৈক বাঙালি কর্নেলের সহায়তায় মুক্তিলাভ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি পাকবাহিনীকে নাজেহাল করেন। ২৭শে নভেম্বর এই সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে শহীদ হন।

আব্দুল খালেক বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার করিমগঞ্জ বাজারে ১৯৫২ সালে জন্ম। পিতার নাম সৈয়দ আলী। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি বালাটে আসেন। ২৭ নভেম্বর পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে শহীদ হন।

যোগেন্দ্র দাস : সিলেট জেলার বালাগঞ্জ থানার মজলিসপুর গ্রামে জন্ম। ট্রেনিং সমাপ্ত করে বালাট সাব-সেক্টরে এসে যোগ দেন। তাকে শহীদ মাজারের অনতিদূরে দাহ করা হয়।

শ্রীকান্ত দাস : হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ থানার পাহাড়পুর গ্রামে জন্ম। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। ২৭শে নভেম্বর পাকবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন। একই স্থানে তাকে দাহ করা হয়। তারই স্মরণে সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজের পাশে সেনপাড়াতে শহীদ শ্রীকান্ত দাস ছাত্রাবাস নামে একটি হোস্টেল আছে।

অরবিন্দ রায় : সুনামগঞ্জ সদর থানার নয়াবাজার গ্রামে ১৯৪৩ সালে জন্ম। ট্রেনিং সমাপ্ত করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ২৮শে জুলাই পাকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে শহীদ হন। তাকেও শহীদ মাজারে দাহ করা হয়।

কবীন্দ্র দাস : সুনামগঞ্জ সদর থানার পাগলা গ্রামে তার জন্ম বলেই জানা যায় কারো কারো মতে যুদ্ধের আগে মোটারগাড়ির কন্ডাক্টর ছিলেন। ২৮শে জুলাই পাকবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন। তাকেও ডলুরাতে দাহ করা হয়।

এ ছাড়া যে সকল শহীদের নাম মধু মিয়ার ডায়েরি থেকে পাওয়া গেছে তারা হচ্ছেন- সালাহ উদ্দিন, তাহের মিয়া, আব্দুল হক, মুজিবুর রহমান, নুরুল হক, আব্দুল করিম, সুরুজ মিয়া, সাজু মিয়া, ধনু মিয়া, ফজলুল হক, শামছুল ইসলাম, কেন্ত মিয়া, সিরাজ মিয়া, সমছু মিয়া, দানু মিয়া, মন্নাফ মিয়া, রহিম মিয়া, আলি আহমদ, মো. সমুজ আলী, মো: সিদ্দিকুর রহমান, মো. আ. সিদ্দিক, মো. রহমত আলী, হরলালদাস এবং অধর দাস।

মধু মিয়া তার ডায়েরিতে যার সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছেন ততটুকুই লিখিয়েছেন। কোথাও কোথাও কালির কারণে অস্পষ্ট হয়েছে কোথাওবা কাগজের কারণে আবার বিভিন্ন লেখকের হাতের লেখার সাথে তাদের ব্যবহৃত কলামের কারণেও কিছু কিছু যায়গার অস্পষ্টতা রয়েছে। তবে তথ্য সংরক্ষণের ফলে শহীদ পরিবারগুলো অন্তত জানতে পেরেছে তাদের সন্তানদের মহান আত্মত্যাগের কথা। তথ্য সংরক্ষিত না থাকলে শহীদ শ্রীকান্তের নামে আজ সিলেটে শ্রীকান্ত ছাত্রাবাস হতো না। শহীদ আব্দুল হামিদ খানের শেষ আত্মত্যাগের খবরও জানতে পারতো না বাংলাদেশের মানুষ। কেউ আহত হলে সেটাও লিখে রেখেছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খেয়াল করার মতো, ডায়েরির বেশ কয়েকিট স্থানে বেশ কিছু আহত মানুষের নাম আছে, কিন্তু পাশে লেখা রয়েছে- পাবলিক। অর্থাৎ এরা যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু যে কোনোভাবে যুদ্ধাহত হয়েছিলেন, অতএব মধু মিয়া তাদের নামের পাশে পাবলিক লিখে রেখেছেন, যাতে করে পরবর্তী সময়ে কেউ তাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত না করেন। সামরিক বাহিনীর নামের পাশে-এমএফ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পাশে-এফএফ, আনসার, এভাবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা আছে।

সমগ্র সাব-সেক্টরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি। যেখানেই খবর পেতেন সহযোদ্ধারা আহত বা নিহত হয়েছেন সেখানেই ছুটে যেতেন।

স্বাধীনতার পর মধু মিয়া একটি লিখিত প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেন। এই প্রতিবেদনের নমুনাটি দেখলে অতি সহজে অনুমান করা যায় কতটুকু দেশপ্রেম থাকলে একজন মানুষ এতো উর্ধ্বে তার নিজেকে উন্নীত করতে সক্ষম হয়।

প্রথমে বড় করে লেখা আছে-যাদের রক্তে মুক্ত এদেশ। ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে লাইনটি চিহ্নিত করা। ডান পাশে তার ছবি লাগিয়েছেন। ছবির সিল মেরেছেন। আহ্বায়ক মো. মধু মিয়া। পরের লাইন-মধু মিয়া কমান্ডার প্রদত্ত। তত্ত্বাবধায়ক ডলুরা কবরস্থান। তারপর ৪৮ জন শহীদের নামের তালিকা। নিচে এসে লিখেছেন-উপরোক্ত শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে আজ এই দেশ মুক্ত। তাই আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক বটে। স্বাক্ষর করেছেন তার নিচে। আবার আরেকটি সিল মেরেছেন। এই সিলে লেখা আছে-মো. মধু মিয়া, সভাপতি, মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মাজার। ডলুরা সুনামগঞ্জ। আবার তালিকার ওপরে আরেকটি গোল সিলও মেরেছেন। বাম পাশে নম্বর অনুযায়ী কবরের নকশা এঁকে দিয়েছেন। এতো সিল মারার কারণ বোধহয় এই ছিল যে তিনি কাগজটিকে পোক্ত করতে চাইছিলেন সর্বাবস্থায়। তথ্যবিকৃতির ভয়টা কাজ করছিল শুরু থেকে তার মনে।

২০০৪ সালের ১৫ই মার্চ সোমবার দিবাগত রাত বারোটায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এই নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক মৃত্যু ঘটে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে দাফন করা হয়। তারই স্বপ্নে গড়া স্মৃতিসৌধে তাকে সমাহিত করা হয়। তার মৃত্যুর পর মুল্যবান এই ডায়েরিখানা বজলুল মজিদ খসরু ঢাকাস্থ মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘরে জমা দিয়েছেন।

একাত্তর-ফিরে দেখা
শাহ্ সাঈদ কামাল

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কথা লিখতে গিয়ে যার কথা মনে পড়ে তিনি হলেন প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। সম্পর্কে আমার চাচাশ্বশুর। উনার উপস্থিতিতে সবসময়েই একটু অস্বস্থি অনুভব করতাম, কখনও না জানি জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলাপ করতে বসেন। সুখের বিষয় তিনি যার সাথে আলাপ করতেন তার বিষয়ের উপরই আলোচনা করতেন। আর সবার মতো মুক্তিযুদ্ধ ছিল তার বিরাট দুর্বলতা। আমি মুক্তিযোদ্ধা তাই আমার সাথে এ বিষয়েই বেশি আলাপ করতেন। সে সময়ের আমার ছোটোখাটো যেসব অভিজ্ঞতা তা শুনে প্রায়ই ওনার স্বভাবসিদ্ধ স্থানীয় ভাষায় বলতেন, "বাবা, এইগুলো তোমাগো একটু লেইখা রাখনের দরকার, না অইলে ভবিষ্যৎ ছেলেপুলারা জানবো কেমনে?" অথচ তিনি নিজে কিন্তু লেখালিখিতে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। সেদিক থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিতই ভাববো। লিখতে গিয়ে তাই উনার কথাই মনে পড়ছে। কিছুদিন আগে (ডিসেম্বর, ২০০৮) আমি ঢাকা ক্লাবের মাসিক ম্যাজাজিন 'Ramna Green' এ লিখেছিলাম। আমার এ লেখাটি তারই সংস্করণ। লেখালেখিতে আমার প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা এবং প্রায় ৩৭/৩৮ বছরের স্মৃতির দুর্বলতা স্বীকার করেই লিখতে বসলাম। মূলত দুইটি কারণে, এক, নিজের ভেতরের দায়বোধ থেকে এবং নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাস জানানোর জন্য। দ্বিতীয়ত এবং সম্ভবত প্রধান কারণ যে বাংলাদেশ তথা বাঙালি জাতি একটা মহাসংকটময় সময় পার করছে, স্বাধীনতার অনেকপরে হলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির পরিচয় এই সংকটকালে প্রকট হয়ে উঠছে। অতএব আমার প্রয়াস সেই দিনগুলিতে নিজের দেখা ঘটনাগুলি তুলে ধরা।

একাত্তরের আমার বয়স ১৭-১৮র মাঝামাঝি- সব সম্ভবের এক বয়স। মোমেনশাহী, বর্তমানে মির্জাপুরে ক্যাডেট কলেজের এইএসসি প্রথম বছরের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধের এই কয়েক মাসে ছোটো বড় অনেক অভিজ্ঞতাই হয়েছে, তবে এই লেখায় যে ঘটনাগুলি তুলে ধরবো, তা সরাসরি কোনো যুদ্ধের ঘটনা নয়, যুদ্ধের পেছনের ঘটনা, সে সময়ের বাঙালি অনুভূতির ঘটনা, আবেগের ঘটনা। আমি নিজে একটু আবেগপ্রবণ মানুষ। ঘটনাগুলি আমাকে তখন যেমন নাড়া দিয়েছিল, আজো তেমনি দেয়। মনে হতো এতো মনের জোর, এতো সাহস, এতো দেশপ্রেম যে জাতির, সে জাতির স্বাধীনতা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মেলাঘর হয়ে সীমান্ত পথে ট্রেনিং নিয়ে ফিরছি। ট্রেনিং হয়েছে বিহারের চাকুলিয়া ক্যাম্পে সি-ইন-সি স্পেশাল এর দ্বিতীয় ব্যাচ-এ। আমি ঢাকার ছেলে, তাই ঢাকার আশে পাশে যুদ্ধ করার ইচ্ছা। কোলকাতা থেকে ট্রেনে আসাম, তারপর আগরতলায় ২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর মেলাঘরে উপস্থিত। সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে আহত, আমাদের যোগাযোগ ক্যাপ্টেন হায়দার, আমাদের হায়দার ভাইয়ের সাথে। চমৎকার এক মানুষ। ক্যাডেট কলেজে ক্যাপ্টেন পদবীর অফিসাররা আমাদের এ্যাডজুডেন্ট হতেন। ওনাদের দূরের মানুষ মনে হতো, কিন্তু হায়দার ভাইকে সে রকম কখনো মনে হয়নি। কী করলে এই অতি সাধারণ যোদ্ধাদের ভালো হবে, স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত, এই যোদ্ধাদের অস্ত্রের যোগান দেয়া সম্ভব হবে এবং নির্বিঘ্নে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করানো যাবে, সেই চিন্তায় হায়দার ভাই মগ্ন। অথচ সদা সপ্রতিভ, অমায়িক কিন্তু কাজের বেলায় কঠোর (এমন মানুষের অপমৃত্যু আমরা কতো সহজভাবে মেনে নিলাম)। বলে রাখা ভালো, আমার দেখা মুক্তিযোদ্ধারা শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ গ্রামের অতি সাধারণ ছেলে। এই সব ছেলেদের নিয়েই একটি দল গঠন করতে হবে, তারপর অস্ত্রের যোগান এবং বাংলাদেশে প্রবেশ। এই কাজে আমি পেলাম, একই সাথে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আব্বাস ভাই (তৎকালীন ঢাকা কলেজের ভিপি ও ছাত্রলীগ নেতা), আঙ্গুর ভাই ও ফেলু ভাইকে। আব্বাস ভাই কমান্ডার আমি টুআইসি অর্থাৎ উপ-অধিনায়ক। ৩০-৩৫ জনের দল গঠন সমাপ্ত, এখন অপেক্ষা অস্ত্রের। কিছুটা দেরি হচ্ছে, ২-৪ দিনের অবসর। আব্বাস ভাই একদিন বললেন, 'চল আগরতলা শহর ঘুরে আসি'। ঘুরতে যাবো বললেই তো আর যাওয়া যায় না, দুরু দুরু বুকে হায়দার ভাইয়ের কাছে আবেদন এবং আশ্চর্যজনকভাবে আবেদন সাথে সাথে অনুমোদন। মেলাঘর থেকে বাসে আগরতলায়, আমি ও আব্বাস ভাই। ছাত্রলীগ কর্মি হিসেবে আব্বাস ভাইয়ের রাজনৈতিক যোগাযোগ ভালো, তখনকার নামি-দামি নেতাদের ভাই বলে ডাকেন, আমি অবাক হই। যাদের দূর থেকে নাম শুনেছি, তারা তার কতো কাছের। আগরতলার রাস্তায় হঠাৎ তখনকার তুখোড় ছাত্র নেতা আব্দুল কুদ্দুছ মাখনের সাথে দেখা, আব্বাস ভাইয়ের সাথে ভালো পরিচয়। আমরা তিন জন আগরতলার স্বল্প পরিসর রাস্তায় হাঁটছি, নিজেকে কেমন জানি বেশ কেউকেটা মনে হচ্ছে। একেতো ট্রেনিংপ্রাপ্ত তার উপর বিখ্যাত ছাত্র নেতার পাশে হাটছি, মনে হচ্ছিল সবাই বোধহয় বুঝতে পারছে যে আমরা অস্ত্র, বিস্ফোরক, মাইন ইত্যাদিতে দক্ষ। রাস্তায় শরনার্থী ও যুব শিবিরের ছেলেদের বেশ ভিড়। এমন সময় কোত্থেকে ৫৫/৬০ বছরের এক বৃদ্ধের আগমন, সরাসরি আমাদের তিন জনের সামনে। সম্ভবত জানতে পেরেছে ছাত্রনেতাদের পরিচয়। তার আকুতি, "আমারে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা কইরা দে"। ট্রেনিং পাবার ব্যাপারটা যত সহজ মনে হতো, ততো সহজ ছিল না। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যুবশিবিরগুলিতে ছেলে-যুবাদের প্রচণ্ড ভিড়। ট্রেনিংক্যাম্পের স্বল্পতা অতএব বৃদ্ধের ধারণা ক্ষমতাবান ছাত্র নেতারাই পারবে তার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে। তার আকুতিতে আমরা বেশ আগ্রহী হয়ে উঠি। আমাদের প্রশ্ন, বাবা এ বয়সে

ট্রেনিং নিয়ে কী করবেন? বৃদ্ধের উত্তর, 'আমারে শুধু ব্যবস্থাটা কইরা দে, তারপর দেখ আমি কেমনে পাকিস্তানি জল্লাদদের শেষ করি'।

"আপনার বাড়িতে কে কে আছেন"? আমাদের প্রশ্ন।

বৃদ্ধের উত্তর, "নেউ নাই। তিন ছেলে, সবটিরে যুদ্ধে পাঠাইছি, বুড়িটারে এক আত্মীয়ের কাছে রাইখা আইছি, আমার আর কোনো পিছটান নাই। তোরা শুধু আমার ট্রেনিং এর ব্যবস্থাটা কইরা দে"। কী বিরাট বাস্তবতার মুখোমুখি আমি, এই আমি, আমার সামনে আমার চেয়ে প্রায় তিন গুণ বয়সের বৃদ্ধ, বাড়িতে তার বৃদ্ধা স্ত্রী, তিন ছেলের যুদ্ধে গমন এবং সর্বোপরি তার নিজের বয়স, কোনোকিছুই তার মুক্তিযুদ্ধে যাবার বাসনা প্রতিহত করতে পারছে না, কী অসীম তেজ, কী অসাধারণ প্রত্যয়। এই দেশ স্বাধীন হবে না তো হবে কোনদেশ?

ক্যাপ্টেন হায়াদারকে ঘিরে স্মৃতি : আমাদের দল গঠন সমাপ্ত, অস্ত্রের যোগানও শেষ, এখন সময় বুঝে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ। এই উদ্দেশ্যে মেলাঘর থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে মনতলী যেতে হবে। মনতলী ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশের ভেতর অনুপ্রবেশ করতে হবে, এমনই ব্যবস্থা। ক্যাম্পের দায়িত্বে ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন। আগস্টের মাঝামাঝি কোনো একদিন। আমাদের দলটি সকাল থেকেই প্রস্তুত। যার যার অস্ত্র বুঝিয়ে দেওয়া হলো। অস্ত্রের মাঝে আছে ৩০৩ রাইফেল, ৭.৬২ মি. মি. এসএলআর, ৯ মি.মি. স্টেন, সাথে গুলি, গ্রেনেড, বিস্ফোরক, বিভিন্ন ধরনের মাইন। সবার মাঝে একটা উৎসবের ভাব, সবাই উৎফুল্ল-বাংলাদেশ নিজ ভূমিতে ফিরে যাবো বলে। লে. মালেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ বুঝিয়ে দিচ্ছেন, হায়দার ভাই মাঝে মাঝে এসে তদারকী করছেন। উপ-অধিনায়ক হিসেবে তদারকীর তার কিছুটা আমার উপরও। আমাদের মনতলীতে নেবার জন্য ট্রাক প্রস্তুত। পুরো দলটি লাইন করে দাঁড় করানো, হায়দার ভাই রওয়ানা হবার আগে ব্রিফিং করলেন। যে যার ব্যক্তিগত অস্ত্র পরীক্ষা করে নিচ্ছে, ঠিক এমন সময় 'ঠা' করে গুলির শব্দ। সবাই হতচকিত, বুঝে উঠতে পারছি না কী হলো। হায়দার ভাই দলের মাঝ থেকে বের করলেন রফিক নামে ১৬/১৭ বছরের গ্রামের এক ছেলেকে। ঘটনা হলো, ভুলবশত সে তার ৩০৩ রাইফেল গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন লাগিয়েছিল। অস্ত্র পরীক্ষার সময় ট্রিগারে চাপ দিলে গুলি বেরিয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে আমাদের কারও গায়ে লাগেনি, হায়দার ভাই রেগে আগুন, এমনিই কমান্ডো হিসাবে তাকে বেশ কঠিন লাগে, রেগে গিয়ে আরও কঠিন হয়ে গেলেন। ছেলেটির অস্ত্র কেড়ে নিলেন এবং দল থেকে বের করে দিলেন। তার কথা, এখনই যদি এত দায়িত্বশীল হয় তবে এই ছেলে ভবিষ্যতে পুরো দলকে বিপদে ফেলবে, অর্থাৎ সেই রফিকের আর আমাদের সাথে যাওয়া হবে না। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি আমার কাছে হাজির, তার হয়ে হায়দার ভায়ের কাছে ওকালতি করতে হবে যাতে সে যেতে পারে। রফিকের চোখে জল ও প্রচণ্ড আকুতি, যেনো এই যাবার উপরই তার জীবন নির্ভর করছে। অতএব আমি আমাদের কমান্ডার আব্বাস ভাইকে নিয়ে গুটি গুটি করে হায়দার ভায়ের কাছে উপস্থিত এবং রফিককে ক্ষমা করে আমাদের সাথে

যাবার অনুমতির জন্য অনুরোধ করি। বেশ অনেকবার অনুরোধের পর হায়দার ভাই নরম হলেন এবং অনুমতি দিলেন। রওয়ানা হবার আগে নানা প্রসঙ্গে আমাদের বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন, এবার বিদায়ের পালা, হায়দার ভাই আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কথা বলছেন কিন্তু ভারী গলায়, তাকিয়ে দেখি তার চোখে জল। বললেন, তোমরা নিজেরাও জানো না তোমরা কতো বিপদের মাঝে যাচ্ছো। বাংলাদেশের ভেতরে শুধু পাকিস্তানি শত্রুরা তোমাদের চারিপাশে থাকবে না শত্রু তোমাদের ভেতরেও থাকবে। এইসব ছেলেরা যারা তিন অথবা চার সপ্তাহের ট্রেনিংপ্রাপ্ত, তাদের নিজ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে মানসিক শৃঙ্খলা প্রয়োজন, সেটা এতো অল্প সময়ে হয়ে ওঠে না। এদের সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাখাই হবে তোমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ তার ওপর আছে বিশ্বাঘাতক বাঙালিরা।

আমরা বেশ উৎফুল্ল, বাংলাদেশের পথে রওয়ানা দেবো বলে, কিন্তু বিদায় বেলায় এই কঠিন হৃদয়ের মানুষের চোখে জল ও কথা শুনে আমাদের মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে এল। তাৎক্ষণিকভাবে অনভিজ্ঞতার কারণে তার কথা উপলব্ধি করতে পারিনি। কিন্তু পরে বাস্তবতায় এসে বেশ অনেকবারই কঠিনভাবে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি। হায়দার ভাইয়ের সাথে আমার তখনকার মেলাঘর ক্যাম্পে পরিচয়ের ব্যাপ্তি ৭-১০ দিনের। চাকুলিয়া থেকে ট্রেনিং শেষে কলকাতা হয়ে আসা (আমরা কলকাতা থেকে ট্রেনে করে কুচবিহার, আসাম হয়ে বাংলাদেশের পশ্চিম-উত্তর ঘুরে ত্রিপুরা আসি। সময় লাগে ৭ দিনের বেশি)। এই অল্প সময়ে হায়দার ভাইকে যে খুব বেশি কাছ থেকে দেখতে পেরেছি তা নয়। শুনেছি উনি কমান্ডো ছিলেন। চলা ফেরায়, আচার আচরণে সব সময় বেশ কঠিন মনে হতো। অথচ এই অল্প সময়ের পরিচয়ে বিদায়ের সময় কঠিন মানুষটার অত্যন্ত কোমল দিকটার পরিচয় আমরা পেলাম। কী অসাধারণ মমত্ববোধ। বিজয়ের ঠিক আগে সম্ভবত ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার অদূরে মুগদাপাড়ায় অবস্থিত এক জুট মিলে হায়দার ভাইয়ের সাথে মিটিং এ দেখা হয়েছিল। বিজয়ের পরে দেখা হয়েছে ঢাকার বহুবার, তখন এই কঠিন এবং কোমল মানুষটার পরিচয় আরো পেয়েছি। যুদ্ধ মানব চরিত্রের কতো দিকই না চেনায়।

সীমান্ত পার হওয়ার অভিজ্ঞতা আগস্টের শেষ অথবা সেপ্টেম্বর প্রথম। আমাদের ৩০-৩৫ জনের গ্রুপটি মনতলী (আগরতলা) কেম্প থেকে হাতিমারা (সম্ভবত কুমিল্লার উল্টো দিকের কোনো জায়গা) দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছি। সময় সন্ধ্যার পর, উদ্দেশ্য, মাঝ রাতে পাকিস্তান আর্মির দুটি প্রধান বাধা, ঢাকা-চিটাগাং রেল লাইন এবং সিএন্ডবি রোড (বোধ হয় বর্তমানের কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক), পাড়ি দেওয়া। বেশ কিছুটা পথ হেঁটে তারপর নৌকায় যেতে হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগত অস্ত্র, গোলাবারুদ ও নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বিছানার চাদরে বোচকার মতো করে বেধে পিঠের উপর-ওজন আধমন বা বেশি। পিঠে বাধা গোলাবরুদ, মাইন এর সাথে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জিনিষপত্র। কিছুক্ষণ পিঠে থাকার পর বুঝলাম যথেষ্ট ভার। তার সাথে আছে অসুস্থ সহোযোদ্ধাদের বোঝা

ভাগ করে নেওয়া (৩০-৩৫ জনের গ্রুপে ৩-৪ জন অসুস্থ থাকাই স্বাভাবিক)। এ যেন "বোঝার উপর শাকের আটি"। আমাদের লক্ষ্য ঢাকার পূর্বে রূপগঞ্জ থানায় বালু নদীর পাড়ে হরদি বাজার (ইছাপুর বাজারের প্রায় ২ কি. মি. উত্তরে) যা বর্তমানে রাজউকের উপ-শহর প্রকল্প "পূর্বাচল"। আমাদের সাথে একজন গাইড, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। আমাদের গ্রুপটা অনুপ্রবেশের জন্য বিশেষ সতর্কতা অনুসরণ করা হয় এবং দুই বার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ আমাদের ঠিক আগের গ্রুপটা সিএন্ডবি রোডে ব্রিজ পার হবার সময় পাকিস্তান আর্মির এম্বুসে পড়ে এবং বহু মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়। অতএব, ঠিক কখন রওয়ানা হবো তা আগে থেকে বলা হচ্ছে না। পাকিস্তান আর্মি কোনোভাবে আগের থেকে খবর পেলে আমাদের পরিণতি একই হতে পারে এই আশঙ্কায়। যুক্তিও আছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় ট্রেনিংপ্রাপ্ত যোদ্ধারা খুব মূল্যবান, আরও মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ। ঘটনাক্রমে আমাদের আগের গ্রুপে যারা আহত তাদের দেখার সুযোগ হয়েছিল কিছুদিন আগের ঘটনায়। ছাত্র নেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখনের সাথে দেখা হওয়ার এক পর্যায়ে তিনি বললেন যে কিছু মুক্তিযোদ্ধা আহত অবস্থায় বিশ্রামগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতালে আছে। তাদের দেখতে যাবার জন্য, তার জিপে যেতে হবে। আমরা বিশ্রামগঞ্জের বাংলাদেশ হাসপাতালে পৌছালাম। তরুণ ডাক্তার জাফরুল্লা চৌধুরী হাসপাতালটির তত্ত্বাবধানে। ওখানেই তাকে প্রথম দেখি। ঘন্টাখানেক ওখানে ছিলাম, সে এক বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা। সদ্য আহত কারও হাত কেটে ফেলা হয়েছে, কারও পা কেটে ফেলা হয়েছে, করুণ স্বরে ব্যাথায় কাতরাচ্ছে, অসহায় ডাক্তাররা। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, সরঞ্জামের অভাব। এ হাসপাতালকে আবার প্রকৃত হাসপাতাল ভাবার কোনো অবকাশ নেই। মোটামুটি জঙ্গল কেটে টিলার উপর বাঁশের তৈরি ঘর। বিছানাগুলি বাঁশের মাচা, এই অবস্থা। মনে হলো, এদের আপনজনেরা কেউই জানে না এরা কোথায় কী অবস্থায় আছে। তাদের আদরের, ভালোবাসার, স্নেহের পরশটুকু ও পাচ্ছে না এই সময়। নিজেকে এদের অবস্থানে ভেবে মনটা হু/হু করে উঠলো। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলাম। জানা ছিল সীমান্ত পাড়ির সময় ওরা আহত হয় কিন্তু যেটা জানা ছিল না সেটা হলো যে আমাদেরই একই পথে যেতে হবে। ফিরে আসি আমাদের স্বদেশ যাত্রায়। হাতিমারা থেকে রাত ৯টা -১০ টার দিকে হেটে রওনা হলাম। গ্রামে বেশ গভীর রাত। বেশ কিছু সময় হেঁটে তারপর নৌকায় উঠলাম। বর্ষার শেষ, গ্রামের পরিবেশে শীতের হাতছানি, মনে টান টান উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা। দুই মাস পরে ফিরছি। যে আমি ভারতে এসেছিলাম আর যে আমি ফেরত যাচ্ছি তার মাঝে বিরাট ব্যবধান। এসেছিলাম বালক, এখন এই দুই মাসে কৈশোর ছাড়িয়ে যুবক, মানসিকভাবে আরও বেশি ঋজু। দলনেতা হিসেবে আমার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে আমার সহযোদ্ধাদের জীবন-মরণ। তারা বয়সে অধিকাংশই আমার চেয়ে বড়। অতি সাধারণ গ্রামের ছেলে অথচ কী সরল, সুন্দর চোখে মুখে দেশপ্রেমের ছাপ। সামনে জীবন মৃত্যুর দোলাচল "হয় মারো নয় মরো"। মনটা কেমন করে উঠে। জীবনের অনেকটাই

তো দেখা হলো না, কেন এমন হলো? কেন এমন হয়? কিছু মানুষের কথা বহির্ভূত ক্ষমতার লোভের জন্য এতো মানুষের এত ভোগান্তি? সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত। মনটা উদাস হয়ে উঠে। মনে হয়, আহা জীবনটা কতো সুন্দর, বেঁচে থাকাটা আরও সুন্দর। দুটি নৌকা ঠিক হলো, একেকটিতে ১৫-১৬ জন করে। একটির ভার আমার ওপর, আরেকটির ভার আব্বাস ভাইয়ের ওপর। মাঝরাত, বেশ আধার, ঘোর আমাবশ্যার রাত। আমাদের সুবিধা অন্ধকারে আমাদের দেখা যাবে না। নৌকার পাটাতনের উপর পিঠের বোচকা রেখে চারিদিকে দৃষ্টি রেখে এগুচ্ছি। মোটামুটি নির্বিঘ্নে সামনে এগিয়ে চলছি। মাঝরাত, সবার মাঝে সাংঘাতিক এক অব্যক্ত উত্তেজনা। প্রথমে পার হতে হবে রেল লাইনের ব্রিজ। ব্রিজের উপর পাকিস্তান আর্মি ও রাজাকারদের বাংকার, তবে আশার বিষয় রাতের বেলায় ওরা বাংকার থেকে সাধারণত বেরোয় না। রেল ব্রিজের কাছাকাছি গিয়ে অপেক্ষা রাজাকারদের সংকেতের। ভয় হয় আবার না এম্বুশে পড়ি। আমরা মোটামুটি গাইডের উপর নির্ভরশীল। গাইড অপরিচিত আর যুদ্ধের সময় এমন যে, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বাঙালিরাইতো জামায়াত এ ইসলামী, রাজাকার, আলবদর। অবশেষে নির্বিঘ্নে রেল ব্রিজ পার হলাম, দুইটি নৌকাই পাশাপাশি। এখন কিছুটা নিশ্চিত অন্তত সিএন্ডবি রাস্তা পর্যন্ত। নৌকার সহযোদ্ধাদেরকে উপর নজর রাখতে হচ্ছে, কেউ যেন আবার বিড়ি সিগারেট না ধরায়। যুদ্ধক্ষেত্রে এটা একেবারেই মানা, শত্রুর গুলির নিশানা হওয়ার খুব সহজ উপায়। দূর থেকে সিএন্ডবি রোড দেখা যাচ্ছে, আরও দেখা যাচ্ছে বাতি নিভিয়ে পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর গাড়ির কনভয়ের আনাগোনা। আমরা সতর্কতার সাথে এগুচ্ছি সবচেয়ে বিজপজ্জনক বাধা অতিক্রম করার জন্য। দূর থেকে ব্রিজটিকে আবছা দেখা যাচ্ছে, যার নিচ দিয়ে যেতে হবে। মনে হচ্ছে মৃত্যুফাঁদ। রাতের নিকষ আধারেরও একটা আলো থাকে, তাতেই অনুমান করছি ব্রিজটার অবস্থান। আমাদের গাইডের একই অনুমান। এমন সময় হঠাৎ মনে হলো আমাদের আরেকটি নৌকা পাশে নেই। এই অন্ধকারে দূরে একটা আলো আলো ভাব থাকে অথচ কাছের জিনিষ দেখা যায় না। নৌকাটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। শুরু হলো খোঁজা, ওরাও হয়ত খুঁজছে, আমরাও খুঁজছি। মাঝি চালাচ্ছে খুব সাবধানে, বৈঠার শব্দ ও যেন না হয়। প্রায় ঘন্টা দুয়েক পার হলো, সময়টা আরও দীর্ঘ মনে হচ্ছে। রাত প্রায় শেষ, কিছুক্ষণের মধ্যে আরেকটা নৌকা না পেলে ফিরতে হবে। দিনের আলোয় পানির ওপর নৌকায় আমরা একেবারে অসহায়। আমাদের থেকে রাস্তায় পাকিস্তান আর্মির অবস্থান গুলির দূরত্বও ভেতর। দিনের আলো ফুটে উঠেলে শত্রুর গুলিতে মারা যাওয়া ব্যতিত আর কোনো উপায় নাই। কিন্তু ফিরি কী করে? অন্য নৌকা কোথায়? প্রচণ্ড দোটানা। ঠিক সেই সময় পাশ থেকে চাপা স্বরে ডাক শুনলাম। পাশের নৌকার অনুযোগ আমরা কোথায় ছিলাম, আমাদেরও একই অনুযোগ। দ্রুত অভিযোগ, অনুযোগ শেষ করে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের তাড়াতাড়ি পার হতে হবে সময় খুব অল্প। কিছুক্ষণের মাঝে ফজরের আজান পড়বে, বেশ শীত শীত লাগছে। ঠিক এই

সময় মনে হলো পানিতে কিছু একটা নড়ছে। আমরা সতর্ক, কী ওটা? দেখি কিছু একটা সাঁতরে আমাদের নৌকার দিকে আসছে। খুব কাছে আসলে দেখি একটা মানুষ, আমরা আশ্বর্য, কিছুটা হতবিহবল। মানুষটাকে টেনে আমাদের নৌকায় উঠানো হলো, নানারকম শঙ্কা মনের মাঝে কাজ করছে। নৌকায় উঠানোর পর দেখলাম মাঝবয়সী এক লোক (৪০-৪৫), গায়ের রং বেশ কালো, মুখে দাড়ি, অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, শীতে কাঁপছে। আমাদের সাবধানী গলায় জিজ্ঞাসা "কে তুমি"?

উত্তরে সে তার ভাষায় বলে "তোরা যাইছ না, ফিরা যা, তোরা যে আইবি এই খবর ওরা জানে, গেলে ঠাইত (একেবারে) মারা পরবি, ব্রিজের ওপর ওৎ পাইতা (এম্বুস)আছে।" আমরা বিশ্বাস করি না, আগেই বলেছি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা খুব কঠিন এবার জিজ্ঞাসা করি তার পরিচয়। সে পরিচয় দেয় না, বরং বার বার ফিরে যেতে বলে। আমাদের হাতে সময় কম, সকাল হয়ে আসছে পার হতে হলে এখনই শেষ সময়। নৌকার জন্য সহযোদ্ধারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। এক পর্যায়ে আমরা বেশ কঠিন হয়ে উঠি এবং ধমক দিয়ে বলি যে আমাদের আসার খবর সে কী ভাবে জানলো? আরও ভয় দেখালাম, পরিচয় না দিলে আমরা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবো। উত্তরে সে যা বললো, তা শোনার জন্য অন্তত আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সে বললো যে সে এখানকার রাজাকার কমান্ডার এবং আমাদের আসার খবর সে পাকিস্তান আর্মির কাছ থেকে পেয়েছে। পেয়েই সে এই বিলের মাঝে গ্রামে (অনেকটা দ্বীপের মতো) অপেক্ষা করছে। স্থানীয় হিসাবে সে জানে যে ব্রিজের নিচ দিয়ে যেতে হলে এই পথ দিয়েই যেতে হবে। তার পরের ঘটনা আমাদের জানা। আমরা বিস্মিত, কিছুটা বিচলিত। জিজ্ঞাসা করলাম এতোক্ষণ পরিচয় না দেয়ার কারণ, উত্তরে সে যা বললো, সেটা আরো বিস্ময়কর। সে বললো কিছুদিন আগ পর্যন্ত তার বড়ভাই এখানাকার রাজাকার কামান্ডার ছিল। একইভাবে খবর পেয়ে কয়েকদিন আগে মুক্তিযোদ্ধাদের আরেকটি গ্রুপকে বাধা দিতে এসেছিল। গ্রুপটি তার কথা শোনেনি বরং যখন তার পরিচয় পেয়ে সেই গ্রুপেরই একটি ছেলে উত্তেজিত হয়ে গুলি করে এবং তার বড় ভাই মারা যায়। সেই গ্রুপটি ব্রিজ অতিক্রম করার সময় এম্বুসে পড়ে এবং অনেক যোদ্ধা হতাহত হয়। আমি তার বর্ণনা শুনছি আর হিসেব করছি। আমার হিসেব মিলে যায়। এই গ্রুপকেইতো আমরা দেখে আসলাম বিশ্রামগঞ্জে বাংলাদেশ হাসপাতালে। অবিশ্বাস থেকে লোকটার উপর বিশ্বাস জন্মালো। আমি দাঁড়িয়ে আছি এমন এক মানুষের সামনে যার বড় ভাইকে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করে মেরেছে মাত্র ৭/৮ দিন আগে। তার অপরাধ ছিল যে সে সেই দলটিকে বাঁচাতে চেয়েছিল। ব্যাপারটি যদিও ঘটেছিল ভুল বুঝাবুঝির কারণে। আজ তারই ছোটভাই একইভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের বাঁচাতে এসেছে। নিজের মাঝে নেই কোনো রাগ, ক্ষোভ, এটাই যেন তার কর্তব্য। এ কোন স্তরের মানুষ? এ কেমন দেশপ্রেম?

আমরা নৌকা ঘুরাই, ফিরে আসি। ভাবনায় মনটা ভারাক্রান্ত। দেশ একদিন স্বাধীন হবে হয়তো। এ মানুষটার পরিচয় রাজাকার হিসাবে থাকবে, অথবা কোনো

মুক্তিযোদ্ধার হাতে মারাও পড়তে পারে। কিন্তু সে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানোর জন্য,দেশের জন্য আজ যা করলো, তাকে আমি কিসের সাথে তুলনা করবো? যুদ্ধ বড় জটিল জিনিষ এবং কারও কাম্য হতে পারে না। কিন্তু এ ধরনের সংকট প্রকৃত মানুষ চেনায়। এই মানুষ চেনাটাই আমার মুক্তিযুদ্ধের বিরাট অর্জন। যে প্রশ্নটির মিমাংসা আমি আজও করতে পারিনি, সেটা হল, সেই রাজাকার কমান্ডার আর আমার মাঝে, কে বড় মুক্তিযোদ্ধা? সে না আমি?

প্রায় মৃত্যু ফাঁদে : বাংলাদেশ অনুপ্রবেশের প্রথম ব্যর্থতার পর দ্বিতীয়বার অন্য পথে ঢুকি। এবারের অনুপ্রবেশটা মোটামুটি নির্বিঘ্ন ছিল। সিএন্ডবি রাস্তা পার হবার পর আমাদের সবার মাঝেই স্বস্তিভাব ফিরে আসে। তখন মাঝরাত, নৌকার মাঝে কেউ টুকটাক কথা বলছে, কেউবা ঝিমুচ্ছে, দুটি নৌকায় বর্ষার ক্ষেতের মাঝে নৌকা চলাচলের পথ দিয়ে নিঃশব্দে এগুচ্ছে। আমাদের গাইডকে আমাদের অবস্থান জিজ্ঞাস করলাম। সে বললো কিছুক্ষণের মাঝে আমরা একটি নদী পার হব, তারপর হেঁটে ভোরের আগে আমাদের কুমিল্লার কোনো এক গ্রামে দিনের মতো আশ্রয় নিতে হবে। আবার সেই পিঠের উপর বোঝা নিয়ে হাঁটা, নৌকাই তো ভালো ছিল। উপায় নেই, সংকটকালের পথ তার নিজের নিয়মে চলে।

মাঝরাতের পর অন্ধকার নদীর পাড়ে আমরা কোনো এক জায়গায় নামলাম। নৌকার ভাড়া চুকিয়ে গাইড এর পিছনে পিছনে ক্ষেতের আইল ধরে হাঁটছি, গাইডের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। পথ ঘাট আমরা কিছুই চিনি না। আমাদের এই নৌকার মাঝি সম্বন্ধে কিছু না বললে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা অনেকটাই বলা হবে না। নৌকায় করে যখনই আমরা কোনো ব্রিজ বা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো বাংকার অতিক্রম করছি তখন স্বাভাবিক করণেই সবাই বেশ উৎকণ্ঠায় থাকতাম। কোথায় মাঝিকে আমরা সাহস যোগাব, উল্টো সে আমাদের অভয় দিয়ে বলতো "আপনারা একটুও চিন্তা কইরেন না, মিলিটারিরা রাতে বাইর অয় না, আমি ঠিকই আপনাগো যায়গা মতো লইয়া যামু" এই হলো আমাদের অতি সাধারণ মানুসের সাহস এবং আমাদের জনযুদ্ধে সম্পৃক্ততা। নৌকা ভাড়ার টাকাটা না নিলেই নয়, তাই নেয়া।

বর্ষার ক্ষেতের আইল তার উপর পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে হাঁটা বেশ কঠিন ব্যাপার। আমরা যারা অভ্যস্ত নই, তারা থেকে থেকেই ক্ষেতের চিকন আইল থেকে কাদায় পড়ে যাচ্ছি। এভাবে চলতে চলতে কখণ যে সকাল হয়ে গেছে টের পাইনি। আমরা তখন এক বিরাট ক্ষেতের মাঝে, দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। রাতের আঁধারের মাঝে গ্রামে পৌছতে না পারলে বিরাট বিপদ, দিনের আলোয় আশে পাশের সবাই দেখে ফেলতে পারে যে একটি ৩০-৩৫ জনের মুক্তিযোদ্ধা দল যাচ্ছে। এই সংবাদ শত্রুর কাছে পৌছতে কতোক্ষণ? আমরা যতই তাড়াহুড়া করি, গ্রামগুলি আরও দূর মনে হয়। এরই মাঝে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। যে ভোরের সূর্য সবার কাছে কাঙ্খিত তা তখন আমাদের কাছে সব চাইতে অনাকাঙ্কিত। দু, চার জন করে

কৃষক মাঠে আসছে আর বিস্ময়ে আমাদেরকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। আমাদের কাঁধের রাইফেলগুলি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করে ভোরের আলোয় লম্বা ছায়া ফেলে এগিয়ে চলছে। গাইডের উপর আমাদের সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে। তা হলে কি ও আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো? আমাদের ভুল পথে নিয়ে ধরিয়ে দেয়ার জন্য? কিছু ছেলে তো গাইডের প্রতি মারমুখী, পারলে ওখানেই গুলি করে মারে। অবশেষে, মোটামুটি আলোর মাঝেই আমরা গ্রামে পৌছালাম। গ্রামের লোকজন এগিয়ে এসে যা বললো তা মোটেই স্বস্তিকর নয়। মাত্র দু-দিন আগে পাকিস্তান মিলিটারিরা এই গ্রাম তছনছ করে গেছে। গ্রামের অবস্থানটাও বিপদজ্জনক একদিকে ময়নামতি কেন্টনমেন্ট, আরেকদিকে ঢাকা-চিটাগাং রোড, অন্যদিকে থানা। মোটামুটি চারিদিকেই আমরা শত্রু পরিবেষ্টিত। উপায় নেই, তাই এই গ্রামেই দিনটা কাটাতে হবে। দুই দিন আগে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া এক বাড়িতে আমরা অবস্থান নিলাম। গ্রামের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক এলে তাদের কিছু টাকা দিয়ে আমাদের খাবারের বন্দোবস্ত করতে বললাম। তারাও শঙ্কিত, মিলিটারি খবর পেলে আবারও বড় ঝাপটা তাদের উপর দিয়েই যাবে। এদিকে আমরা নজর রাখছি আমাদের গাইড যেনো কোনো অবস্থাতেই আমাদের চোখের আড়াল না হয়। যেই গাইডের হাতে আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করে তাকে কতো অবিশ্বাস, এটাই বাস্তবতা। গ্রামের লোকদের বলা হলো তারা যেন চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলে আমাদের খবর দেয়। এদিকে সারা রাতের নির্ঘুম পথচলার ক্লান্তি ও উত্তেজনায় একে একে সবাই বাড়ির উঠানে বসে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। পিঠের বোঝাটা খুলে নেবার ফুরসত নাই। কাত হয়ে বোচকার উপরই ঘুমিয়ে গেছে। জেগে আছি দুজন, আমি ও আরেকটি গ্রামের ছেলে। আমার জন্য চোখ খোলা রাখা দায়। কিন্তু এই অবস্থায় সবাই ঘুমালো, শত্রু এলে বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে মারবে, একটি গুলিও খরচ করতে হবে না। অগত্যা অনেক কষ্টে, চোখে পানি দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে রাখছি। বেলা সকাল ৯টা-১০টা হবে, এমন সময় গ্রামের লোক খবর নিয়ে এল কিছু মিলিটারি এই গ্রামের দিকে আসছে। পরিস্থিতির কারণে আমি নিশ্চিত যে তারা খবর পেয়েই আসছে। খবরটা দিয়ে লোকজন গ্রামের অপর প্রান্তে চলে গেল। দু চারজন সাহসী লোক আমাদের সাথে রইলো। এখন বাড়ির অবস্থানটা সম্বন্ধে একটু ধারণা দেওয়া যাক। বাড়িটি গ্রামের শুরু দিকে, একদিকে ফসলের মাঠ, পিছন দিকে গ্রামের অন্যান্য বাড়ি, আরেক দিকে ডিষ্টিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা, যেখান দিয়ে মিলিটারিরা আসছে। রাস্তার পাশে একটু ঢালু যায়গা তারপর বাগান, বিভিন্ন ফলজ গাছ, তারপর বাড়িটি। এই বাগানে এসে গাছের আড়াল থেকে আমি দেখবার চেষ্টা করলাম। মিলিটারির অবস্থান তখন বেশ দূরে। আনুমানিক ১০-১২ জনের গ্রুপ এক লইনে মার্চ করে গ্রামের দিকে আসছে। আমি ও আমার সাথের ছেলেটি ফিরে এসে ঘুমন্ত সহযোদ্ধাদের কাউকে ধাক্কা দিয়ে কাউকে পানি ঢেলে জাগিয়ে তুলি। সবাই সজাগ হলে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলি। তাড়াতাড়ি করণীয় ঠিক করে আমি ১০ জন ছেলে নিয়ে সামনে বাগানে

গাছের আড়ালে অবস্থান নেই। সিদ্ধান্ত, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চলবে গুলি না করার, কারণ এই শত্রুর ১০-১২ জনের দলটিকে ঘায়েল করতে হয়তো অসুবিধা হবে না, কিন্তু গোলাগুলি আরম্ভ হলেই আমরা পুরো ফাঁদে আটকে যাবো। কেন্টনমেন্ট এবং থানা থেকে ওদের শক্তিবৃদ্ধি করতে পেতে দেরি হবে না। এই অচেনা যায়গায় এতবড় যুদ্ধের ঝক্কির সামর্থ আমাদের নেই। অর্থাৎ গুলি হওয়া মানেই আমাদের পুরো দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, চারদিকে থেকে আমরা অবরুদ্ধ হয়ে যাবো।

এদিকে শত্রু এগিয়ে আসছে ২০০ গজ, ১০০ গজ, দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। তাদের একেকটি কদম যেন আমার বুকের উপর এসে পড়ছে। কড়া নির্দেশ, আমি গুলি করার সাথে সাথে অন্যরা গুলি করবে তার আগে নয়। চরম উত্তেজনা, শত্রু ৩০-৩৫ গজের মাঝে চলে এসেছে। গুলি করলে পুরো দলটিকেই শেষ করা যাবে। সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আর দেরি করা সম্ভব না। এবার শত্রু আমাদের দেখে ফেলবে। আমি ট্রিগারে হাত রেখে গুলি করার নির্দেশ দেবো । ঠিক তখনই মিলিটারির দলটা থমকে দাড়ালো, কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক তাকালো তারপর উল্টো ঘুরে যেদিকে থেকে এসেছিল সেদিকে রওয়ানা হলো। আমাদের সবার যেনো ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ালো। এরপর সারাদিন যে কীভাবে আমার মনে নেই। কখন উঠেছি-কখন খেয়েছি কিছু মনে নেই। একেবারে সন্ধ্যায় উঠে আবার ঢাকার পথে রাতের যাত্রা শুরু। বেঁচে থাকার আনন্দটাই অন্যরকম।

দেশপ্রেমী মা : ঠা-ঠা-ঠা, কানের কাছে গুলির আওয়াজে, লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম। কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে বুঝার চেষ্টা করছি কী হচ্ছে। ইতোমধ্যে সহযোদ্ধাদের অনেকেই আমার মতো জেগে উঠেছে। গুলির শব্দ শুনে মনে হলো পাকিস্তান আর্মির আক্রমণ। ব্যক্তিগত অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। ঘর মানে, মাটির ঘর, দেয়ালটা খুব পুরো। ভিতর থেকে ঠিক কোন দিক থেকে শব্দটা আসছে বোঝা কঠিন। আমার সাথের যোদ্ধারাও বেরিয়ে এসেছে। গ্রামের দু/চারজন উদ্বিগ্ন মানুষ আমাদের ক্যাম্পের পাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। প্রথমে যে আশংকা করেছিলাম যে আমাদেরও ক্যাম্পের উপর আক্রমণ হয়েছে, এখন মনে হচ্ছে একটু দুত্তে, ২-৩ মাইল হতে পারে। রাতের নিস্তব্ধতার জন্য এত কাছে মনে হয়েছিল। অনবরত চাইনিজ রাইফেল, এলএমজি-র গুলির শব্দ আসছে।

যে দিনের ঘটনা সেটা হলো রোজার ঈদের দিন পেরিয়ে যে রাত সেই দিবাগত রাতের। গুলির শব্দ আসছে দক্ষিণ দিক অর্থাৎ ইছাপুর বাজারের দিক থেকে। ঐ দিকটায় মায়া ভাই এবং আরও দুই একজনের ক্যাম্প। আমাদের ক্যাম্প হরদি বাজারে। সরাসরি আমাদের ক্যাম্পে আক্রান্ত না হওয়ায় সাময়িক স্বস্তি। এই সময় গ্রামের কিছু লোক এসে খবর দিলো যে ইছাপুরেই আক্রমণ হয়েছে। বর্তমানে যে বিমানবন্দর, সে দিক থেকে একটা কাঁচা রাস্তা সোজা পূর্বদিকে (উত্তরখান-দক্ষিণখানের মাঝ দিয়ে ৪-৫ মাইল আনুমানিক) ইছাপুরার দিকে এসেছে। পাকিস্তান আর্মি সেই রাস্তা ধরেই এদিকটায় এসেছে। আগেই বলেছি, এই এলাকাটাই বর্তমানে

পূর্বাচল প্রকল্প। এর মধ্যেই আব্বাস ভাই, ফেলু ভাই ও আঙ্গুর ভাই এসে উপস্থিত, আমরা চারজন ও গ্রুপের বয়োজ্যেষ্ঠ কয়েকজনকে নিয়ে আমাদের করণীয় কী সে ব্যাপারে আলোচনায় বসলাম সংক্ষিপ্ত আলোচনা, দ্রুত সিদ্ধান্ত হলো:

১। আমাদের ক্যাম্পের গোলাবারুদ সব জঙ্গলের বিভিন্ন যায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে যদি কোনো কারণে আমাদের পিছু হঠতে হয় তবে এই গোলাবারুদ যেনো পাকিস্তান আর্মির হাতে না পড়ে। এই সংকট কাটার পর ঐ সব গোলাবারুদ উদ্ধার করা যাবে। কিছু লোককে এই দায়িত্ব দেওয়া হলো।

আমাদের গ্রুপে তখন লোক সংখ্যা ৩০-৩৫ থেকে প্রায় ১০০ এর কাছাকাছি। অধিকাংশই স্থানীয় ছেলে ও যুবক নতুন যারা সংযোজিত, তাদের আমরা শুধু কিছু নুন্যতম প্রশিক্ষণ এবং গ্রেনেড, রাইফেল চালানো কিছু কিছু শিখিয়েছি কিন্তু তাদের অস্ত্র দেওয়া সম্ভব ছিল না। মূলত তাদেরই এই দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিছু ছেলে রাজাকার বাহিনী থেকে পালিয়ে অস্ত্রসহ আমাদের সাথে যোগ দেয়, সংখ্যা ৩/৪ জন, তাদেরও এই দায়িত্বে সম্পৃক্ত করা হলো।

২। ৭-৮ জন করে ৪টি ভাগে ভাগ হয়ে আমরা গুলির শব্দের উৎসের দিকে রওয়ানা দেবো, এবং গ্রুপ কমান্ডারের সিদ্ধান্তে, যেখানে যেরকম প্রয়োজন সেভাবে পাকিস্তান আর্মির মোকাবেলা করবো।

৩। কিছু ছেলে ক্যাম্পে থাকবে, বিকল্প ক্যাম্প হিসেবে আরও ২টি জায়গা নির্ধারিত করা হলো। যদি কোনো কারণে আমাদের ক্যাম্পটি হাতছাড়া হয় তবে বিকল্প ক্যাম্প গুলিতে আমরা জড়ো হবো।

৪। গ্রামবাসীদের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে বলা হলো এবং শত্রুর ব্যাপারে কোনো তথ্য পেলে সবচেয়ে কাছের মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপকে জানানোর জন্য বলা হলো।

মুক্তিযোদ্ধারা, যারা বাংলাদেশের ভিতরে, শত্রুর বেষ্টনির মাঝে থেকে যুদ্ধ করছে, তাদের মূলত গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনিং এর মূল উদ্দেশ্য হলো "Hit and Run" অর্থাৎ শত্রুকে তরিৎ আঘাত করে দূরে সরে যাওয়া। শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত রাখাই যার মূল লক্ষ্য। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো শত্রুর মনোবলকে ভেঙে ফেলা। আমাদের অস্ত্রের যোগান ও সেভাবেই দেয়া, স্টেনগান যার গুলির কার্যকরী দূরত্ব ৫০ মিটার, শহরের ভেতর, স্বল্প দূরত্বে যুদ্ধের জন্য খুব উপযোগী। এস এলআর যা সিঙ্গল শট অটোমেটিক রাইফেল-যার গুলির কার্যকরী দূরত্ব ৩০০ মিটার তার সাথে যথেষ্ট পরিমাণে গ্রেনেড, বিভিন্ন ধরণের বিস্ফোরক, নানা প্রকার মাইন দেওয়া হয়েছিল যা মূলত বিস্ফোরণের কাজে যেমন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্রিজ, কালভার্ট অথবা এমন স্থাপনা যেটা শত্রু পক্ষকে বিপর্যস্ত করবে তা ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করার জন্য। তাছাড়া আমাদের ট্রেনিং এর স্থায়ীত্ব ৩,৪ বা ৫ সপ্তাহ। এতো অল্প সময়ে অস্ত্র, গোলাবারুদ সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। অতএব অস্ত্র ও ট্রেনিং এর অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আসল পুঁজি ছিল নিরেট দেশপ্রেম, সাহস এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সাহায্য।

মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মূল সরবরাহ লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে জনগণই তাদের থাকা, খাওয়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে আসর ভরসাস্থল ছিল।

অপরদিকে পাকিস্তান আর্মি একটি নিয়মিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী ট্রেনিং এবং অস্ত্র এই দুই দিকেই তারা একটি যেকোনো আধুনিক সেনাবাহিনীর সমকক্ষ। তাদের দুর্বলতা ছিল নৈতিকতা তথা আদর্শগত দিক ও মনোবল।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমি ৮ জনের একটি গ্রুপ নিয়ে ইছাপুরা বাজারের দিকে রওয়ানা হলাম। ভোরের সূর্যের আলো ফুটে উঠছে। শত্রু মোকাবেলায় আমরা সড়ক পথে এগুচ্ছি। মা এর মুখটা ভেসে উঠল, নিশ্চয়ই এখন ফজরের নামাজ শেষে আমার জন্য দোয়া করছেন। মনে মনে বললাম 'মা আরও বেশি দোয়া করো'। তোমার দোয়াই আমাদের সকলের খুব বেশি দরকার। আমাদের ৮ জনের মধ্যে ৫ জনের হাতে এসএলআর। বাকিদের হাতে স্টেনগান, যা দূরের লক্ষ্যবস্তুর উপর গুলি করার ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে না। পুরো জায়গাটা জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা। আমরা এগুচ্ছি বালু নদীকে হাতের ডানে রেখে। ঘন্টাখানেক চলার পার আমরা নদীর বাঁকে এমন যায়গায় পৌছলাম যেখানে নদীর ওপারে ইছাপুরার দিকে যাবার রাস্তা। থেকে থেকে খুব কাছ থেকে গুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ শত্রু খুব কাছে। আমাদের অবস্থান থেকে রাস্তার দূরত্ব আনুমানিক ৭৫ গজের মতো, অর্থাৎ আমাদের রাইফেলের রেঞ্জের মাঝে রাস্তাটা গ্রাম থেকে বের হয়ে চারদিকে নিচু জায়গার মাঝ দিয়ে নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেছে। নিচু জায়গাটায় বর্ষার পানি। মাটি ফেলার রাস্তাটা প্রায় ৬/৭ ফুট উচু। উপর দিকে এক সাথে ৩/৪ জনের হাঁটার মতো প্রশস্থ। আমরা জঙ্গলের গাছের আড়ালে একটি ঢিবির পাশে পজিশন নিয়ে প্রস্তুত। এমন সময় শত্রুর দেখা মিললো। দূর থেকে দেখলাম ১৫/২০ জনের পাকিস্তান আর্মির একটি দল মাটির রাস্তার উপর দিয়ে না হেঁটে রাস্তার দুপাশে ঢালু জায়গা দিয়ে অস্ত্র হাতে অনেকটা কুঁজো হয়ে এগুচ্ছে। দূর থেকে মনে হলো ওদের হাতে চীনা এলএমজি এবং রাইফেল। আমার ছেলেদের কাছে কড়া নির্দেশ, আমি প্রথম গুলি করলে তারপর অন্যরা গুলি শুরু করবে। মনে বেশ উত্তেজনা, এই শীতের সকালেও ঘামছি। আমাদের কারও পরনে লুঙ্গি, গেঞ্জি বা হাফ প্যান্ট গেঞ্জি, কোমরে গামছা দিয়ে গুলি বা ম্যাগজিন বাঁধা। পাকিস্তানি গ্রুপের অর্ধেক সৈন্য আমাদের গুলির আওতায়, বাকি অর্ধেক চালুর রাস্তার অপর পারে হওয়ায়, আওতার বাইরে।

টান টান উত্তেজনা। সহযোদ্ধাদের মুখের দিকে একবার চোখ বোলালাম শত্রু নিধনের দৃঢ় প্রত্যয়, মনে মনে বললাম 'সাবাশ'। এর পরই প্রথমগুলি আমার। সাথে সাথে আমাদের অন্য অস্ত্রগুলি গর্জে উঠল। এসএলআর সিঙ্গল শট ফায়ার করে, কিন্তু কী কারণে জানি না আমারটা পুরোপুরি অটোমেটিক হয়ে গেল। গুলির সাথে সাথে দেখলাম ৩/৪ জন লাফ দিয়ে পড়ে গেল, বাকিরা শুয়ে ক্রলিং করে রাস্তার অপর পারে ঢালুতে চলে গেল। কতজন হতাহত হলো বোঝা গেল না (পরে গ্রামবাসীর কাছে শুনেছি যে ৪/৫ জনকে কাঁধে করে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।) আমরা গুলি করে

কিছুক্ষণ থেমে আছি। কারণ অনবরত গুলি চালানোর মতো গুলি আমাদের নেই। এর পরেই শুরু হলো শত্রুর পাল্টা গুলি বৃষ্টির মতো আমাদের মাথার উপর দিয়ে শিষ দিয়ে যেতে লাগলো। আমি কিছুটা আশংকায় কেন না এ ধরণের সম্মুখ সমরে আমাদের ছেলেরা অভ্যস্থ নয়, আতংকিত না হয়ে যায়। দেখলাম গ্রামের এই সাধারণ ছেলেগুলি দেশপ্রেমে ও মনের জোরে নিজেদের ছাড়িয়ে নিজেরাই অনেক উপরে উঠে গেছে। তারপরই আমার আপন ভাবনায়ই আমার নিজের ভূল ভাঙলো। এরাতো সাধারণ কোনো যোদ্ধা নয়, এরা মুক্তিযোদ্ধা। অসাধারণ দেশপ্রেম ও দায়বোধ থেকে এরা খেয়ে না খেয়ে যুদ্ধ করছে। দেশমাতার ঋণ শোধ করতে গিয়ে দেশকেই ঋণী করছে। প্রত্যাশা স্বাধীনতা, সাধারণ জনগণের ন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা। অন্য কোনো কিছু প্রত্যাশায় নয়। ব্যক্তিগত কোনো প্রত্যাশার তো প্রশ্নই উঠে না। আজ, স্বাধীনতার এতোদিন পর এসব ভাবলে ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

আবার মূল প্রসঙ্গে, থেকে থেকে গুলি পাল্টা গুলি চলছে। এক সময় বুঝলাম শত্রু পক্ষ ক্রলিং করে পিছন হটে গ্রামে ঢুকে পড়েছে, তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। আমরা কিছুক্ষণ পজিশনে থেকে ক্রলিং করে পিছনে ঢিবির আড়ালে নিরাপদ জায়গায় এসে বসলাম। বুঝিনি এতটা সময় পার হয়ে গেছে। বেলা প্রায় ১০/১১ টার মতো হবে। অপর দিকে পাকিস্তান আর্মিও ছোট ছোট গ্রুপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গ্রামের ভিতরে আছে। পরে শুনিছি ওরা সংখ্যায় প্রায় ১০০ জনের মতো ছিল। শুরু হলো ইদুর বিড়াল খেলা। আড়াল আবডাল থেকে কখনও আমরা গুলি করছি কখনও ওরা গুলি করছে।

তখন দুপুর ২টা বা ৩টা। ক্লান্ত, পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা, যুদ্ধের উত্তেজনায় মনেই ছিল না সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয় নাই। গাছের নিচে বসে আমরা কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছি। কিছুক্ষণের জন্য আত্মচিন্তায় মগ্ন, ভাবছি মায়ের কথা, বাবার কথা, ভাইবোনের কথা, আমার চার বছরের কনিষ্ঠ সবচেয়ে ছোট বোন নমিতার কথা সম্ভবত তখন ক্লাস সেভেন এর ছাত্রী। ভাবছি, সব বারের মতো কি এবার ঈদের রান্না হয়েছে? আমার মা কি আমার প্রিয় ডিমের হালুয়া রান্না করেছেন? রান্না করলে নিশ্চয়ই চোখের জলে আমার জন্য আলাদা করে তুলে রাখবেন, কখনও খাব বলে। আমার মতো তো অন্য সব সহযোদ্ধাদের একই অবস্থা। বাঙালির জীবনে এতো নিরানন্দের ঈদ আর একটিও হয়েছে কীনা বা হবে কীনা জানি না। কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ করে এক বৃদ্ধার ডাকে ফিরে এলাম বর্তমানে। যে ঘটনা বলার জন্য এত কিছুর অবতারণা। আমার অলৌকিকতায় বিশ্বাস বরাবরই কম কিন্তু এ ঘটনাটি আমার কাছে এখনও অলৌকিক মনে হয়। বৃদ্ধার বয়স সম্ভবত ৫০ এর কোঠায়, গ্রামের মহিলা, আরও বয়স্ক হতে পারে। দৌড়ে আমার দিকে আসছেন আর বলছেন "বাজানরা তোরা একটু খাইয়া ল, খাইয়া যুদ্ধ কর"। একি? যেখানে গোলাগুলি চলছে, যেখানে অন্য কোনো মানুষ নেই, সেখানে ইনি হঠাৎ কোথা থেকে? জানি, কিছু বসতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই বনের মাঝে

আছে, কিন্তু সবার তো নিরাপদ জায়গায় চলে যাবার কথা। বৃদ্ধা কীভাবে বুঝলো আমরা এতো ক্ষুধার্থ? কীভাবে আমাদের অবস্থান জানলো? আঁচলের নীচ থেকে দুটো গামলা বের করলো, একটাতে ভাত ও আরেকটাতে রান্না করা মুরগি (তার নিজের ঘরের মুররি রান্না করে নিয়ে এসেছেন)। নিজেই ভাতের মাঝে মুরগি ঢেলে মাখিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, আমরা চরম ক্ষুধার্থ কয়েকজন, পরম তৃপ্তির সাথে ভাগাভাগি করে খেলাম। ভাবছি, বিধাতা এই অল্প বয়সে তুমি আর কত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা আমাকে দেবে? আজ প্রায় ৩৮ বছর পরও বৃদ্ধা আমার স্মৃতিতে এখনও অম্লান। স্বাধীনতা কি তাকে কিছু দিতে পেরেছিল? এসকল অসাধারণ মানবিক গুণাবলি দেখে, মানবিক অভিজ্ঞতার মখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো আমরও মনে হয়েছে "সাথর্ক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।"

ঢাকা শহর, কিশোরী বোন - আমি ও আমার এক বন্ধু

ঢাকা শহরে অপারেশনের ইচ্ছা। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অস্ত্র-যা আমাকে আমাদের মূল ক্যাম্প হরদি বাজার থেকে আনতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি ঢাকা শহর বেশ কয়েকবার ঘুরে গেছি। ঢাকা শহরে আসার জন্য আমি দুটি পথব্যবহার করতাম এটি গুলশান ২ নং মার্কেট দিয়ে বর্তমান বারিধারায় যাবার পথ, আরেকটি গোড়ান বাজারের। পথ প্রথমটিতে, অর্থাৎ তখন গুলশান লেকের উপর ব্রিজ ছিল না। ছিল খেয়াঘাট। ওপারে বাড্ডা গ্রাম, ছাড়া ছাড়া বাড়ি, লেক পাড় হতে হতো নৌকা করে। লেকটা বেশ বড়, পার হবার পর মোটামুটি মুক্ত এলাকা অর্থাৎ পাকিস্তান আর্মির দখলের বাইরে। যতদূর মনে পড়ে, পায়ে হেঁটে বেশ কিছুদুর যেতে হতো তার পর খালে নৌকা ধরে হরদি বাজার।

কিন্তু গুলশানের দিকটায় নৌকা ঘাট পেরিয়ে উপরে উঠলে পাকিস্তান আর্মির চেক পোস্ট। গুলশান ২ নম্বর মার্কেটটি তখন একতলা ছিল। গুদারা ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলে ৩/৪ টি বাড়ির পর একটি আধা নির্মিত বাড়িতে আর্মি ক্যাম্পের অবস্থান। বাড়িঘর বেশির ভাগ খালি(গুলশান মূলত অবাঙালিরা থাকতো)। লেক পার হবার একটিই রাস্তা। এই ক্যাম্পে আমাকে একবার পাকিস্তান আর্মি সন্দেহ করে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আটকিয়ে রেখেছিল। অনেক দোহাই/অজুহাত দিয়ে (বাংলা, উর্দু মিলিয়ে) পকেটে রাখা জাল আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে (আর্মির ভাষায় 'ডান্ডি' কার্ড) এবং যথারীতি মূছলমানিত্বের প্রমাণ দিয়ে ছাড়া পেতে হয়েছিল। তার ওপর অনেকখানি হাটা পথ। সংগত করণেই অস্ত্রনিয়ে এ পথে ঢাকায় আসাটা আমার যুক্তিসংগত মনে হয়নি। অপরদিকে, গোরান বাজারের দিকে নৌকা নিয়ে ঘাট পর্যন্ত পাওয়া যায়। ঘাটে না ভিড়ে অন্য যে কোনো বাড়ির পিছনের অঙিনার নৌকা ভেড়ানো যায়। শত্রুর একটি ক্যাম্প আছে, তবে কিছুটা পথ ঘুরে গেলে সেটা পরিহার করা যায়। আরেকটি ক্যাম্প হলো মালিবাগ মোড়ের কাছাকাছি। গোড়ান বাজার থেকে বেরোনোর পথ তখনকার সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্ট স্কুলের সামনে দিয়ে। সব কিছুর বিবেচনায় এই পথটাই আমার কাছে শ্রেয়।

এই পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছি, তখন খবর পেলাম আমার ক্যাডেট কলেজের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু সফিকুর রহমান কোনো কারণে পাকিস্তানে মিলিটারি একাডেমী থেকে পালিয়ে এসেছেন। ভাবলাম আমাদের এরকম ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকজনের প্রয়োজন। তার সাথে পল্টনে তার বাসায় গিয়ে যোগাযোগ করে একথা সেকথার পর আমাদের বাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করলাম। উনি ওনার কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে আমদের দলে পুরোপুরি যোগ দিতে পারলেন না তবে ঢাকায় যে কোনোরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেটাও কম মনে হলো না। আমার অস্ত্র আনার কাজে গোড়ান থেকে গন্তব্য স্থানে যাবার জন্য একটি গাড়ি প্রয়োজন। তিনি গাড়ি চলাতে পারেন, তবে তিনি একদিন সময় চেয়ে নিলেন। পরের দিন দুজন ছেলে, ১৯-২০ বছরের হবে, সাথে নিয়ে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত স্থানে এলেন। পরিচয় পেলাম ওরা দুই জমজ ভাই। সফিকুর ভাইয়ের পড়শী এবং গাড়িটি ওদের তবে সফিকুর ভাই চালাবেন। আমার জন্য বিরাট এক সহায় হলো। আমি আশ্চর্য যে এতো বড় একটা ঝুকিপূর্ণ কাজে সহায়ক হতে ওদের কারও কোনো দ্বিধা নাই। মনে মনে দিন তারিখ ঠিক করে আমি পর পর ৩ দিনের সময় দিলাম। বললাম এই ৩ দিনের যে কোনোদিন আমি আসতে পারি এবং ওরা অবশ্যই যেনো কথামতো প্রস্তুত থাকে। ফিরে এলাম ক্যাম্পে। শুরু হলো গোছ গাছ, পুরো কাজটা আমি একার দায়িত্বে করছি। অস্ত্র গোলাবারুদের একটি লিস্ট তৈরি করে ফেললাম। অস্ত্র বিস্ফোরক এবং মাইনের তালিকা এমনভাবে বানালাম যা ঢাকা গরম করার জন্য যথেষ্ট। নির্ধারিত দিনে খুব সকালে বিছানার চাদরে বোচকার মতো করে বেঁধে রওয়ান হলাম যাতে সকাল ৯টা-১০ টার মাঝে গোড়ান পৌছতে পারি। নৌকা ঘাটে না ভিড়িয়ে অন্যদিকে এক বাড়ির পিছনে ভিড়ালাম। কিছুটা ডাকাডাকির পর মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এলেন, সম্ভবত বাড়ির কর্তা। বললাম বোচকাটা কিছুক্ষণের জন্য তার বাসায় রাখতে হবে। বোচকায় ভিতর কী আছে বললাম না, উনিও জিজ্ঞাসা করলেন না। ওনার যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন, সাগ্রহে বললেন, কোনো চিন্তা করার জন্য এবং আমি যখন আসবো ততক্ষণ উনি থাকবেন আমাকে আমার বোচকা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। বোচকাটা বেশ ভারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা খুব এক আশ্চর্যের ব্যাপার। কোনো পূর্ব পরিচয় নেই, পূর্ব সুত্র নেই। নির্দ্বিধায় উনি এই মারাত্মক ঝুঁকি নিলেন আর আমরাও নিশ্চিত যে এই সহায়তা আমরা পাবো। এটাই গেরিলা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য, মানুষের মাঝে থেকে তাদের সম্পৃক্ততায় তাদের জন্য যুদ্ধ করা। এইটাই প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ, এরই নাম জনযুদ্ধ।

একটি রিক্সা নিয়ে রওয়ানা হলাম পল্টনের উদ্দেশ্যে সফিকুর ভাইয়ের খোজে। প্রথমে হোঁচট খেলাম মূল রাস্তায় এসে, দেখি সেন্ট্রাল গভ: স্কুলের মুখে আর্মি একটি নতুন চেক পোস্ট বসিয়েছে। ২/৩ জন আর্মি ও ২/৩ জন মিলিশিয়া নিয়ে। মাঝেমাঝে গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষা করছে। গোড়ান বাজার থেকে বের হবার এই একটাই পথ, রিকসা চলছে আর আমার মাথায় দ্রুত ভাবনা কী করি, ফিরে যাবো? না, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। ফেরা যাবে না, পরিকল্পনা অনুযায়ী সফিকুর ভাই প্রস্তুত ছিলেন। সেই

দুই ভাইয়ের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে সফিকুর ভাইকে নিয়ে আমি বাসায় (মগবাজার) চলে এলাম, বাসায় ঢুকেই আমার ছোটবোন নমিতাকে (বর্তমানে স্কুল শিক্ষিকা ও ডাক্তার গিন্নি)- যার কথা আগে প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছি- বললাম একটি শাড়ি পরে আসতে, আমার সাথে যেতে হবে। তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্রী, বয়স ১১-১২ হবে। আমার উদ্দেশ্য শাড়ি পরিয়ে, মহিলা বানিয়ে যদি গাড়িতে ওকে নিয়ে যাই তবে হয়তো পাকিস্তান আর্মি চেক পোস্টে না-ও থামাতে পারে। বলার সাথে সাথে কোনো রকম প্রশ্ন না করে সে শাড়ি পরতে গেল। একবারও জিজ্ঞেস করলো না কেন এবং কোথায় যাবে। ঐ ছোট বয়সে ও দেশপ্রেমের কী বুঝতো? তবে কি এই মুক্তিযুদ্ধের কারণে আমাদের দেশের কিশোর, কিশোরী থেকে বৃদ্ধ সবাই একটি অন্য স্তরে চলে গিয়েছিল? এ প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর উক্তি আমার খুব মনে ধরেছিল, উক্তিটি এরকম "মুক্তিযুদ্ধের সময়টা এমন ছিল যে আমাদেরও কেউ কেউ নিজেদের মহামানবে পরিণত করেছিল আবার কেউ কেউ দানবে পরিণত হয়েছিল।" খুবই সঠিক উক্তি। দানব বলতে এখানে বাঙালি বিশ্বাসঘাতকদের বুঝিয়েছিল। ফিরে আসি ঘটনায়, ইতোমধ্যেই আমার মা চলে এসেছেন। উনি ধারণা করে ফেলেছেন যে নিশ্চয়ই আমি সাংঘাতিক কোনো বিপদজনক কাজে যাচ্ছি, তার প্রবল আপত্তি, কিছুতেই রাজী করানো যাচ্ছে না, কীভাবে রাজী হবেন? নিজের ছেলেকে নিয়ে সব সময় শঙ্কা ও আতংক, তার উপর তার বাচ্চা মেয়েকে কীভাবে দেবেন। শত হলেও মা। এর মাঝেই আমার গলা শুনে আমার মেঝো বোন, আমার বড়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় ১ম বর্ষের ছাত্রী (দুরারোগ্য ব্যধিতে উনি প্রয়াত, আমার খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব)। গড়নে এবং চেহারায় চোখে পড়ার মতো সুন্দরী। উনি এসে বললেন যে নমিতা নয় উনি যাবেন আমার সাথে। একি বিপদ আমার জন্য। ক্রান্তিকালে দেশের জন্য কি জীবনের মায়া এতই তুচ্ছ হয়ে যায়? সঙ্গত কারণেই বড় বোনকে সাথে নেওয়ার পক্ষপাতি আমি নই। এর মাঝে আমার ছোটবোন শাড়ি পড়ে হাজির। বড়বোন আসাতে আমার সুবিধা হলো যে মা আর ছোট বোনের ব্যাপারে বেশি আপত্তি করলেননা। আমরা এসে রাস্তায় অপেক্ষারত গাড়িতে উঠলাম এবং সোজা গোড়ান বাজার। এর মাঝেই প্রায় ৩ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। আমার বোন ও সফিকুর ভাইকে মূল রাস্তার রেখে আমি আমার বোচকা সংগ্রহ করতে গেলাম। রাস্তা থেকে দূরত্ব প্রায় আধা মাইল। গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আমার জন্য একইভাবে অপেক্ষা করছেন। যেহেতু বোচকাটা ভারী সাথে একজনকে দিলেন গাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিতে।

গাড়ির পিছনে মাল রাখার জায়গার বোচকা বিছিয়ে রাখলাম, শুধু ১টি স্টেন গান সাথে ২টি ম্যাগজিন আমার পায়ের কাছে রাখলাম, সফিকুর ভাই গাড়ি চালাচ্ছেন, উত্তেজনায় প্রচুর ঘামছেন, সামনে শাড়ি পরিহিত আমার ছোট বোন পিছনে স্টেনও আমি। ধীরে ধীরে আমরা চেক পোস্টের দিকে এগুচ্ছি। ঢাকার বাইরে প্রবেশের চেক পোস্টগুলিতে কড়াকড়ি একটু বেশি, শহরের ভিতরে তত নয়। যত আমরা চেক পোস্টের কছাকাছি হচ্ছি তত আমার উত্তেজনা বাড়ছে। আমি স্টেন গানটা 'কক' করে

নিলাম, যদি বাধা আসে তবে এসপার ওসপার কিছু একটা করতে হবে। জীবিত কিছুতেই ধরা পরা যাবেনা। আমার ছোট বোন সামনে, হয়তো এর কিছুই বুঝছে না। তারপর এল সেই সময়, আমরা তাদের সন্দেহে পরলামনা, উকি দিয়ে আমাদের দেখলো কিন্তু কিছু বলল না। মাথার থেকে বিরাট ভার নেমে গেল। আমার 'মা' কে তার মেয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা চলে এলাম পল্টনে গাড়ির মালিক দু'ভাইয়ের কাছে। এখন সমস্যা, জিনিষগুলি কোথায় রাখি। দু'ভাই নিজেদের মাঝে কী আলাপ করে আমাকে অবলীলাক্রমে বললো কোনো চিন্তা না করতে। গাড়িটাকে এভাবেই গেরেজে ঢুবিয়ে রাখবে, তাদের আরেকটা গাড়ি আছে এবং এ গাড়িটা কেউ ব্যবহার করে না এবং আমি যখনই আসবো, তখনই আমার জিনিষ নিয়ে যেতে পারবো। আপাতত সমস্যার সমাধান, ভবিষ্যতেরটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে। এখন মনে হয়, মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি এরা পায়নি, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে কোনো অংশে এরা কম? দেশপ্রেমে এরা অনেকেই আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। (অস্ত্র যখন ঢাকার এনে রাখি সেটা নভেম্বরের শেষ দিক। দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি ব্যবহার করা সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি। ৩রা ডিসেম্বর থেকে পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে যায়)

কলম ধরার আগে ভেবেছিলাম লেখার ব্যাপারটা কঠিন, লিখতে গিয়ে দেখলাম আরও কঠিন। ৩৮/৩৯ বছরের আগের ঘটনা বেশ মনে আছে, কিন্তু নাম, সময়, পরিসংখ্যান এগুলিতে গোল বাধে। কিছুটা ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে। সেই ইছাপুরার যুদ্ধে আমরা এক সহযোদ্ধাকে হারিয়েছিলাম। খবরটা আমি সে দিনই সন্ধ্যায় জানতে পারি। বাংলাদেশের ভেতর থেকে সে যোগ দিয়েছিল, অসম সাহসী ছেলে। আমার এ লেখাটি আমি আমার সেই সহযোদ্ধার স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করছি। আরও উৎসর্গ করছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যাদের উদ্দেশ্যে এই লেখা। মনে রেখো এই বাংলাদেশটা আমাদের, মুক্তিযোদ্ধাদের, যেখানে গোটা বাঙালি জাতি যোদ্ধা, গুটিকয়েক বাদে। ধর্মের বাণিজ্যের জন্য, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য আমরা যুদ্ধ করিনি, দেশ স্বাধীন করিনি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই চেতনা নিয়ে তোমরা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবেই আমাদের এই যুদ্ধ, একটা জাতির এই অপরিসীম ত্যাগ সার্থক হবে।

বিলোনিয়ার যুদ্ধ এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ ও কবরের সন্ধানে.....

গোলাম মুস্তাফা

শহীদ হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ, বীর বিক্রম। উচ্চতা ছ'ফুট। গায়ের রং ফর্সা। পেটানো শরীর। বন্ধু-বান্ধব সহ গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা আর ধুম আড্ডা তার জীবনের বৈশিষ্ট্য। প্রতিযোগিতামূলক প্রতিটি খেলা-ধূলাতেই সে প্রথম। এয়ার আহাম্মদ আর আমি একই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমরা পড়তাম ফেনী জেলার ফুলগাজী থানার মুন্‌শির হাটে অবস্থিত আলী আজম হাই স্কুলে। কী কারণে জানিনা, অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো এয়ার আহাম্মদ। পড়াশুনা আর হলোনা। "ভর্তি" হয়ে গেলো আর্মিতে। চলে গেলো পশ্চিম পাকিস্তানে। সে ১৯৬৬ সালের কথা। তারপর থেকে প্রায় পাঁচ বছর তার সাথে আর কোন যোগাযোগ নেই।

১৯৭১ সালের জুলাই মাস। ভারতের পালাটালা ট্রেনিং ক্যাম্প এ আমাদের মিলিটারি ট্রেনিং শেষ হলো। নির্দেশ অনুযায়ী এক কোম্পানি সমান মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি হাজির হলাম রাজনগরে। স্থানটি ভারতের অভ্যন্তরে, বাংলাদেশ সীমানার কাছে, বিনোনিয়া শহরের উত্তর পশ্চিমে। বিলোনিয়া সাব-সেক্টর এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছে এই রাজনগরে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'Shaktiman' নামক ট্রাক থেকে নেমে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তিন সারিতে বিন্যস্ত করে এবং মার্চ করে আমি এগিয়ে যাচ্ছি ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডিং অফিসার মেজর জাফর ইমামের তাবুর দিকে রিপোর্ট করতে। তাবুর কাছাকাছি হতেই দেখি দীর্ঘদেহী এক সৈনিক। ধাম করে এটেনশানের ভঙ্গীতে সেল্যুট করলো অধিনায়ককে। মাটিতে ডান পা ঠুঁকে এতো জোরে সেল্যুট করলো যেন মেদিনী কেঁপে উঠলো, আশপাশের গাছ থেকে কয়েকটি পাখি ভীতিকর শব্দ করে উড়ে পালালো এবং স্যলুটের শব্দ আশে-পাশের পাহাড়ে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তুললো। আমি আমার যোদ্ধাদেরকে নিয়ে দাড়িয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ অধিনায়কের সাথে কথা বলে সৈনিকটি এবাউট টার্ন করতেই দেখি, আরে! এতো আমার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রিয় বন্ধু এয়ার আহাম্মদ! আবেগে ও আনন্দে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম। দু'জনের চোখই অশ্রুসজল।

এয়ার আহাম্মদ ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর ব্রাভো কোম্পানির হাবিলদার।

পাকিস্তানিদের ১৫ বালুচ রেজিমেন্ট এর সাথে মুখামুখি অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করছিলো। বিলোনীয়ার উত্তর-পশ্চিমে বাংকার ও ট্রেঞ্চ খুঁড়ে শক্ত অবস্থান নিয়ে ডিফেন্স গড়ে তুলেছে বঙ্গ শার্দুলরা। উল্টোদিকে ১৫ বালুচের শক্ত ডিফেন্স। মাঝখান দিয়ে কল কল করে বয়ে চলেছে খরস্রোতা মুহুরী নদী।

হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ ছিলো বেপরোয়া রকমের সাহসী। তার কোম্পানি নিয়ে প্রায় রাতেই সে গোপনে শত্রু-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢুকে পড়তো, শত্রুর অবস্থান রেইড করতো, শত্রুর চলাচলের সময় অথবা পেট্রোলের সময় এমবুশ করতো এবং তাদের জান-মালের প্রচুর ক্ষতিসাধন করতো। শত্রুর এলাকায় ঢুকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে চুপিসারে ঘোরা-ফেরা করা এবং এ ধরণের অপারেশন পরিচালনা করে নিরাপদে ঘাটিতে তথা ডিফেন্সে ফিরে আসা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার ছিলো। এসব বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা সে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতো। শত্রুবাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করে মাঝেমধ্যেই ফেনীর আঞ্চলিক ভাষায় বলতো "ফাডাই ফালামু, ছেঁছি ফালামু, যুদ্ধ কারে কয় শালার পুতেরগোরে ভালা করি বুঝাই দিমু" ইত্যাদি। এয়ার আহাম্মদ ছিলো অবিবাহিত। কথায় কথায় একদিন সে বলছিলো "বিয়া করিনো', শাদী করিনো', বাল-বাচ্চা নাই, ফিছু টান নাই, আঁর কিয়ের ছিন্তা! মইল্লে মচ্ছি, বাইন চোতেরগোরে বাঙালির গুল ফিডা আর কেঁচকা মাইর কারে কয় হিয়েন ভালা করি বুঝাই দিমু।"

আমরা, পাইওনিয়র প্ল্যাটুনের যোদ্ধারা ছিলাম ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর হেডকোয়ার্টার কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত। অধিনায়কের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো আমাদের কার্যক্রম এবং অপারেশন। আমাদের প্লাটুনের প্রায় সবাই ছিলো ছাত্র। অধিনায়কসহ ব্যাটেলিয়নের পেশাদার সৈনিকগণ আমাদেরকে খুবই স্নেহ করতেন। প্রতিরক্ষা লাইনের সর্বত্রই আমাদের যাতায়াত ছিলো তাই অবাধ।

ডিফেন্স লাইনের সন্নিকটে কালিকাপুর গ্রাম। এ গ্রামের বটতলী বাজারের পশ্চিম পাশে মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরি একটি বাড়িতে আমরা থাকি। যুদ্ধের ধাক্কায় বাড়ির লোকজন ভারতে চলে গিয়েছিল। একদিন বিকেলে হঠাৎ সেখানে এয়ার আহাম্মদ এসে হাজির। গাল-গল্প ও ধুম আড্ডার এক পর্যায়ে আকাশ কালো করে মুসলধারে বৃষ্টি নামলো। সাথে আর্টিলারি শেলের মতো প্রচণ্ড শব্দের বজ্রপাত আর বিজলীর চমক। সূর্যাস্তের সময় বৃষ্টি থামলো। আমরা এয়ার আহাম্মদকে একটু এগিয়ে দেবো বলে তার সাথে তার বাংকারের দিকে এগিয়ে চললাম। পুরনো দিনের একটি পুকুরের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালো। ততোধীক চমকে উঠলাম আমরা। দেখি, পুকুর থেকে শত শত কই, মাগুর এবং টাকি মাছ সদলবলে বের হয়ে আসছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কোথায় তাদের গন্তব্য, কেনইবা নিজ আবাসভূমি ছেড়ে তাদের এ অভিসার তা এক অজানা রহস্য। যাক, সবাই মিলে মাছ ধরা শুরু করলাম। এতো তাজা এবং ইয়া বড় সাইজের কই-মাগুর জীবনে আমরা বেশি দেখিনি। ধরতে ধরতে আমাদের হাত যেমন রক্তাক্ত হলো, সকলের লুঙ্গির

কোঁচাও তেমনি হলো পূর্ণ। কিন্তু এ মাছ দিয়ে আমরা করবোটা কী? এখানেতো রান্না করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। পেছনে, অনেক দূরে একটু মিট মিট আলো নজরে এলো। সকলকে নিয়ে উল্টো পথে সেদিকেই রওনা দিলাম। গিয়ে দেখি ছোট্ট একটি কুড়ে ঘরে এক বৃদ্ধা বসে মাছ ধরার জাল বুনছে। বৃদ্ধাকে আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম এবং তার ঘরে পাওয়া একটি 'লাইয়ে' সব মাছ রেখে মাছগুলো গ্রহণ করতে তাকে বিনীত অনুরোধ করলাম। বৃদ্ধা দাঁতবিহীন মুখে ফোকলা হাসি হেসে খুশি মনে তাতে রাজী হলো। তবে এক শর্তে। শর্তটি হলো কিছু মাছ উনি এখন রান্না করবেন এবং আমাদেরকে তা খেয়ে যেতে হবে। আমরা মহানন্দে রাজী। কিন্তু কাপড় চোপড় আমাদের নোংরা হয়ে আছে। বুড়ি তার পুরনো শাড়ি ও বিছানার চাদর আমাদেরকে দিলেন। আমরা কাপড় বদল করলাম এবং চৌবাচ্চার পানিতে আমাদের ময়লা কাপড় পরিষ্কার করলাম। বড় বড় মাছগুলো নিয়ে উনি পাক শুরু করলেন। বৃদ্ধা খুবই দরীদ্র। ঘরে চাল খুবই কম। তবুও উনি একটু খানি ভাতও পাক করলেন। গোল হয়ে আমরা খেতে বসলাম। সে যে কী অপূর্ব স্বাদ এবং কী তৃপ্তির সাথে তা আমরা খেলাম তা আজ কিছুতেই ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। খাওয়া-দাওয়ার পর বৃদ্ধা তার কাছে থাকা সামান্য পান কাঁচা শুপারী দিয়ে ছোট ছোট খিলি বানিয়ে আমাদেরকে দিলেন। হৃদয়ের ছোঁয়া লাগানো সে পান খেতে খেতে জানা গেলো, বৃদ্ধার ছেলে এবং স্বামীকে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে। তাদের আর কোনো খোঁজ নেই। বৃদ্ধা একা, অসহায়। স্বামী সন্তান ফিরে আসবে—এ আকুল আশা নিয়ে কাটে তার রাত দিন। পরিবেশটা বিষাদময় হয়ে গেলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। কেরোসিনের কুপির মৃদু আলোর শিখা থিরথির করে কাঁপছে। এয়ার আহাম্মদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলো। চাপা গলায় বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললো—'মা, এ হারামীর বাচ্চাদেরকে আচ্ছা তরফ্‌সে বাংলার মাটিতে আমরা জনমের শিক্ষা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। তুমি আমাদের জন্য একটু দোয়া করো।" আমাদের দিকে ফিরে বললো—"যুদ্ধে যদি মরেই যাই, তাহলে আমাকে তোরা ওদের দখলে থাকা পাকিস্তানের জমিতে বা ভারতের জমিতে কবর দিবি না। আমি স্বাধীন বাংলার মাটিতে কবর চাই। কথা দে আমার ইচ্ছা পূরণ করবি?" কারো মুখে কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ পর আমি বললাম—"কথা দিলাম"। "গেলাম" বলে বৃদ্ধাকে পায়ে ধরে সালাম করে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিকশ কালো অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেলো আমার প্রিয় বন্ধু হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ।

এরপর বেশ কিছু দিন চলে গেছে। ইতিমধ্যে প্রায় প্রতিদিনই পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের ছোট খাটো সংঘর্ষ লেগেই ছিলো। কিন্তু নদীর দুই পাশে উভয় পক্ষেরই বাংকার সহ শক্ত অবস্থান থাকায় এসব সংঘর্ষে কোনো পক্ষেরই বড় রকমের ক্ষতি হয়নি। উভয় পক্ষের ডিফেন্স লাইনের মাঝখান দিয়ে খরস্রোতা মুহুরী নদী প্রবাহমান ছিলো বলে কেউ কাউকে সরাসরি আক্রমণ করতে পারছিল না। এ পরিস্থিতির অবসান প্রয়োজন। পাকিস্তানের ১৫ বালুচ ও ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স

রেজিমেন্টের সাথে আমাদের একটা বুঝাপড়া হয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু কীভাবে? ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সহ সহযোগী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এক ধরণের অস্থীরতা লক্ষ্য করলাম। সেপ্টেম্বর চলে গেলো। এসে গেলো অক্টোবর। মুহুরির পানির গভীরতা এবং স্রোতের তেজ কমে গেছে। কিন্তু মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের আনাগোনা বেড়ে গেছে। ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ, মেজর হায়দার এবং মিত্র বাহিনীর ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের জি.ও.সি. মেজর জেনারেল আর. ডি, হীরা যখন তখন আসছেন এবং যাচ্ছেন। মে. জে. আর. ডি. হীরা 'রকী হীরা' নামেই অধীক পরিচিত। বুঝতে পারলাম, নতুন কোনো পরিকল্পনা সহ কিছু একটা হতে যাচ্ছে। আমি ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের সি.ও. মেজর জাফর ইমামের ষ্টাফ অফিসার, খুবই আস্থাভাজন এবং স্নেহের পাত্র। অথচ বুঝতে পারলাম, অতি স্পর্শকাতর কোনো একটা পরিকল্পনা অতীব গোপনীয়তার সাথেই প্রণীত হচ্ছে যা আমারও জানা উচিত নয়।

ইতিমধ্যে লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফের নির্দেশে রাঙ্গামুড়া সাব-সেক্টর কমান্ডার লে. ইমাম উজ-জামান এবং সালদা নদী সাব সেক্টর থেকে সে.লে. দিদার আতোয়ার হোসেন তাদের নেতৃত্বাধীন সৈনিকদেরকে নিয়ে রাজনগরে আসেন এবং মেজর জাফর ইমামের নিকট রিপোর্ট করেন। তাছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার আয়োজিত ট্রেনিং শেষ করে মুক্তিবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত প্রথম ব্যাচের মধ্য হতে সে.লে. মিজানুর রহমানও সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জাফর ইমামের নিকট রিপোর্ট করেন। উল্লেখ্য যে, এর আগে মেজর জাফর ইমামের সাথে একমাত্র ক্যাপ্টেন মোখলেছুর রহমান, ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম এবং ফেনী কলেজের ইউ.ও.,টি.সি.র ক্যাপ্টেন মজিবর রহমান খান ছাড়া কোনো অফিসার ছিল না। আরো উল্লেখ্য যে, সে. লে. দিদার ও লে. ইমামের অধীনস্থ বেশির ভাগ সৈনিকই ছিল বিভিন্ন বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর অবসারপ্রাপ্ত, ছুটিতে থাকা অথবা পালিয়ে আসা সৈনিক এবং সাবেক ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস তথা ই.পি.আর. এর বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিক। এদের সকলকে নিয়ে বিভিন্ন প্লাটুন কোম্পানি এবং কমান্ড স্ট্রাকচার পুনর্বিন্যাস করে মেজর জাফর ইমাম ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন। আলফা কোম্পানির দায়িত্ব পেলেন লে. ইমাম, ব্রাভো কোম্পানির দায়িত্ব দেয়া হলো সে.লে. মিজানকে, চার্লি কোম্পানির দায়িত্ব পেলেন সে. লে. দিদার এবং ডেলটা কোম্পানির নেতৃত্ব পেলেন ক্যাপ্টেন মোখলেছ। পাইওনিয়ার প্লাটুন সহ হেড কোয়ার্টার কোম্পানির কমান্ড মেজর জাফর ইমাম নিজের হাতে রাখলেন। আমাদের ডিফেন্স হলো আরো মজবুত। আরেকটা তথ্য মনে পড়ছে। এসময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে জেড ফোর্স, এস ফোর্স এবং কে ফোর্স গঠন করা হয়। 'কে' ফোর্স গঠিত হয় ৪র্থ, ৯ম এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমন্বয়ে এবং লে. ক. খালেদ মোশাররফকে এই ফোর্সের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।

অক্টোবরের শেষের দিকে মেজর জাফর ইমাম সকল সেকসান, প্লাটুন ও কোম্পানি কমান্ডারদেরকে নিয়ে এক গোপন বৈঠক করলেন। বৈঠকে উনি শত্রু নিয়ন্ত্রিত ফেনী-বিলোনিয়ার একটি বড় ম্যাপ মেলে ধরলেন। আমাদের চোখের সামনে ফেনী-বিলোনীয়া অঞ্চলটি পরিস্কারভাবে ফুটে উঠলো। ফেনী থেকে বিলোনীয়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এটি ১৬ মাইল লম্বা এবং প্রস্থে ৬ মাইল। এ ভূখণ্ডটির উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে ভারতীয় ভূখণ্ড। মুহুরী ও ছিলনীয়া নদী ভারত সীমান্ত থেকে বের হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। বিলোনীয়া-ফেনী রেল লাইন ছাড়াও বিলোনীয়া-ফেনী ট্রাংক রোড এবং পরশুরাম-ছাগলনাইয়া লিংক রোডটিও ম্যাপের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠলো। মেজর জাফর ইমাম বিভিন্ন ফর্মেশনে পাকিস্তানিদের ডিফেন্স লাইন এবং বাংকারগুলোর অবস্থান সম্পর্কে আমাদেরকে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে বললেন যে, ভবিষ্যৎ আক্রমণের রূপরেখা তৈরীর জন্য আমাদেরকে ভিতরে গিয়ে শত্রুর অবস্থান সরেজমিনে রেকী করতে হবে। রেকী করার ব্যাপারে উনি আমাদেরকে বিস্তারিত ভাবে ব্রিফিং এবং নির্দেশনা দিলেন।

২৭ অক্টোবর ফজরের নামাজের পর থেকে একজন একজন করে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগন সংগোপনে শত্রুর বাংকারগুলোর মাঝখানের ফাঁকা স্থানগুলোর মাঝামাঝি স্থান দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলো। ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা সবাই ভিতরে ঢুকে গেলাম। আমরা সবাই স্থানীয় জনসাধারণ এবং কৃষকদের মতো লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে খালি পায়ে ভিতরে ঢুকছিলাম এবং সাধারণ লোকদের সাথে মিশে গিয়েছিলাম। ফলে পাকিস্তানি সেনারা সন্দেহও করেনি এবং আমাদেরকে চিনতেও পারেনি। স্থানীয় জনসাধারণ এবং কৃষকরা অবশ্য আমাদেরকে চিনে ফেললো। কিন্তু অবাক ব্যাপার, তারা সকলেই আমাদেরকে সঠিক পথে যেতে সাহায্য করলো এবং শত্রুর অবস্থান এবং তাদের সংখ্যা-শক্তি ও অস্ত্র-শক্তির ব্যাপারে ধারণা দিলো। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লুঙ্গী ও গেঞ্জি পরে, মাথায় টুপি লাগিয়ে এবং কোমরে গামছা বেঁধে এই রেকী দলের নেতৃত্ব দিলেন। এছাড়াও তিনি ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য যুদ্ধের সময় কার ইউনিটের অবস্থান কোথায় হবে, কোথায় বাংকার খুড়ে নিজের অবস্থান মজবুত করতে হবে এসব বিষয়ে সবাইকে পরিষ্কার ধারণা দিলেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এতগুলো কমান্ডার সাথে নিয়ে দিনের আলোতে সব দেখিয়ে শুনিয়ে মেজর জাফর ইমাম নীরবে একজন একজন করে আমাদেরকে নিয়ে পূনরায় ডিফেন্সে ফিরে এলেন। পাকিস্তানিরা বিষয়টি সে মুহূর্তে টেরই পেলোনা।

শত্রু এলাকায় ঢুকে শত্রুকে আক্রমণ করা এমনিতেই ঝুঁকিপূর্ণ। তার উপর আমাদেরকে একটি মাত্র ব্যাটেলিয়ন নিয়ে শত্রুর দু'টি ব্যাটেলিয়নের মুখোমুখি হতে হবে। যোদ্ধা ও অফিসারদের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে পাকিস্তানিদের অনুকূলে। এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের শক্তি বৃদ্ধি কল্পে একটি সুসজ্জিত কোম্পানি 'ধার' চাইলেন ২নং সেক্টর কমান্ডার লে.ক. খালেদ মোশাররফ

৩নং সেক্টর কমান্ডার লে. ক. শফিউল্লার নিকট। তৎকালীন সময়ে এ অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন ছিলো। তবুও জুনিয়র টাইগার অর্থাৎ ২ ইস্ট বেঙ্গলের সবচেয়ে সুগঠিত একটি চৌকস কোম্পানি ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মোরশেদ খানের নেতৃত্বে ৩ নং সেক্টর হতে এসে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করলো। কিন্তু ইতোমধ্যেই আমাদের রেকী হয়ে গিয়েছিলো বিধায় ২য় ইস্ট বেঙ্গলের এই কোম্পানিটীর জন্যও রেকীর ব্যবস্থা হলো। ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদ এবং তার সেকশান, প্লাটুন ও কোম্পানি কমান্ডারদের সাথে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের অভিজ্ঞ কয়েকজন সুবাদার ও হাবিলদারকেও গাইড হিসেবে দেয়া হলো। কিন্তু রেকীর শেষ পর্যায়ে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের সুবাদার জাব্বার শত্রুর পোতা মাইন বিস্ফোরণে মারাত্মক আহত হয়। কিছুই বুঝতে না পেরে মাইন বিস্ফোরণের স্থান লক্ষ্য করে শত্রু সেনারা গুলি শুরু করে। আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ডিফেন্স লাইন থেকেও হালকা গোলাগুলি করা হয়। আমরা সবাই ভীষণ টেনশনে পড়ে গেলাম। আমাদের অতিথি কমান্ডারগণ একজন ক্যাপ্টেন সহ শত্রু এলাকায়। কাছের এক বাড়ির দরজা ভেঙ্গে, সেটাকে স্ট্রেচার বানিয়ে, সে স্ট্রেচারে আহত ও রক্তাক্ত সুবাদারকে বহন করে, সঙ্গী কমান্ডারদেরকে সাথে নিয়ে, ক্ষীপ্র গতীতে ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদ ফিরে এলেন আমাদের মাঝে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা।

আক্রমণের দিন হিসেবে ১৯৭১ সালের ৫ নভেম্বরকে বেছে নেয়া হয়। ৫ নভেম্বর সকাল বেলা নির্দেশ মোতাবেক আমরা আমাদের ডিফেন্স এর বাংকার ছেড়ে ভারতের খানিকটা অভ্যন্তরে আমাদের ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারে এসে সমবেত হলাম। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভারতীয় বাহিনীর ডোগরা রেজিমেন্ট আমাদের ছেড়ে দেয়া ডিফেন্স এ পজিশন নেয়। রাজনগরে মেজর জাফর ইমাম আমাদেরকে আসন্ন অপারেশন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ব্রিফিং দিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতের অন্ধকারে পুরো ব্যাটেলিয়নের সৈনিকগণ যার যার কমান্ডারের নেতৃত্বে পশ্চিম দিকের সীমান্ত দিয়ে শত্রুর বাংকারগুলোর মধ্যখানের ফাঁকা স্থান দিয়ে শত্রুর নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢুকে পড়বে এবং চিথলিয়া রেল ষ্টেশনের উত্তর দিক দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে চন্দনা ও সলিয়া হয়ে গুথুমা পর্যন্ত অগ্রসর হবে। পূর্ব সিমান্তে অপেক্ষমান সৈনিকগণ পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢুকে একইভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে গুথুমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসরমান সৈনিকদের সাথে নিশ্চিদ্র সংযোগ স্থাপন করবে এবং পূর্ব পশ্চিম অক্ষ রেখা বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মুখ করে বাংকার তৈরি করে রাতের মধ্যেই দু'মুখো ডিফেন্স তৈরি করবে। তাছাড়া অস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দুই দিকের ডিফেন্স এর মাঝখান দিয়ে যোগাযোগ পরিখা খনন করবে। এতে পরশুরাম ও বিলোনীয়াতে অবস্থানরত শত্রু বাহিনী উত্তর দিকের পকেটে আঁটকা পড়বে, চিথলিয়া-ফুলগাজী-মুনশীর হাট ও ফেনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং যুদ্ধ করে হয় তাদেরকে আমরা

ঘায়েল করবো, অথবা যুদ্ধ করতে করতে গোলা-বারুদ ও রসদ শেষ হয়ে গেলে বা শারিরীক ও মানসিক ভাবে দূর্বল বা হতোদ্যম হয়ে পড়লে আমরা তাদেরকে জীবন্ত পাকড়াও করবো। ভীষণ ঝুকিপূর্ণ এবং অনিশ্চয়তায় ভরা এক পরিকল্পনা-ভাবলাম আমি। দেশমাতৃকার তরে জীবন দান করতে যাচ্ছি বলেই আমার বদ্ধমূল ধারণা হলো। তবে Infiltration এর মাধ্যমে প্রত্যাশিত বিজয় সম্ভবও হতে পারে। এবং সার্থক হলে সামরিক ইতিহাসে তা হবে এক অসাধারণ ঘটনা। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা আমাদের যার যার হাতিয়ার পরিষ্কার করলাম, গুলির ম্যাগজিন থেকে ব্যারেল এর প্রান্ত পর্যন্ত পরিষ্কার করলাম Pull-through দিয়ে। সেকসান, প্লাটুন ও কোম্পানি কমান্ডারদেরকে এই প্রথম ওয়্যারলেস সেট দেয়া হলো। প্রতিটি সৈনিককেই প্রচুর পরিমানে গুলি, HE 36 Hand Granade, extra magzine, মাটিখোড়ার হাতিয়ার সহ প্রয়োজনীয় মাল-সামানা দেয়া হলো। সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল. খালেদ মোশাররফ এবং মিত্র বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সাথে তাবুতে বসে আমাদের সি.ও.মেজর জাফর ইমাম সাহেব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন এবং মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে এসে আমাদের যুদ্ধ-যাত্রা তথা রণ-প্রস্তুতি দেখছেন। জানা গেলো, আক্রমণ এবং যুদ্ধ আমাদেরকেই করতে হবে। তবে মিত্র বাহিনী দূর পাল্লার আর্টিলারী এবং স্বল্প পাল্লার মর্টার সাপোর্ট ছাড়াও সর্ব প্রকারের লজিষ্টিক এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে।

নভেম্বর মাস। শীতের সন্ধ্যা। অথচ গতকাল থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। আজ সকাল থেকে বৃষ্টি নেই, তবে আকাশ মেঘলা। প্রকৃতি যেন থমথম করছে এবং অজানা এক আশংকায় শংকিত হয়ে আছে। সন্ধ্যার সাথে সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদেরকে আজ উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করলো। নিঃশব্দে সবাই খাওয়া-দাওয়া শেষ করলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। রাত আটটায় প্রতিটি সেকসান এবং প্লাটুন সমেত প্রতিটি কোম্পানিকেই অনুপ্রবেশ তথা Infiltration এর জন্য সুশৃংখলভাবে মুহুরী নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যা থেকেই আবার গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো এবং রাত নয়টা নাগাদ মূষল ধারায় ভারী বৃষ্টি নামলো। সাথে বিজলীর চমক এবং আর্টিলারীর শব্দের মতো বজ্রপাত। ভিজে আমরা নাস্তানাবুদ। তবে প্রকৃতির এ রুদ্ররূপ আমাদের অনুপ্রবেশের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হলো। এ যেন ওদের জন্য গজব আর আমাদের জন্য আল্লাহর একটা নেয়ামত ও রহমত।

রাত সাড়ে দশটা। শুরু হলো অনুপ্রবেশ। প্রথমেই সে. লে. মিজানের নেতৃত্বে ব্রাভো কোম্পানির সৈনিকরা ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ শুরু করলো। এর পরপরই সে. লে. দীদারের নেতৃত্বে চার্লি কোম্পানি। চার্লি কোম্পানির পেছন পেছন অনুপ্রবেশ শুরু করে ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদের নেতৃত্বাধীন ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকগণ। এর পরপরই টাস্কফোর্স কমান্ডার মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে পাইওনিয়র প্লাটুন সহ হেড কোয়ার্টার কোম্পানির একটা অংশের অনুপ্রবেশ শুরু হলো। মুহুরী নদীতে

বুক সমান পানি। নদী পার হতেই শত্রু নিয়ন্ত্রিত এলাকা। ১৫ বালুচের দুটি বাংকারের মধ্যখান দিয়ে বিড়ালের মতো নিঃশব্দে, কিন্তু নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে ঢুকে পড়লাম আমরা শত্রুর এলাকায়। ব্রাভো কোম্পানির প্রথম অংশ শলিয়া গ্রাম হয়ে গুথুমা গ্রামের প্রান্তে গিয়ে থেমে যায়। ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বাধীন ১ নং সেক্টরের সৈনিকগণ পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ঢুকে গুথুমা গ্রামে এসে আমাদের ব্রাভো কোম্পানির অগ্রগামী সৈনিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। চলার পথের রাস্তা ছিলো কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। ঝম ঝম করে বিরামহীনভাবে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামছেতো নামছেই। যখন তখন প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পথ চিনে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল হচ্ছে। কিন্তু মাঝে মধ্যেই টর্চের মতো বিজলির চমক পথ চিনতে এবং সঠিক রুটে এগিয়ে গিয়ে ডিফেন্স লাইন গড়ে তুলতে আমাদেরকে মূল্যবান সাহায্য করছিলো। সাথে সাথেই শুরু হলো বাংকার খোঁড়ার কাজ। কাজটি কঠিন। কারণ যতটুকু খোড়া হয় ততটুকুই বৃষ্টির পানিতে ভর্তি হয়ে যায়। সুতরাং দুজনে বাংকার খুঁড়লে বাঁকি দুজনকে পানি সরানোর কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। অমানুসিক পরিশ্রম। শেষ রাতের দিকে মোটামুটি বাংকার ও দুই ডিফেন্সের মাঝখান দিয়ে যোগাযোগ পরিখা খনন শেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মুখ করে দুই সারির পূর্ব পশ্চিমের সাধারণ রেখা বরাবর ডিফেন্স লাইন তৈরি করা শেষ হলো। ৬ নভেম্বর ভোরের আগেই আটকা পড়ে গেলো পরশুরাম ও বিলোনিয়ায় অবস্থানরত শত্রু সেনারা। প্রচণ্ড বৃষ্টি, বজ্রপাত ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে হানাদার বাহিনী তাদের সুরক্ষিত বাংকার থেকে বের তো হলোই না, বরং আরামে রাত্রি যাপন করলো। বুঝতেই পারলো না, তারা ঘেরাও হয়ে গেছে এবং মহা বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে।

আমাদের সৈনিকরা যখন পরিখা খনন করে ডিফেন্স লাইন তৈরিতে ব্যস্ত, আমরা পাইওনিয়র প্লাটুনের যোদ্ধারা তখন আমাদের প্রতিরক্ষা লাইনের দুই দিকের সম্মুখ ভাগে এন্টি পার্সোনাল ও এন্টি ট্যাংক মাইন বসাতে মহা ব্যস্ত। এছাড়া শত্রুসেনাদের সম্ভাব্য আগমন পথে আমরা বেশ কিছু Booby Trapও পেতেছিলাম। বুবি ট্র্যাপ কী? বুবি ট্র্যাপ প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ ধরনের শক্তিশালী এন্টি পার্সোনাল মাইন। একে বলে M-16 Mine. এ মাইনটির আকার এবং Shape অনেকটা আধা কেজি ওজনের মিলক পাউডারের টিনের মতো অথবা আগের দিনের শিশুদের Glaxo দুধের টিনের মতো। ভেতরটা শক্তিশালী বিস্ফোরকে ঠাঁসা। উপরের অংশে ডেটোনেটর ফিট করতে হতো। উপরে আংটার মতো একটা জিনিষ ছিলো যাকে বলে Fuze Hook. এ ছাড়া ছিলো ৪০ গজ লম্বা অত্যন্ত চিকন তার। তারগুলো ছিলো বিভিন্ন রং এর। যেখানে এই মাইন বসানো হবে সেখানকার প্রকৃতি এবং রং এর সাথে খাপ খাইয়ে তার বাছাই করতে হয়। আমরা ধান খেতের জন্য সবুজ এবং রাস্তার জন্য ধূসর রং এর তার আগেই বেছে নিয়েছিলাম। M-16 মাইন মাটিতে পুঁতে তার উপরে থাকা হুক এর সাথে দু'টি সবুজ তার বেঁধে দু'দিকে দুটো তার নিয়ে গিয়ে ৪০ গজ দূরে শক্ত

একটি কাঠি মাটিতে পুতে তার মাথায় টান টান করে তারটি বেঁধে দিতে হতো। এর অর্থ হলো, শত্রু সেনারা আক্রমণের জন্য আমাদের ডিফেন্স এর দিকে আসতে চাইলেই পাতানো তারে হোচট খাবে এবং সাথে সাথেই M-16 মাইনটি বিস্ফোরিত হয়ে তারা তছনছ হয়ে যাবে। M-16 মাইন তথা Booby Trap এর ধ্বংস-ক্ষমতা মারাত্মক। এছাড়াও আমরা ছোট ছোট প্রচুর P-2 প্লাস্টিক মাইন বসিয়েছিলাম। এগুলোকে বলে Non Detectable Anti Personal Mine. প্লাষ্টিকের তৈরি বলে শত্রু পক্ষের Mine Detector এগুলোকে মোটেই চিহ্নিত করতে পারবে না। এ মাইন গুলোর দুটো অংশ, দুটো অংশের মাঝখানে একটি Metallic Plate বা পাঁত থাকে। দুটো অংশ প্যাঁচানো। বাম দিকে ঘুরালে খুলে যায়। খুলে ভেতরে থাকা পাতটা সরিয়ে দিয়ে উপরের অংশটি নিচের অংশের উপর বসিয়ে ডান দিকে ঘুরালেই বিস্ফোরণের জন্য এ মাইন রেডী। খুবই সতর্কতার সাথেই এগুলোকে রেডী করে মাটিতে পূতে Camouflage and Concealment করতে হয়। সামান্য এদিক সেদিক হলে বা অসতর্কতার ফলে একটু চাপ পড়লেই বিস্ফোরিত হয়ে আমরাই আহত বা নিহত হতে পারতাম। তাছাড়া বিস্ফোরণের শব্দ শুনে শত্রু যদি এগিয়ে আসে তাহলে আমরা সহ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের পুরো ব্যাটালিয়ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। শত্রু নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শত্রুর কাছাকাছি অবস্থানে থেকে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, কিনবিলে অসংখ্য জোঁকের মধ্যে কীভাবে সারা রাত স্বার্থকভাবে শত শত Booby Trap, এন্টি পার্সোনাল ও এন্টি ট্যাংক মাইন আমরা সেদিন পুঁতেছিলাম তা আজ এ বয়সে এসে ভাবতেই অবাক লাগে। নিজেকে শ্রদ্ধা করতে, সমীহ করতে, আদর করতে ইচ্ছে হয়।

আমাদের টাস্ক ফোর্স কমান্ডার মেজর জাফর ইমাম স্বয়ং এসে ডিফেন্স লাইন দেখলেন, সন্তুষ্ট হলেন এবং সবাইকে শেষ মুহূর্তের দিক নির্দেশনা দিয়ে সাহস ও উৎসাহ প্রদান করলেন। কথাবার্তা সবই হচ্ছে ফিসফিস করে। সি.ও. চলে গেলেন অনন্তপূরে, তার কমান্ড পোস্টে তথা অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে। কমান্ড পোষ্টটি স্থাপিত হয়েছে ব্রাভো ও চার্লি কোম্পানির মাঝখানে।

চার্লি কোম্পানির ডান দিকে, মুহুরী নদী পার হয়ে নদীর পূর্ব পাড়ে ধনিকুণ্ডা এলাকায় অনুপ্রবেশ করে লে. ইমাম-উজ-জামানের কমান্ডে আলফা কোম্পানি পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে মুখ করে এবং পরিখা খুঁড়ে ইতোমধ্যেই শক্ত অবস্থান নিয়েছে। শেষ রাতের দিকে ডিফেন্স তৈরি করে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর ধীরে ধীরে বৃষ্টি থেমে গেলো। চারদিকে কবরের মতো নিস্তব্ধতা। আমরা সবাই মহা সতর্ক। ওঁত পেতে বসে আছি। সোবেহ সাদেক। পূবের আকাশ ধীরে ধীরে আলোকিত হচ্ছে। মোয়াজ্জিনের আজান এবং পাখির কিচির মিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রস্তুত আমরা।

হঠাৎ দূর থেকে ঢুক ঢুক গুড় গুড় ধরণের শব্দ ভেসে এলো। কিসের শব্দ বোঝা গেলো না। ক্রমেই শব্দটি নিকটবর্তী হলো। এক পর্যায়ে দেখা গেলো যে ফেনীর দিক

থেকে চিথলিয়া রেল ষ্টেশন হয়ে ইঞ্জিন চালিত একটি রেলওয়ে ট্রলি পরশুরামের পথে আমাদের ডিফেন্স লাইনের দিকে এগিয়ে আসছে। টাস্ক ফোর্স কমান্ডার সবাইকে শান্ত থাকতে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ট্রলিটির দিকে আক্রমণ পরিচলনা করতে ব্রাভো কোম্পানির হাবিলদার এয়ার আহাম্মদকে নির্দেশ দিলেন। হাবিলদার এয়ার আহাম্মদের ইউনিটটি রেল লাইন ও ফেনী-বিলোনীয়া রোডের মাঝখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ডিফেন্স তৈরি করে পূর্বেই অবস্থান নিয়েছিলো।

টিক টিক টিক টিক। আমাদের হার্ট বিট এবং ঘড়ির কাটা এগিয়ে চলেছে ক্লান্তিকর ভাবে। এগিয়ে আসছে ট্রলিটি। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে আসছে ট্রলির আরোহীরাও। ৫০ গজ দূরত্বে আসার পর পরিষ্কার দেখা গেলো যে, ট্রলিটিতে পাঁচজন পাকিস্তানি সৈনিক বসে আছে। ফায়ার! মেজর জাফর ইমামের নির্দেশ। মুহূর্তের মধ্যেই হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ এবং তার সৈনিকরা বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু করলো। ট্রলিটি বিধ্বস্ত হলো এবং পলকের মধ্যেই অপ্রস্তুত অবস্থায় সকল শত্রু সেনা নিহত হলো। আশে পাশের বাংকারে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা কিছুই বুঝতে পারলোনা, হয়তো ভেবাচেকা খেয়ে বিষয়টা কী তা বোঝার চেষ্টা করছে।

এদিকে বিজয়ের প্রাথমিক আনন্দে এবং প্রতিক্রিয়ায় হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বাংকার থেকে সে লাফিয়ে বের হয় এবং দৌড়ে গিয়ে নিহত ক্যাপ্টেনের ব্যাজ এবং পিস্তলটি নিয়ে আবার ফিরে আসতে থাকে নিজ বাংকারের দিকে। এয়ার আহাম্মদ যখন বাংকারের একেবারে সন্নিকটে, তখনি শত্রুর এক ঝাঁক গুলি এয়ার আহাম্মদের বাঁ কানের পাশ দিয়ে ঢুকে মাথাটা তার ঝাঁঝরা করে দিলো। এয়ার আহাম্মদ তৎক্ষণাৎ শহীদ হয়ে গেলো। বিলোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রথম শহীদ। পরবর্তীতে ট্রলির চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা শত্রু-সেনাদের একটি রকেট লঞ্চার, একটি স্টেনগান, তিনটি রাইফেল এবং এয়ার আহাম্মদের মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের রিভলভারটি উদ্ধার করা হয়।

হাবিলদার এয়ার আহাম্মদের মৃত্যুতে মেজর জাফর ইমাম খুবই উদ্বিগ্ন এবং শোকাহত হলেন। কেননা অদম্য এবং বেপরোয়া রকমের সাহসী এ হাবিলদারকে তিনি খুবই পছন্দ ও স্নেহ করতেন। এয়ার আহাম্মদের বাংকার সহ আশেপাশের অন্তত পাঁচটি বাংকারে উনি রিজার্ভ থেকে আরো পাঁচজন সৈনিক পাঠালেন। আশে পাশের শত্রু সেনারা আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে এতোক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছে। সুতরাং যে কোনো সময় আমরা প্রতি আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারি। সতর্ক থাকার জন্য, সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্য ফিল্ড ওয়্যারলেসের মাধ্যমে তিনি প্রতিটি সেকসন, প্লাটুন ও কোম্পানি কমান্ডারদের সাথে কথা বললেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন। চারিদিক শান্ত ও চুপচাপ। কিছুই ঘটলোনা। কিন্তু প্রায় মিনিট পঁচিশেক পরে হঠাৎ এয়ার আহমদের প্লাটুনের উপর পাকিস্তানি সেনারা উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক থেকেই সাঁড়াশী আক্রমণ পরিচালনা করলো। তারা

ভেবেছিলো, মুক্তি বাহিনীর একটি ছোট্ট এম্বুস দল তাদের ট্রলিটিকে আক্রমণ করেছে। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে একটি ব্যাটেলিয়ান প্লাস শক্তি নিয়ে আমরা তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছি। এ ভুলের খেসারত তাদের বেশ ভালোভাবেই দিতে হলো। ব্রাভো কোম্পানির সমস্ত ইউনিট একই সময় পাল্টা হামলা চালালে শত্রু সেনারা প্রচুর সংখ্যায় হতাহত হয় এবং বাকি সৈনিকগণ পিছু হটে যায়। আমাদের পাল্টা আক্রমণের সময় 'বি' কোম্পানি ছাড়াও আমাদের পূরা ডিফেন্স লাইন থেকেই মরাল সাপোর্ট হিসেবে হাল্কা গুলি বর্ষণ করা হয়। ফলে পাকিস্তানিরা আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যায়। তাদের পক্ষ থেকে অবশ্য আর কোনো আক্রমণ এলোনা। তারা সম্ভবত পরিস্থিতি মূল্যায়ণ করে বড়ভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করছে। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। যেন একটু আগে কিচ্ছুটি হয়নি!

মনটা আমার খুবই বিষণ্ন। প্রকৃত যুদ্ধ শুরুর আগেই চলে গেলো এয়ার আহাম্মদ। কিছুটা শান্তনাও অবশ্য পেলাম। শত্রু সেনাদের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন, একজন সুবাদার, একজন ল্যান্স নায়েক এবং দুইজন সিপাহীকে খতম করে তবেই বিদায় নিলো সে। হতাহতের হার ১:৫। যুদ্ধের প্রথম ফলাফল আমাদের পক্ষে। ভাবনায় ছেদ পড়লো। খই ফোটার মতো হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হলো। সমগ্র ডিফেন্স জুড়ে দু'দিক থেকেই তারা প্রচণ্ডভাবে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসলো। আমরাও আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছি। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। পাকিস্তানিরা বেপরোয়া। উত্তর দিকের, তথা বিলোনিয়া ও পরশুরামে অবস্থানরত হানাদারেরা যুদ্ধ করছে আমাদেরকে হটিয়ে অবরোধ থেকে বের হয়ে দক্ষিণে গিয়ে তাদের মূল বাহিনীর সাথে মিলিত হতে। আর দক্ষিণ দিক থেকে শত্রু সেনারা আমাদেরকে আক্রমণ করছে আমাদেরকে শেষ করে দিয়ে উত্তর দিকে আঁটকে পড়া তাদের সৈনিকদেরকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। দু'দিক হতে বেপরোয়া এ আক্রমণে আমাদের 'স্যান্ডউইচ' হওয়ার দশা। কিন্তু অদম্য মনোবল নিয়ে আমাদের যোদ্ধারা শত্রুর ভয়াবহ আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলো। গুলির বিরামহীন আওয়াজ। বিপজ্জনক পরিস্থিতি। ইতোমধ্যে ভারতীয় ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের দূর পাল্লার আর্টিলারী গর্জে উঠলো। আর্টিলারী ও মর্টারের গোলার প্রচণ্ড আঘাতের সাথে সাথে আমাদের আক্রমণও তীব্রতর হলো। পাকিস্তানিদের ত্রাহী মধূসূধন অবস্থা। যুদ্ধ কিছুটা আমাদের অনুকূলে এসে গেলো। তবে আক্রমণের গতি ও তীব্রতা অক্ষুন্ন রইলো।

হঠাৎ দুটো কথা মনে পড়ে গেলো। এয়ার আহাম্মদের লাশ কই? তাকে না আমি বাংলার মুক্ত মাটিতে সমাহিত করার ওয়াদা করেছি? আমি টাস্ক ফোর্স কমান্ডার মেজর জাফর ইমামের পাশের বাংকারে। এ মুহূর্তে বাংকার থেকে বের হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও আমি আমার বাংকার ছেড়ে বের হয়ে এলাম। দ্রুত গতিতে ক্রলিং করে কমান্ডারের বাংকারে গিয়ে ঢুকলাম। কমান্ডার মেজর জাফর ইমাম ভীষণ ব্যস্ত।

বাংকারে বসেই উনি পুরো ডিফেন্সের খোঁজ খবর নিচ্ছেন, দিচ্ছেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ। বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ভারতীয় তথা মিত্র বাহিনীকে অনুরোধ করছেন নির্দিষ্ট স্থানে আর্টিলারী ফায়ারের জন্য। মুহূর্তের মধ্যেই মিত্র বাহিনীর মূহুর্মূহু গোলা-বৃষ্টি পাকিস্তানীদের সেই নির্দিষ্ট অবস্থান তামা-তামা করে দিচ্ছে। এক ফাঁকে তাকালেন উনি আমার দিকে। কী ব্যাপার, তুমি এখানে কেন? প্রশ্ন তার। এয়ার আহাম্মদের শেষ ইচ্ছার কথাটা তাকে আমি জানালাম এবং তার লাশ উদ্ধার করে স্বাধীন বাংলার মাটিতে তাকে সমাহিত করার জন্য স্যারের অনুমতি চাইলাম। 'ইমপসিবল! War Field এর সবচেয়ে ভয়ানক আর স্পর্শকাতর স্থানে এয়ার আহাম্মদের লাশ পড়ে আছে। এ মুহূর্তে এ লাশ উদ্ধার করতে যাওয়া আত্মহত্যা করার শামিল হবে। 'Wait!' ব্যস্ত হয়ে পড়লেন উনি আবার। গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ এবং অবর্ননীয় টেনশানের মধ্যেও সময় সুযোগ বুঝে সি.ও.কে আমি বুঝাতে সক্ষম হলাম যে, এ মুহূর্তে আমরা স্থানীয়ভাবে আগে মোতায়েনকৃত শত্রু সেনাদের সাথে লড়ছি। কিন্তু ফেনী এবং কুমিল্লা হতে পাকিস্তানি সেনাদের Reinforcement আসা শুধুই সময়ের ব্যাপার। ওদের আক্রমণ তখন আরো ভয়াবহ এবং তীব্রতর হবে। সে পরিস্থীতিতে এ লাশ উদ্ধারই করা যাবে না। জীবন দিয়ে হলেও এ লাশ এখনি আমি সরিয়ে আনতে চাই, সমাহিত করতে চাই মুক্তাঙ্গনে। প্রিয় বন্ধু ও সহযোদ্ধা এয়ার আহাম্মদকে দেয়া ওয়াদা আমি ভঙ্গ করতে পারবো না। বলতে বলতে আমার গলা ধরে এলো, টপ টপ করে গড়িয়ে পড়লো বেদনাশ্রু। মেজর জাফর ইমাম অপলক তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওকে।'

'থ্যাংক্যু স্যার' বলে ফিরে এলাম আমি নিজের বাংকারে। সহযোদ্ধাদেরকে নিয়ে বসলাম। লাশ উদ্ধারের টেকনিক, লাশ পরিবহন এবং লাশ নিয়ে ফিরে আসার রুট সহ খুটিনাটি যাবতীয় প্ল্যান করে ফেললাম দ্রুত। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুবই রিস্কি হবে–বললাম আমি। আরো বললাম 'এ মিশনে আমার চারজন সহযোদ্ধা চাই।' এয়ার আহাম্মদের লাশ উদ্ধার করতে গিয়ে পুরো টিমেরই লাশ হয়ে যাওয়া প্রায় শত ভাগ নিশ্চিত জেনেও গম্ভীরভাবে রাজী হয়ে গেলো শহীদ, মোশাররফ, সফিক ও মানু। কাল বিলম্ব না করে 'বিসমিল্লাহ' বলে রওয়ানা দিলাম আমরা। দু'পাশে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বাংকার। সবাই যুদ্ধরত, সতর্ক ও ব্যস্ত। ক্রলিং করে দু'দিকের আমাদের বাংকারের সারির মাঝখান দিয়ে পূর্ব দিকে এগুচ্ছি আমরা। গন্তব্য শালিয়া গ্রাম। দু'দিক থেকেই অবিরত গুলি আসছে, 'ক্রস ফায়ার' হয়ে আমাদের সামান্য উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে তা দু'দিকে। মজা পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, উত্তর দিকে অবস্থানরত পাকিস্তানিরা দক্ষিণ দিকে ফায়ার করছে আর দক্ষিণ দিকে অবস্থানরত পাকিস্তানিরা উত্তর দিকে। আমাদের টিম এবং আমাদের ডিফেন্সের উপর দিয়ে চলে গিয়ে সেসব অজস্র গুলি ওদেরই সহযোদ্ধাদেরকে কিছুটা হলেও ঘায়েল করছেই। আমাদের যোদ্ধারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বাংকারে। আমাদের ডিফেন্সের সামনে

বাংকার খুঁড়ে ডিফেন্স তৈরি করার সুযোগই তারা পায়নি। তারা যুদ্ধ করছে জমিনের আইল বা পুকুর পাড়ের আড়ালে থেকে। সুতরাং তাদের ফ্রেন্ডলি ফায়ারে তাদেরই আহত নিহত হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের চাইতে বেশি। কী দারুণ!

দীর্ঘ সময় ক্রলিং করে প্যাঁক-কাদায় একাকার হয়ে 'বি' কোম্পানীর কমান্ডার সে. লে. মিজান এবং নায়েব সুবেদার সেকান্দার আলীর সাথে দেখা করে তাদের দিক নির্দেশনায় আমরা এয়ার আহাম্মদের লাশের পাশে এসে পৌছলাম। বাংকার থেকে এনে তার সহযোদ্ধারা তার মৃত দেহটি পাশের মাটির দেয়াল ঘেরা একটি গুদাম ঘরের মেঝেতে এনে রেখেছে। এয়ার আহাম্মদ শুয়ে আছে উপরের দিকে মুখ করে। ডান চোখ খোলা। বাঁ চোখ ভেদ করে শত্রু নিক্ষেপিত গুলি মাথার পেছনের সামান্য ডান পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঠোঁটটি শক্তভাবে বন্ধ। দুহাতই আছে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায়। গায়ের সার্টসহ শরীর রক্তাক্ত। 'বি' কোম্পানির এক যোদ্ধা এসে এয়ার আহাম্মদের লাশ জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে শিশুর মতো কাঁদছে। তার নাম নূরুল ইসলাম। মুনশীর হাটের দরবারপুর গ্রামের মজুমদার বাড়ির ছেলে। পরে হাবিলদার হিসেবে ১০ বেঙ্গল থেকে সে রিটায়ার্ড করে। সে যাক, নুরুল ইসলাম সহ সকলে মিলে এয়ার আহাম্মদের লাশ আমরা নীচের উঠানে নামিয়ে আনলাম। মোশাররফ, শহীদউল্লাহ এবং সফিক আড়াআড়িভাবে পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। প্ল্যান অনুযায়ী এয়ার আহাম্মদের লাশ তাদের পিঠের উপর উত্তর দিকে মাথা রেখে পিঠ এবং কোমরের মাঝামাঝি স্থানে আড়াআড়িভাবে শুইয়ে দেয়া হলো। আমি সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। একইভাবে মানু পেছনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে ডান-বাম-ডান বলে বলে আমি ফিরতি পথে ক্রলিং শুরু করলাম। লাশবাহী তিন মুক্তিযোদ্ধা একই গতিতে আমাকে অনুসরণ করলো। চলতে গিয়ে দেহের ভাইব্রেশন এবং নড়াচড়ার কারণে লাশ বাঁকা হয়ে গেলে বা স্থানচ্যুত হতে থাকলে পুর্বের নির্দেশ মোতাবেক মানু তা সঠিক স্থানে ঠেলে বা টেনে দিতো। এগিয়ে চলেছি আমরা। বাম-ডান-বাম। বাম-ডান-বাম। লেফট-রাইট-লেফট। লেফট-রাইট-লেফট। ব্যতিক্রম হলো এই যে, স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের মার্চ পাষ্টে পাঁ চলে, আর এখন আমাদের চলছে দু'হাতের দুই কনুই। রাস্তা কর্দমাক্ত। কোথাও কোথাও পিচ্ছিল। গোলাগুলি চলছে অবিরাম। রাস্তা শেষ হতে চায় না। অবশ্য স্বভাবতই আমাদের চলার গতি ছিলো অত্যন্ত মন্থর।

কতদূর এসেছি, কতক্ষণ চলেছি জানিনা। হঠাৎ ক্ষীণ কণ্ঠের আর্তনাদ এবং এক ধরনের কষ্টকর কণ্ঠস্বর শুনা গেলো। সহযাত্রী তথা সহযোদ্ধাদেরকে কাদায় থুঁতনি রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলে ধীরে ধীরে আমি সেই গোংগানী ধরনের আওয়াজের দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি হাবিলদার বায়েজিদ এক অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। আর্টিলারী বা মর্টারের গোলার আঘাতে তার ডান পা'টা কোমরের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাত তিনেক দূরে পড়ে আছে। আমাকে দেখে বিষাদ ক্লিষ্ট একটা

হাসি দিয়ে বললেন 'পানি।' পানি কোথায় পাবো? কোথাও খাবার পানি দেখলাম না। আশে-পাশে কোন পুকুর বা টিউবওয়েলও নেই। পাশেই ছোট্ট একটি গর্তে ঘন ও ময়লা সামান্য একটি পানি চোখে পড়লো। দু'হাত দিয়ে এক আঁজলা ঘোলা পানি এনে তার মুখে ঢেলে দিলাম। অমৃত বা শরাবন তহুরার মতো তিনি তা পান করলেন এবং তৃপ্তির হাসি হাসলেন। উঠতে গিয়ে ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে গেলেন তিনি এবং যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার পাশে বসে পড়লাম। মাথাটা টেনে নিলাম কোলে। বললেন, 'মুস্তফা ভাই, বাঁচবো না। আমি মরে যাচ্ছি। স্বাধীন বাংলাদেশটা দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হলোনা।' হাঁপাচ্ছেন উনি। চোখ বন্ধ করে রাখলেন কিছুক্ষণ। খুললেন আবার। কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মৃদু এবং ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন : 'শীপু নামে আমার একটি ছেলে আছে। পারলে একটু দেইখেন।" আবার চোখ বুঁজে ফেললেন। আমি তার কপাল এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ জোরে বলে উঠলেন 'লা ইলাহা...তখনি একটা আর্টিলারী বিকট শব্দে নিকটে কোথাও বিস্ফোরিত হলো। শরীরটা একটু ঝাঁকানী দিয়ে নিথর হয়ে গেলো হাবিলদার বায়োজিদের শরীর। আমি বললাম–'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'...এ লাশ নিয়ে এখন আমি কী করি? মনে পড়ে গেলো এয়ার আহাম্মদের লাশের কথা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং বাধ্য হয়েই তাই হাবিলদার বায়েজিদের মাথা অত্যন্ত তমিজের সাথে মাটিতে নামিয়ে রেখে ক্রলিং করে ফিরে এলাম পূর্বের অবস্থানে, এয়ার আহাম্মদের কাছে। আমার সহযোদ্ধারা ইত্যবসরে খানিকটা বিশ্রাম পেলো। ভালোই হলো। এ পদ্ধতিতে, ঐ ভয়ানক পরিবেশে, বিপদ সংকুল কর্দমাক্ত পথে, ঐ ভারি লাশ নিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ চলা যে কতো সাহসের, কতো কষ্টের এবং কতো বড় মিশনের ব্যাপার, প্রিয় পাঠক, আপনার কথা বাদ দিন, আমি নিজেই আজ তা কল্পনাও করতে পারি না।

আবার শুরু হলো আমাদের ক্লান্তিকর পথ চলা। আশে-পাশে শত্রুর গোলা এসে পড়ছে। মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার, লাখ লাখ বুলেট। এক সময় শত্রুর ব্রাশ ফায়ারের এক ঝাঁক গুলি আমার চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে চলে গেলো। বেঁচে গেলাম। আমাদের শরীর নিস্তেজ। শরীর আর চলে না। শ্বাস-প্রশ্বাস ভারি হয়ে গেছে। নিশ্বাস বের হওয়ার সময় মনে হচ্ছে যেন নাকের চারপাশের দেয়াল ছুরির কাটার মতো ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে থেমে একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে আগাচ্ছি। কিন্তু সত্যিই আর পারি না। এক পর্যায়ে বিরামহীন গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজের মধ্যে বিপজ্জনক পথে এবং প্যাঁক-কাদার মধ্যেই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম, হয়তোবা জ্ঞান হারালাম। জানিনা কতোক্ষণ ছিলাম এভাবে। এক সময় চেতনা ফিরো এলো। কতোক্ষণ অচেতন অবস্থায় পড়েছিলাম তা আর কোনোদিন জানা যাবে না। শুরু হলো আবার আমাদের সেই অস্বাভাবিক কাফেলার পথ চলা। এক সময় আমরা আমাদের গর্বের ধন, আমাদের প্রান প্রিয় সি.ও. মেজর জাফর ইমামের বাংকারের সামনে পৌছে

গেলাম। জাফর ইমাম প্রথমে অবাক বিস্ময়ে এবং পরে প্রশংসার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন–'এ্যা গ্রেট জব ডান!' হাবিলদার এয়ার আহাম্মদের পাশে কিছুক্ষণ অশ্রুসজল নয়নে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। এরপর স্থানীয় কিছু ভলান্টিয়ার ডেকে এনে লাশ ভারতীয় সীমান্তের অভ্যন্তরে বিলোনিয়া-চোত্তাখোলা রাস্তা পর্যন্ত নেয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। পাহাড়ি ঐ রাস্তাটি ভয়ানক রকমের পিচ্ছিল, আঁকা-বাঁকা এবং উঁচু-নীচু। কোনো যান-বাহনই নেই। একেবারেই ফাঁকা। লাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। যেতে হবে চোত্তাখোলা। এখান থেকে সেই গন্তব্য হবে অন্তত ১০ মাইল। কী করি?

হঠাৎ দেখি বিলোনিয়ার দিক থেকে একটা সামরিক জিপ এগিয়ে আসছে। সবাই মিলে হাত নেড়ে এবং চেঁচামেচি করে জিপটাকে থামানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু ব্যর্থ হলাম। একই গতিতে জিপটি চলে যাচ্ছে আমাদের গন্তব্য চোত্তাখোলার দিকে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর জিপটি কেন জানি হঠাৎ থেমে গেলো এবং কী মনে করে জানিনা, ব্যাক গিয়ার মেরে পিছনে ফেরত আসা শুরু করলো, থামলো আমাদের সামনে এসে। জিপ থেকে লাফিয়ে নামলো বি.এস.এফ এর এক ক্যাপ্টেন। উপরে নীচে তাকিয়ে দেখলেন আমাকে এবং আমার সহযোদ্ধাদেরকে। আমাদের চোখ তখন টকটকে লাল এবং পুরো শরীর কাদায় প্যাঁকে একাকার। কিম্ভূত কিমাকার অবস্থা। বললেন, 'আপলোক কৌন হ্যায়? কেয়া মাংতা? হুয়া কেয়া?' আমি উর্দু-হিন্দি ভাষা বুঝি, কিন্তু বলতে পারিনা। হাবিলদার এয়ার আহাম্মদের লাশ দেখিয়ে ইংরেজীতে বললাম 'আমার সহযোদ্ধা। বিলোনিয়া যুদ্ধের প্রথম শহীদ। তবে এক ক্যাপ্টেন সহ ৫ শত্রু সেনাকে খতম করে তবেই মৃত্যুবরণ করেছে। তার শেষ ইচ্ছা ছিলো বাংলার মুক্ত মাটিতে কবর পাওয়ার। যুদ্ধের ময়দান থেকে তার লাশ আমরা তুলে নিয়ে এসেছি। এ লাশ নিয়ে আমরা চোত্তাখোলা যেতে চাই। জিপটি কী দেয়া সম্ভব?' কথাটা বলেই নিজেকে নিতান্তই বোকা এবং অবিবেচক মনে হলো। যুদ্ধের সময় ইচ্ছা থাকলেও উনি এভাবে একটা সামরিক যান ধার দিতে পারেন না। তার সেই স্বাধীনতাও হয়তো নেই। ক্যাপ্টেন ধর (তার নাম ধর বলেই মনে পড়ে) কিছুই বললেন না। তিনি তার সৈনিকদেরকে সাথে নিয়ে এয়ার আহাম্মদের লাশের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে সামরিক কায়দায় এয়ার আহাম্মদকে সেল্যুট করলেন। আমাকে বললেন–'But do you have a free land to burry him?' আমি বললাম–'Probably we don't. But please don't worry. If need be, we will fight to free a piece of land to burry him.' আমার আবেগ, অনুভূতি, মনোবল এবং শহীদ সহযোদ্ধার শেষ ইচ্ছা পূরণে আমাদের সকলের দৃঢ় সংকল্পে ক্যাপ্টেন হতবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ দেখি, চোখ থেকে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে টপ টপ করে। ভাঙ্গা গলায় বললেন–'You wanted to have the jeep?' আমি তাড়াতাড়ি বললাম–'Yes sir!' দরদ ভরা কণ্ঠে বললেন উনি–'You get it!'

ভিনদেশী এক সৈনিকের অভাবনীয় সহযোগিতা ও সহমর্মীতায় একেবারেই লা-জওয়াব এবং আপ্লুত হলাম আবেগে। ড্রাইভারকে ক্যাপ্টেন হিন্দিতে কিছু নির্দেশ দিলেন এবং চোত্তাখোলার নির্দিষ্ট একটি স্থানে গাড়ি নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। এরপর তিনি তার অধীনস্থ সৈনিকদেরকে নিয়ে সেই কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ ধরে চোত্তাখোলার দিকে মার্চ করা শুরু করলেন। আর আমরা এয়ার আহাম্মদের লাশ সহ সেই জিপ নিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চললাম। কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধায় আজো স্মরণ করি মিত্র বাহিনীর উদারতা, সহৃদয়তা, সহমর্মিতা আর সেদিনের সেই বদান্যতার কথা।

চোত্তাখোলা একটা ছোট্ট সীমান্ত শহর। চিরকুমার জননেতা এবং ফেনীর এম.পি জনাব খাজা আহাম্মদ এখানে একটি 'মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটমেন্ট এন্ড ট্রানজিট ক্যাম্প' স্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের বেশ কয়েকটা শরনার্থী শিবিরও এখানে রয়েছে। চোত্তাখোলা থেকে মাইল খানেক পূর্বেই বাংলাদেশের সীমানা এবং আন্তর্জাতিক সীমানা হতে বালুয়া গ্রামের দূরত্ব এক মাইলের চাইতে সামান্য একটু বেশি। এই বালুয়া গ্রামেই এয়ার আহাম্মদের জন্ম এবং এ গ্রামেই আমরা তাকে সমাহিত করতে চাই।

লাশবাহী আমাদের জিপটি শেষ পর্যন্ত চোত্তাখোলায় এসে পৌছালো। এখানে অবস্থানরত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশের শত শত লোক জড়ো হলো। বালুয়া গ্রামের আওয়ামী লীগের নিবেদিত কর্মী মোহাম্মদ আলী এয়ার আহাম্মদের লাশ জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাকেই বালুয়া গ্রামে পাঠালাম এয়ার আহাম্মদের বাবা-মা-চাচা-মামাদের খবর দেয়ার জন্য। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ইউনূস চৌধুরীর নেতৃত্বে লাশ নিয়ে আমরা সীমান্তের ধারে গিয়ে পৌছলাম। বালুয়া গ্রাম তখনো পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়নি বলে সেখানে কবর দেয়া কঠিন ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে বিধায় সীমান্তের ৫০০ গজ দূরের দক্ষিণ পৈথারা গ্রামে একটি উঁচু স্থানে তাকে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু ধানের মাঠের শেষ প্রান্তে পাকিস্তানিদের বাংকার চোখে পড়লো। কবর দেয়ার সময় পাকিস্তানিদের দ্বারা যদি আমরা আক্রান্ত হই তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। শাকী ও ছালেহ আহমদের প্লাটুনের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় কিছু গেরিলা যোদ্ধা এবং আমার চারজন সহযোদ্ধাদেরকে নিয়ে ছোট্ট একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুললাম। অস্ত্র-শস্ত্র সহ তাদেরকে এমনভাবে ডিফেন্সিভ পজিশনে Place করলাম যাতে শত্রু-সেনারা আক্রমণ করলেও যুদ্ধ করতে করতে এয়ার আহাম্মদকে আমরা সমাহিত করে ফেলতে পারি। এর মধ্যেই এয়ার আহাম্মদের মা-বাবা-মামা সহ আত্মীয় স্বজন এসে গেলো। সৃষ্টি হলো এক বেদনা-বিধুর পরিবেশ। সে দৃশ্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শুরু হলো কবর খোঁড়া। ইতিমধ্যে কোত্থেকে জানি সবুজের মধ্যে লাল গোলকের মধ্যখানে মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের আদি পতাকাটি নিয়ে আসলেন ইউনূস চৌধুরী। সেই পতাকা

দিয়ে আমরা এয়ার আহাম্মদের লাশ মুড়ে দিলাম। স্থানীয় মসজিদের ইমাম জানাজা পড়ালেন। ইতিমধ্যে কবর খোঁড়া হয়ে গেছে। এয়ার আহাম্মদের ছোট মামা রুহুল আমিন সহ মোট তিনজন কবরে নেমে এয়ার আহাম্মদের লাশ গ্রহণ করলেন এবং ধীরে ধীরে সে লাশ কবরের মাটিতে শুইয়ে দিলেন। তিনজনের মধ্যে দু'জন কবর ছেড়ে উঠে এলেও রুহুল আমিন মামা কবর ছেড়ে আসতে অস্বীকার করলেন। এয়ার আহাম্মদের লাশ জড়িয়ে ধরে কাত হয়ে উনি কবরে শুয়ে পড়লেন এবং তাকে সহ কবর দেয়ার কাজ শুরু করার জন্য আমাদেরকে বিনীত অনুরোধ করলেন। কবর থেকে উঠে আসার জন্য আমাদের সমস্ত যুক্তি এবং অনুরোধ ব্যর্থ হলো। তাকে সহ দ্রুত কবর দিয়ে দেয়ার জন্য করুন কান্না সহ উনি অনুনয় বিনয় করতে থাকলেন। জানা গেলো যে, এয়ার আহাম্মদ এবং তার ছোট মামা রুহুল আমিন প্রায় সমবয়সী, ছোটবেলাকার খেলার সাথী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনই অবিবাহিত। ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেলাম। এ ধরনের দৃশ্য অপ্রত্যাশীত ও অস্বাভাবিক। সময় বয়ে যাচ্ছে। যে কোনো সময় আমরা পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারি। ইতোমধ্যেই ভিড়-ভাট্টা দেখে পাকিস্তানিরা দুটো Single Shot fire করলো। আমার সহযোদ্ধাদেরকে বাধ্য না হলে fire open করতে আগেই নিষেধ করেছিলাম। দাফন-কাফন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যুদ্ধবিগ্রহ বা কোনো ঝামেলাতে জড়াতে চাইনা আমি। ছোট মামার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত আমাকে কঠোর হতেই হলো। মোহাম্মদ আলী সহ তাগড়া ৪ জন যুবককে একটু দূরে ডেকে নিয়ে ব্রিফিং দিলাম। পরিকল্পনা মোতাবেক তারা আচম্বিত কবরে নেমে মামা কিছু বুঝে উঠার আগেই বিজলীর গতীতে তাকে চেং দোলা করে উঠিয়ে কবরের বাইরে ঠেলে দিলেন। সাথে সাথে ৭/৮ জন জোয়ান ছেলে তাকে মাটিতে ঠেষে ধরলো। আর এ ফাঁকে আমরা এয়ার আহাম্মদকে শেষ দেখা দেখে, চির বিদায় জানিয়ে কবর দেয়ার কাজ সমাধা করলাম। দোয়া-দরুদ পড়ে, মুনাজাত করে এবং সকল মুক্তিযোদ্ধারা মিলে সামরিক কায়দায় এয়ার আহাম্মদকে সেল্যুট করে ফিরে এলাম আমরা বিলোনিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে। টাস্ক ফোর্স কমান্ডার মেজর জাফর ইমামের কাছে রিপোর্ট করে ছুটলাম আমি শহীদ হাবিলদার বায়েজিদ যেখানে শহীদ হয়েছেন সেই অশ্বথ গাছের দিকে। গিয়ে দেখি জমাট বাধা থোক থোক রক্ত। কিন্তু হাবিলদার বায়েজিদ নেই। কোথায় গেল আমার নিজের হাতে রেখে যাওয়া এ লাশ ??

মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে ঈদুল ফিতর

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

একাত্তরের ২০শে নভেম্বর, শনিবার ছিল ঈদুল ফিতর। পাকিস্তানি পশুশ্রেণীর সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের অত্যাচার ও নির্যাতনে মানুষ প্রায় সহায়হীন। গোটা বাংলাদেশ তখন অবরুদ্ধ। ইতর গোত্রীয় এই দালালদের অনেকেই ছিল বর্ণচোরা। গায়ে সাইনবোর্ড না থাকলেও এরা সাইনবোর্ডওয়ালা দালালদের চেয়েও জঘন্য ছিল। অবাক হতে হয় ভেবে, তাদের অনেকেই ছিল স্কুলের শিক্ষক ও সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। এদের ভয়ে রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতে হতো নিচু ভল্যুয়মে; মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা আর স্বাধীনতার কথা বলতে হতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচুস্বরে।

ঈদের জামাতে ইমাম সাহেব সব শ্রেণীর মানুষের আর্জি মোনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করেন। মোনাজাত হয় সাধারণ মোনাজাতের চেয়ে দীর্ঘ। কিন্তু একাত্তরের ঈদুল ফিতর ছিল একদমই ভিন্ন বৈশিষ্টের। এমন ঈদ অতীতে কখনো হয়নি, ভবিষ্যতেও কোনোদিন হবে না। স্বাধীনতা-বিরোধী কুলাঙ্গারদের ভয়ে ইমাম সাহেব সরবে মনের কথাও আল্লাহ্ তাআলার কাছে বলতে পারেননি। বলতে পারেননি, আল্লাহ তুমি এই জালেমদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দাও। তুমি মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিকামী জনতাকে বিজয়ী করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দাও। তোমার শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে যারা হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুট আর নারী নির্যাতন করছে তাদেরকে তুমি বিচার করো। সশব্দে না হলেও মনে মনে সবাই এ দোয়াই করেছে। একাত্তরের চিরায়ত সমাজ বৈশিষ্ট্যের কিছু নতুন মাত্রা যোগ হয়। গ্রামে যেসব বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা থাকতো সেগুলিকে গেরিলা যুদ্ধের ভাষায় বলা হতো হাইড আউট। এগুলোকে নির্বাচন করা হতো রণকৌশলগত বিবেচনায়। আর বাকি যে দুটি স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা থাকতো তার একটি হচ্ছে শত্রুর মুখোমুখি প্রতিরক্ষা অবস্থানে এবং অপরটি ভারতের অভ্যন্তরে সীমান্তের কাছাকাছি ছোট-বড় ক্যাম্প-এ।

একাত্তরের উত্তপ্ত রণাঙ্গনের মধ্যে একটি ছিল সালদা নদী। আখাউড়া জংশন থেকে যে রেলপথটি কুমিল্লা হয়ে চট্টগ্রাম যায় সে পথে পর্যায়ক্রমিকভাবে গঙ্গাসাগর, ইমামবাড়ি, কসবা, মন্দবাগ, সালদা নদী, শশীদল তারপর কুমিল্লা রেলষ্টেশন। রেলপথটি প্রায় সীমান্ত ঘেঁষে যায়। সালদা নদী আদতে একটা বড় খাল। কিন্তু বর্ষায়

প্রচণ্ড খরস্রোতা। এ ছোট্ট নদীটির নামে স্থানটির নাম সালদা নদী, রেলস্টেশনটির নামও সালদা নদী। সালদা নদীর রেল সেতুর পূর্বদিকে ১৪ বর্গ কিলোমিটারের একটি বাংলাদেশের ভূখণ্ড। পশ্চিম দিক ছাড়া বাকি প্রায় তিন দিকেই ভারত। ক্যাপ্টেন আবদুস সালেক চৌধুরী (পরবর্তীতে বীর উত্তম এবং প্রয়াত) এখানেই সালদা নদীর পূর্ব পাড়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করার মাধ্যমে ২ নম্বর সেক্টরের সালদা নদী সাব-সেক্টরের গোড়াপত্তন করেন। সালদানদীর পশ্চিম পাড়ে পাকিস্তানের ৩০ পাঞ্জাব



ঈদুল ফিতর-১৯৭১। তাজউদ্দিন আহমেদ ও
কর্ণেল ওসমানীসহ অন্যান্যরা

রেজিমেন্ট। পরে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্ট ৩০ পাঞ্জাবকে বদলি করে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন আবদুল গফফার হালদার (পরবর্তীতে বীর উত্তম) এ এলাকার প্রায় দুই কিলোমিটার পূর্বে ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতর কোনাবন নামের এক স্থানে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পুন:সংগঠন করেন। এই ইউনিটের পুরোনো সৈনিকদের ও গণযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত হয় ৯ম ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যথাক্রমে ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আইনউদ্দিন (পরবর্তীততে বীর প্রতীক) এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (পরবর্তীততে বীর বিক্রম)-এর নেতৃত্বে। এ তিনটি ইউনিট এবং ১ম ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি (মুজিব ব্যাটারি নামে সমধিক পরিচিত) ও বিগ্রেড সিগন্যাল কোম্পানি নিয়ে লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফের (পরবর্তীতে বীর উত্তম ও প্রয়াত) নেতৃত্বে ফোর্স বিগ্রেড গঠিত হয়।

লাইলাতুল বরাত। বিকেল বেলায় ক্যাপ্টেন সালেক প্রতিপক্ষ শত্রু প্রতিরক্ষায় অবস্থিত কোম্পানি কমান্ডারকে বেতারযন্ত্রে না পেয়ে সিনিয়র সুবাদারকে বললেন

রাত্রে সবাই এবাদত বন্দেগী করুক। যুদ্ধ এবং গোলাগুলি বন্ধ থাক। পাকিস্তানি সুবাদার আরো এক কাঠি সরস হলো। উর্দুতে জবাবে বললো যে, না স্যার যুদ্ধ তো যুদ্ধই। এ ধরনের নিয়ম মেনে যুদ্ধ হয় না। [৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের কাছে এবং ৩৩ বেলুচের কাছে একই বেতারযন্ত্র (জিআরসি-১০)]। পূর্বেকার রেডিওর মতো নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি এ্যাডজাস্ট করতে হতো]। কাপ্টেন সালেক মুজিব ব্যাটারির ছয়টি কামান প্রস্তুত করলেন। গোলার কোনো অভাব ছিল না। সন্ধ্যার পর থেকেই শুরু করলেন শত্রু অবস্থানের উপর বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ। ঘণ্টা দেড়েক পরে পাকিস্তানি সুবাদার বেতার যন্ত্রে ক্যাপ্টেন সালেককে অনুনয় করতে লাগলো, স্যার যথেষ্ট হয়েছে। এবার বন্ধ করুন। ক্ষমা চাই। আমরা একটু শবেবরাতে এবাদত-বন্দেগী করবো।

বাংলাদেশের ভিতরে যারা হাইড আউটে থাকতো, তারা পাকিস্তানিদের ঈদের দিনে আক্রমণের আশঙ্কায় হয় হাইড আউট দুই একদিন আগে বদল করে ফেলে অথবা সর্বোচ্চ সতর্কবস্থায় ছিল। ঈদের নামাজ মুক্তিযোদ্ধারা জামাতে পড়েছে তেমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। পরবর্তীতে পাকিস্তানি অফিসার যারা এখানে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের লেখা বই থেকে জানা যায় যে একাত্তরে তারা তাদের সব অবস্থানেই সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় ছিল ঈদের দিন মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কায়।

রমজান আলী, বয়স ১৩/১৪। দিনাজপুর সীমান্তে হিলি এবং ফুলবাড়ির মাঝামাঝি জলপাইতলি। এখানে পাকিস্তান আর্মির শক্ত অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা সে অবস্থান রেকি করতে গিয়ে রমজান আলীকে সে ক্যাম্প থেকে বের হতে দেখে তাকে ধরে নিয়ে আসে তাদের কমান্ডার হামিদুল হোসেন তারেক-এর (পরবর্তীততে বীর বিক্রম) কাছে। বলে, স্যার এ রাজাকার। রমজান আলী কেঁদে কেটে যে কাহিনী শোনায় তা করুণ, বুক ভাঙা কষ্টের। রমজান বাবা-মার একমাত্র সন্তান। শান্তাহার রেল স্টেশনের পাশে তার বাবার একটি ছোট্ট চা-বিস্কুটের দোকান। এপ্রিলের প্রথমে পাকিস্তানিরা শান্তাহার এসে তার সামনেই তারা তার বাবাকে দোকানের ভিতর গুলি করে হত্যা করে। রমজান দৌড়ে কাছেই তার বাড়িতে যায়। দেখে তাদের ঘরসহ গোটা বস্তি আগুনে জ্বলছে। বস্তির সব লোক যে যেভাবে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে। বহু খুঁজেও মাকে পায় না রমজান। আশ্রয় নেয় এক গুদাম মালিকের কাছে। তারপর আরো দু'হাত বদল হবার পর এক মালিক তাকে এই পাকিস্তানি ক্যাম্প-এ দিয়ে যায়। এখানে সে থালা-বাসন ধোয়া থেকে অন্য সব কাজ করে। তার প্রচণ্ড ঘৃণা পাকিস্তানের প্রতি। রমজান তার বাবা হত্যার এবং মা হারানোর প্রতিশোধ নিতে চায়। কমান্ডার তারেকের স্নেহে রমজান তাদেরই একজন হয়ে যায়। এলাকার পথ-ঘাট তার নখদর্পণে। ১৯ নভেম্বর রাতে যাত্রা করে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় ৬ গার্ডস রেজিমেন্ট-এর সহায়তায়। ২০ নভেম্বর ভোরে জলপাইতলির পাকিস্তানি অবস্থান দখল করে।

গাইড আমাদের রমজান আলী। শত্রু অবস্থান দখলের আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে রমজান একাই দৌড় দেয় ক্যাম্প-এর দিকে। হঠাৎ বিকট শব্দ। শত্রুর পোতা মাইন-এ পড়ে রমজানের ছোট্ট শরীরটা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ কোথায় মিলিয়ে গেল। প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা রমজানের জন্য বুক ভাসিয়ে কাঁদতে থাকে। সেদিন ঈদুল ফিতর-এর সকাল। ৬ গার্ডস পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় লাস্ট পোস্ট বাজিয়ে রমজানকে শেষ বিদায় জানায়।

১৪ নভেম্বর ভুরুঙ্গামারী মুক্ত করা হয়। এবারের লক্ষ্য কুড়িগ্রাম দখল। খবর পাওয়া গেল ওদিকে লালমনিরহাট থেকে পাকিস্তানিরা পালিয়ে গেছে। মোট কথা শত্রুর মনোবল এখন পায়ের তলায়, তারা পশ্চাদপসরণ করে রংপুর জড়ো হচ্ছে। পথে জয়মনিরহাট কোনো বাধা ছাড়াই দখল হলো। ১৯ নভেম্বর রাতে যখন রায়গঞ্জে ফুলকুমার নদীর উপর ব্রিজের কাছে পৌছানো হলো তখনি শত্রুর প্রচণ্ড ফায়ার। একদমই অপ্রস্তুত অবস্থায় সবাই; মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী। এখানে পাকিস্তানিদের এতো শক্ত প্রতিরোধ হতে পারে কারো কল্পনায়ও আসেনি। সবাই ভেবেছিল পরবর্তী প্রতিরোধ হবে নাগেশ্বরীতে। গুলির প্রথম তোড়েই মারা যান ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেমস্ এবং দুজন সৈনিক। সেকেন্ড লে. আবু মঈন মোহাম্মদ আশফাকুস সামাদ (শহীদ ও বীর উত্তম) মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টির মধ্যেও। সহযোদ্ধাদের পিছিয়ে গিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। নিজে একটি এলএমজি দিয়ে শুয়ে কভারিং ফায়ার দিতে থাকেন শত্রুর উপর। নিজের জীবন বিপন্ন করে সহযোদ্ধাদের নিরাপদ করার প্রাণান্তকর প্রয়াস। হঠাৎ একটি গুলি তার মাথার তালু ভেদ করে গলার ভিতর দিয়ে তার দেহের অভ্যন্তরে ঢুকে যায়। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র শহীদ। লে. সামাদ নেতৃত্ব ও সহমর্মিতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। ভোর রাতের যুদ্ধের ক্ষেত্রে আগের দিন রাতেই যোদ্ধাদের পরদিন সকালের নাস্তা দিয়ে দেয়া হয়। শহীদ লে. সামাদের পকেটে পাওয়া গেল ঈদের দিন সকালের নাস্তা দুটি পুরি এবং একটু হালুয়া।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শেষ বর্ষ অনার্সের ছাত্র ছিলেন ২/লে. আবু মঈন মোহাম্মদ আশফাকুস সামাদ। অনার্স শেষ করে আমেরিকায় পড়বার স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। সব ছেড়ে এপ্রিলের একদম শুরুতেই যোগ দেন যুদ্ধে। যে চারজন মুক্তিযোদ্ধা এপ্রিলের শুরুতে অস্ত্র নিয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ করেন সামাদ তার একজন। জুন মাসের মাঝামাঝি অফিসার ক্যাডেট হিসেবে ভর্তি হন এবং ৯ অক্টোবর ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। অত:পর তার বদলি হয় ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরে।

ছাত্র হিসেবে, সন্তান হিসেবে, সতীর্থ হিসেবে, দুর্গতদের সহায়ক হিসেবে, স্বাধিকার অর্জনের বিপ্লবী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে সর্বোপরি মানুষ হিসেবে আশফাকুস সামাদ ছিলেন দৃষ্টান্ততুল্য। ২০ নভেম্বর ঈদুল ফিতরের প্রত্যুষে তিনি নিজের প্রাণ

উৎসর্গ করে প্রমাণ করলেন যে যোদ্ধা হিসেবে, দেশপ্রেমিক হিসেবে এবং কমান্ডার হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য।

প্রবাসী সরকারের কার্যালয় কলকাতার ৮ থিয়েটার রোডে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়। অফিস চত্বরের ভিতরেই ঈদের জামাতের আয়োজন করা হয়। জামাতে ইমামতি করেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারে কোরান তেলাওয়াত ও তফসীর করতেন। দুঃখজনক হলেও সত্যি এ জামাতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী ছাড়া মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সদস্য বা উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। সবার জন্য যে রন্ধনশালায় খাবার রান্না হতো সেখানে কেবলমাত্র অতি সাধারণমানের সেমাই রান্না হয়। যে কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সারাদিন কিছুই খাননি।

রাতে তিনি অনির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত গোপন সফরে কুষ্টিয়া সীমান্তবর্তী দুটি মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। মুক্তিযোদ্ধারা ঈদের রাতে প্রধানমন্ত্রীকে তাদের মাঝে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কপোল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে প্রধানমন্ত্রীরও। অথচ তার অফিসের অদূরে সিটি রোডে তার শিশু সন্তান (তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ) ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে কাতরাচ্ছে। সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে একটিবার বাড়ি গেলেন না, একটি টেলিফোনও করলেন না। তার বাড়ির সামনে দিয়ে যখন গাড়ি আসছিল তখনও তাকে অনুরোধ করা হয়। তিনি নিশ্চুপ থেকে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। সকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক ফল-ফলাদি ঈদ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠায়। প্রধানমন্ত্রী সেগুলো নিয়ে যান মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। একটি ফল নিজেও খাননি বা তার অফিসের কাউকেও দেননি।



ঈদের জামাতের পর করমর্দনরত
তাজউদ্দিন আহমেদ ও কর্নেল ওসমানী

ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে

বড় ক্যাম্পগুলোতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সেক্টর সদর দপ্তর ও সাব-সেক্টর সদর দপ্তর-এ প্রশাসনিক জনবল থাকতো বলে তা সম্ভব হয়। সেমাই নামে যে মিষ্টান্ন তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কী আছে জানি না। তবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন ঈদ, শবেবরাত, শবেকদর, মিলাদ, দোয়া মাহফিল সেমাই প্রায় অপরিহার্য একটি মিষ্টান্ন। কোনো কারণ ছাড়াই হিন্দুদের মাঝে এটি জনপ্রিয় নয়। ২ নম্বর সেক্টর সদর দপ্তর (ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা জেলার সোনামুড়া থানার মেলাঘর)–এ ঈদের দিন বড় বড় তিন হাঁড়ি দুধ জ্বাল দেয়া হলো। সেমাইয়ের জন্য খোঁজা হলো গোটা আগরতলা। এক বাক্স সেমাই পাওয়া গেল। সেটিকে তিন ভাগ করে তিন হাঁড়িতে দেয়া হল।

আরো ভিন্নরকম ঈদ ছিল আটটি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ। জেড, এস এবং কে ফোর্সের অধীনে ছিল এই আটটি ব্যাটালিয়ান।

জেড ফোর্স ব্রিগেড-মেঘালয়ের তেলঢালা থেকে ১.৩ এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সিলেটের উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে পৌছে অক্টোবরের মাঝামাঝি। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই জেলার সদর দপ্তর আমবাশার অদূরে ক্যাম্প স্থাপন করে। ভারতীয় নির্দেশে একরকম বাধ্য হয়েই প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও ২৮ অক্টোবর ধলই বিওপিতে পাকিস্তানি অবস্থান আক্রমণ করতে হয়। এ যুদ্ধে সিপাই হামিদুর রহমান বীর শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করেন। আমবাশা এলাকাতেই ঈদের জামাতের আয়োজন করা হয়। কোলাকুলির পর্যায়ে দেখা গেল দুজনেই কাঁদছে এবং একে অপরকে বলছে, আরে বোকা ঈদ মানে তো আনন্দ, কাঁদছিস কেন?

৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অসম সাহসী অধিনায়ক মেজর সাফায়াত জামিলের (পরবর্তীতে বীর বিক্রম) নেতৃত্বে ঈদের সময় গোয়াইনঘাট এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থানে পাকিস্তানি ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে দিনে-দুপুরে তারা দেখাচ্ছে। ঈদের কথা ভাববার তাদের খেয়ালই নেই।

৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মৌলভীবাজারের বিপরীতে সাগরনাল ফুলতলা এলাকায়। এখান থেকে তারা পাকিস্তানিদের উপর একের পর এক আঘাত হেনে যাচ্ছে। শত্রুরা প্রতি আক্রমণেরও চেষ্টা করছে কয়েকবার। তাতে তাদের হতাহতের সংখ্যাই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আক্রমণ এবং প্রতি-আক্রমণের মধ্যেই ঈদের নামাজের আয়োজন করেন অদম্য সাহসী অধিনায়ক মেজর আবু জাফর মোহাম্মদ আমিনুল হক (পরবর্তীতে বীর উত্তম)। অর্ধেক ব্যাটালিয়ান প্রহরায়-বাকিরা নামাজে। দ্বিতীয় জামাতে তার বিপরীত।

এস ফোর্স বিগ্রেড-২য় এবং ১১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর যারা যুদ্ধে ছিলেন না এবং সেক্টর সদর দপ্তরে ছিলেন তারা জামাতের আয়োজন করেন। ইমামতি করেন ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-র ধর্মীয় শিক্ষক মাহবুব। নামাজ শেষে ইমাম সাহেব অত্যন্ত আবেগময় এক মোনাজাত করেন। নামাজীরা কাঁদতে কাঁদতে এক পর্যায়ে

মাটিতে গড়াতে থাকে। ইমাম সাহেব মোনাজাতের এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেন ঈদুল আযহার (কোরবানী ঈদ) জামাত যেন স্বাধীন বাংলাদেশের রেসকোর্স ময়দানে পড়তে পারেন। আল্লাহ রাব্বুল আল আমীন এই দোয়া কবুল করেছিলেন। বাস্তবেও এই ইমাম সাহেব ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর ঈদুল আযহার নামাজ রেসকোর্স ময়দানে পড়ান।

কে ফোর্স বিগ্রেড-৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সালদানদী এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিল। আগেই বলেছি সালদানদী ছিল উত্তপ্ত রণাঙ্গন। ক্যাপ্টেন গফফার হালদার সিদ্ধান্ত নেন ঈদের দিন পাকিস্তানি ছয়টি অবস্থানের উপর রেইড করবার। তারা ঈদের জামাতেরই আয়োজন করেনি। ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল কসবা এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থানে। ২১ নভেম্বর দিবাগত রাতে তারা চন্দ্রপুরে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণ করবে। তাদের সহায়তা করবে ভারতীয় আর্টিলারি এবং সাথে থাকবে ভারতীয় ৭৩ মাউন্টেন বিগ্রেডের ১৯ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এর একটি কোম্পানি। ২০ নভেম্বর ১৯ পাঞ্জাব কসবা প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বদল করে। ফলে তাদের কোনো ঈদের নামাজ হয়নি।

১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৫ নভেম্বর রাতে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে উত্তরে বিলোনিয়া এবং দক্ষিণে ফেনীতে অবস্থিত যথাক্রমে, পাকিস্তানি ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট এবং ১৫ বালুচ রেজিমেন্টকে বিভাজিত করে ফেলে। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর এই 'ইনফিলট্রেশন অপারেশন' পৃথিবীর বহু সামরিক একাডেমিতে পড়ানো হয়। যেহেতু সেমাই দুষ্প্রাপ্য সেহেতু মিষ্টি সাগু পরিবেশন করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে। এই সামান্য মিষ্টান্ন প্রাপ্তিও ছেলেদের চোখে পানি নিয়ে আসেন। মুক্তিযুদ্ধে তাদের এই প্রথম মিষ্টান্ন পাওয়া।

একাত্তরের ঈদ-এর তুলনা হয় না, হবেও না। অনন্য ও অসাধারণ এই ঈদ থাক শুধুই আমাদের অহংকারের মুক্তিযুদ্ধের সাথে গাথা-আনন্দে, বেদনায়, অর্জনে ও ত্যাগে।